মাসুদ রানা

সর্বনাশের দূত

দ্বিতীয় খন্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

সর্বনাশের দূত

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক কাজে গিয়ে জড়িয়ে গেল ওরা আরেক ঝামেলায়।
প্রলয় ঘনিয়ে আনছে ভয়ঙ্কর এক উন্মাদ বিজ্ঞানী।
কাজে নেমেছে তার অদ্ভুত বিপজ্জনক কাল্ট।
চাইছে বিশ্বের আশি ভাগ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করতে!
হাতে অমোঘ মারণাস্ত্র!
রানা ও তার বন্ধুরা বুঝল, মানব সভ্যতা বাঁচাতে চাইলে এখনই সময়। কাজে নেমেই টের পেল ওরা কী ভয়ঙ্কর ফ্যানাটিক একটা দলের বিরুদ্ধে লেগেছে।
ভীষণ বিপদে পড়ল রানা, সোহেল, ফু-চুং, উর্বশী, স্বর্ণা।
এক পর্যায়ে বলল সোহেল, আর উপায় নেই রে,
এখন দরকার ইজরায়েলের তৈরি জিব্রাইলের মুষ্টি।
কিন্তু তা পেতে চাইলে মস্ত ঝামেলা পোহাতে হবে।
তাই করল ওরা, মহাশূন্যে চলে গেল পৃথিবী রক্ষা করতে।
পারবে ওরা?
এদিকে তো চারদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে মৃত্যু।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা ৪১৬

সর্বনাশের দূত

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7416-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১২
রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-416
SHARBONASHER DOOT
Part-II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

সাতাশি টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজ্জনক*রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস *স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা *বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *শ্বাপদসংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া *হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া*টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা *মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড় *কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ *কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর*আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল*শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট *মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15 অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেলআবিব*ক্রাইম বস্*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী *বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন*বিষচক্র *শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন*সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান *জলরাক্ষস*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার *খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইম্বার*আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত।

এক

'এক মিনিট, ফু-চুং,' চট্ করে পরিস্থিতি বুঝে নিতে চাইছে রানা। নিজের কেবিনে একা, ডেস্কের উপর এলোমেলো ছিটানো কাগজ। অফিশিয়াল কাজ। ইণ্টারকম তুলে নিল রানা, যোগাযোগ করল অপারেশন্স সেণ্টারের কমিউনিকেশন স্টেশনে।

'জী, মাসুদ ভাই,' জবাব দিল রাতের সুপারভাইজার।

'দেখো তো উর্বশীর রেডিও আইডি চিপ চলছে কি না।'

ওদের সবার শরীরে সার্জারি করে বসিয়ে নেয়া হয়েছে মাইক্রোচিপ, সর্বক্ষণ মৃদু আওয়াজ করছে। দেহের নার্ভাস সিস্টেমের কারণে স্বয়ংক্রিয় ভাবে চলছে মাইক্রোচিপ। যেমন বৈদ্যুতিক বুস্টের ফলে চলে পেসমেকার। এই চিপের কম্পনকে ধরছে বিশ্বের চারদিকের কমিউনিকেশন স্যাটালাইটগুলো। সহজে জানা সম্ভব হচ্ছে কোথায় রয়েছে দলের সবাই।

'কোনও সিগনাল নেই। এক মিনিট। পেয়েছি। ঠিক এগারো মিনিট আগে থেমে গেছে মাইক্রোচিপ। তখন হোটেল থেকে দুই মাইল দূরে ছিলেন। মিস্টার ফু-চুঙের চিপ ঠিক চলছে। উনি আছেন রোমের মাঝখানে। কলোসিয়াম থেকে সিকি মাইল দূরে।'

'ঠিক আছে।' ইণ্টারকম রেখে দিল রানা, কথা বলল ডেস্ক

টেলিফোনে। ওটা অত্যন্ত আধুনিক, তবে তৈরি করা হয়েছে উনিশ শ' ত্রিশ সালের বেকালাইট ফোনের মত করে। 'ফু-চুং, উর্বশীর ট্র্যান্সপণ্ডার কাজ করছে না।'

'তেমনই ধারণা করছি,' বলল ফু-চুং। 'এই একই জিনিসের কারণে ধরা পড়েছি। গ্রিসে নিশ্চয়ই ওরা চিপ বসিয়েছিল অমল দাশার শরীরে।'

'চিপ তো মোটামুটি জায়গা দেখাবে,' বলল রানা। 'হোটেল পর্যন্ত টেনে আনবার ক্ষমতা নেই ওগুলোর। জিপিএসের মত সঠিক হয় না। মনে হয় অন্য কোনভাবে খুঁজে পেয়েছে তোদের।'

'তা হতে পারে,' ফু-চুঙের কণ্ঠে দ্বিধা।

'অমল খবর দেয়নি তো?'

'এখন মনে হচ্ছে... সম্ভব। এলিভেটরে আমাদের অ্যাম্বুশ করে সোজা ধরে নিয়ে গেল সুইটে। তখন ড্রাগের নেশা ছুটে গেছে অমলের। আমার মনে হয় ক্রিট থেকে ফ্লাইটে কোনও একসময়ে সচেতন হয়ে যায়। তারপর থেকে ভান করছিল। সুইটে কয়েক মিনিট একা ছিল। আমরা তখন ডক্টর চার্চের সঙ্গে আলাপ করছি। ভেবেছি অমলের জ্ঞান নেই, কিন্তু আসলে তখন ফোন করেছে ব্রাঙ্কো বা আর কোনও লোকের কাছে। আমাদের নাম, হোটেল ও রুমের নম্বর জানিয়ে দিয়েছে।'

'আচ্ছা... ব্রাঙ্কো চিপ অনুসরণ করে গেছে রোমে, তারপর তাকে সঠিক ঠিকানা জানিয়েছে অমল।'

'ঠিক তা-ই।'

'আর ডক্টর চার্চের বিষয়? হতে পারে না, রেসপন্সিভিস্টদের কাছে সে-ই ফাঁস করে দিয়েছে সব?'

'তা-ও হতে পারে,' বলল ফু-চুং। 'অবশ্য কথা শুনে তো মনে হলো রেপন্সিভিস্টদের অপছন্দ করে সে। তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে ব্রাঙ্কো। ওটা কোনও অভিনয় ছিল না। মনে হয় এ লোক বিক্রি হয়নি।'

'আর কী ঘটতে পারে ভাবছিস?'

'রানা, একটা ব্যাপার ঠিক মেলে না। কোনও যুক্তি নেই কিন্তু, অমল যদি সাধারণ কর্মী হবে, তো তাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য এত ব্যাপক তৎপরতা কেন?'

'ওরা যে পরিকল্পনা করছে সেটার সঙ্গে কোনওভাবে জড়িত।'

'অথবা রিট্রিটে এমন কিছু জেনেছে, যা বাইরের কাউকে জানানো চলবে না,' বলল ফু-চুং।

'হ্যাঁ। অমলকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে নিজেদের সিকিউরিটি নিশ্চিত করতে।'

'তারা যদি এই পরিমাণ প্যারানইয়ার ভিতর থাকে, তো ধরে নিতে পারি স্বর্ণা ওই কম্পাউণ্ডে ঢুকতে পারবে না।'

'আগেই ওই মিশন বাতিল করে দিয়েছি। আমরা এখন জানি গোল্ড অভ মার্সে ছিল ব্রাঙ্কো, সম্ভবত সে-ই খুন করেছে মানুষগুলোকে। স্বর্ণা এখন অ্যাসাইনমেন্ট বুঝিয়ে দেবে মোফিজ বিল্লাহকে। সে যোগাযোগ করবে পার্লা মোনার সঙ্গে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে কী যেন ভাবল ফু-চুং, তারপর বলল, 'মাত্র কয়েক মিনিট ছিলাম ব্রাঙ্কোর সঙ্গে, তবে বলতে পারি, লোকটা পাগলাটে। চোখদুটো ছিল ঠাণ্ডা, খুনির। আরেকটা বিষয়, হোটেলে ব্রাঙ্কো বলেছিল, ডিয়েটস কেসলারের বারণ থাকায় ইচ্ছে সত্ত্বেও খুন করতে পারল না ডক্টর চার্চকে। কিন্তু কেন এই বারণ, তার পিছনে কোনও যুক্তি নেই। ডক্টরকে ফেলে

গেছে, কিন্তু কিডন্যাপ করেছে উর্বশীকে। কেন? ওদের খুন করলে সমস্যা চুকে যেত। সে সুযোগ ছিল, বাড়তি কোনও ঝামেলা হতো না। কেন ছেড়ে দেয়া হলো?'

'ঠিক বলেছিস। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা দরকার। পরে। এ মুহূর্তে অন্য কাজ আছে আমাদের।'

'হ্যাঁ, মস্ত বিপদে পড়েছে উর্বশী।'

নরম স্বরে বলল রানা, 'সত্যিই তা-ই।'

'তুই আমাকে কী করতে বলিস?' কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল ফু-চুং।

দুই বন্ধু একই কথা ভাবছে।

'তুই মোনাকো এসে মার্ভেলে ওঠ। কান পাতার কাজ বুঝে নিবি। আমার কাজ নাটের গুরুর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা।'

'সোহেলকে নিয়ে ফিলিপিন্সে যাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'উর্বশীকে ফিরে পেতে হলে কেসলারের বিরুদ্ধে জোরালো প্রমাণ চাই।'

'তোর কি মনে হয় ততক্ষণ টিকবে উর্বশী?'

'জানি না। তবে নিজের ব্যাপারে বেশি কিছু বলে না উর্বশী,' বলল রানা। 'নেভির কমাণ্ডো ট্রেনিঙের সময় ইরাকে ছিল। ওকে দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধে নামিয়ে দেন সাদ্দাম হোসেন। আমেরিকানদের হাতে বন্দি হয়েছিল। প্রচণ্ড অত্যাচার চলে ওর উপর। কিন্তু ভেঙে পড়েনি। ধরে নেয়া যায়, ও টিকবে।'

'ব্রাঙ্কো ওকে ভাঙতে চাইবে।'

'তুই তো জানিস অত্যাচার সহ্য করবার সময় দৈহিক শক্তির চেয়ে জরুরি মানসিক শক্তি। তা ওর আছে। আমার ধারণা আগের চেয়ে আরও শক্ত হয়েছে এখন। জানে, ওকে খুঁজে বের করব আমরা।'

‘ইরাকের সেই বন্দিশালা থেকে বের হয় কীভাবে?’

‘এক জেল থেকে আরেকটাতে সরিয়ে নেয়ার সময় দুই ইরাকি সৈনিককে নিয়ে পালিয়ে যায় ইরানের উদ্দেশে। পিছনে পড়ে থাকে ছয় আমেরিকান সৈন্যের লাশ। ওর সঙ্গী ইরাকিরা মারা পড়ে ইরান সীমান্তে, মেরিনদের অ্যাম্বুশে। তবে ইরানে ঢুকে পড়ে উর্বশী।’

পরদিন ভোর।

পাইলট হাউসের উইং ব্রিজে রানা। মোনাকোর ওপাশ থেকে উঁকি দিয়েছে মস্ত বলের মত সূর্য, সোনালী আলো ফেলেছে পাহাড়ি শহর মণ্টি কার্লোর উপর। আজ মেডিটারেনিয়ান অঞ্চল বেশ উষ্ণ। কোথাও বাতাস নেই। মণ্টি কার্লো এসেছে রানা এ নিয়ে তৃতীয়বারের মত। ওর মনে পড়ল, বিশ্বে শেষ যে ক'টি রাজ-পরিবার আজও দেশ পরিচালনা করছে, তাদের ভিতর অন্যতম মোনাকোর রাজ-পরিবার: গ্রিমালডি। সাত শ' বছর ধরে ক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছে তারা। এভাবে শত শত বছর ধরে টিকে আছে শুধু জাপানের ক্রিস্যানথেমাম সিংহাসন।

বহু বছর ধরে বিশ্বের সেরা অভিজাত মানুষগুলো আসছেন মোনাকোতে। অদ্ভুত সুন্দর বন্দরে অভাব নেই দামি অপূর্ব সব ইয়টের। কোনও কোনোটা দৈর্ঘ্যে এক শ' ফুটের বেশি। কয়েকটা তিন শ' ফুটি। রানার চোখ পড়েছে ইয়ট মাউণ্ট সিনাইয়ের উপর। ওখানে রয়েছে ইজরায়েলি আর্মস মার্চেণ্ট ব্যালফোর জেনকিন্স। পাহাড়ের দিকে চোখ সরিয়ে নিল রানা। টিলার কোলে সুদৃশ্য সব অভিজাত ভিলা, প্রায় ঘিরে ফেলেছে বন্দরকে। এ শহরের জমির দাম বিশ্বের অন্য যে-কোনও এলাকার চেয়ে বহু গুণ বেশি। রানা যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখান

থেকে দেখা যায় বিখ্যাত মণ্টি কার্লো ক্যাসিনো। বার কয়েক ওখানে গেছে ও, ভাল লেগেছে কর্তৃপক্ষের অভ্যর্থনা।

ইনার হার্বার থেকে রওনা হয়েছে দামি এক স্পিডবোট, ছুটে আসছে জাহাজ লক্ষ্য করে। উপকূল থেকে এক মাইল দূরে নোঙর ফেলেছে মার্ভেল। বন্দর-কর্তৃপক্ষকে আগেই জানানো হয়েছে জাহাজের ইঞ্জিন খুলে মেরামত করতে হবে। জার্মানি থেকে আসবে পার্টস, তার আগে নড়বার উপায় নেই। মোনাকোর তিন মাইল জলসীমার ভিতর ওরা, কিন্তু পনেরো মিনিট আগে বিনকিউলার দিয়ে জাহাজটা দেখেছে হার্বারমাস্টার, এরপর আর মার্ভেলে এসে উঠতে আগ্রহ বোধ করেনি।

প্রায় ষাট নট গতি তুলে জাহাজের পাশে পৌঁছে গেল স্পিডবোট, চালকের ভঙ্গি দেখে মনে হলো সে অফশোর রেসে নেমেছে। সিঁড়ি বেয়ে মেইন ডেকে নেমে এল রানা, থামল বোর্ডিং ল্যাডারের পাশে। আগেই পৌঁচেছে সোহেল, চোখে সানগ্লাস। হাতে ঝুলছে দুটো ওভারনাইট ব্যাগ।

'আমার মন কু ডাকছে রে,' নিচু স্বরে বলল সোহেল।

'উর্বশীকে ফিরে পেতে হলে এটাই একমাত্র উপায়। আমি পনেরোবার যোগাযোগ করেছি, কথা হয়নি ডিয়েটস কেসলারের সঙ্গে। প্রতিবার নিজের নাম বলেছি, শেষেরবার জানিয়েছি, আমরা কী জানতে পেরেছি। কিন্তু লোকটা যেন পণ করেছে, শুনবে না কিছুই। তার উপর জোর না খাটালে যা খুশি করবে।'

'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন কোনও সাহায্য করতে পারেন?'

'কিছুক্ষণ আগে যোগাযোগ করেছি। নরম স্বরে বললেন, লোকটার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। থাকলে হয়তো কিছু করা যেত। আসলে টাকার অভাব নেই রেসপন্সিভিস্টদের, ফলে

জোরালো প্রভাব ওয়াশিংটনে। শক্ত প্রমাণ না থাকলে কেসলারের বিরুদ্ধে যাওয়া অসম্ভব।'

'আমরা ফিলিপিন্সে না গিয়ে সরাসরি ঠিক জায়গায় হাত দিই না কেন? ধরে নিয়ে যাই কেসলারকে।'

'একই কথা ভেবেছি। আবছা ইঙ্গিতে আমাকে নিষেধ করেছেন অ্যাডমিরাল। ইউনাইটেড স্টেটসে-এ অপারেশন করতে গিয়ে ধরা পড়লে বাকি জীবন জেল থেকে বেরুতে পারব না।'

'ধরা পড়লে তবে তো।'

প্রিয় বন্ধুর দিকে চাইল রানা। 'যদি বাধ্য হই, যাব। হয়তো নষ্ট হবে অ্যাডমিরালের সঙ্গে সুসম্পর্ক। তারপরও। ডিয়েটস কেসলার বা তার স্ত্রীকে যদি কিডন্যাপ করতে পারি, সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে ছেড়ে দেবে উর্বশীকে।'

'তোর সঙ্গে আমিও যাব।'

এগজিকিউটিভ ওয়াটার ট্যাক্সি জাহাজের পাশে এসে ভিড়েছে। সত্যিই অপূর্ব সুন্দর বোট, তবে ওটার ড্রাইভারের তুলনা হয় না। তন্বী তরুণী স্বর্ণকেশী, পরনে সরু সবুজ ব্লাউজ, এদিকে স্কার্টটা উরুর তিন ইঞ্চি নেমেই শেষ। হ্যাঙারের ভিতর কপ্টার নষ্ট, ফলে দ্রুত তীরে পৌঁছতে নিতে হয়েছে হার্বার ট্যাক্সি। তা ছাড়া, ওরা চায়নি মার্ভেলের দিকে কারও মনোযোগ পড়ুক।

'ক্যাপিটেইন টম হবস্, জে সুইস স্টেলা,' বোটের অলস ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে বলল মেয়েটি।

অপলক চেয়ে রইল সোহেল। ঠোঁটে মধুর হাসি। 'এসব মেয়ে দেখবি শুধু মোনাকোয়,' নিচু স্বরে বলল। 'থাকবেই তো। ধনী লোক সারারাত ক্যাসিনোয় জুয়া শেষে ফিরবে নিজের

ইয়টে। নিশ্চয়ই চাইবে না বিশ্রী চেহারার কোনও ড্রাইভার তাকে পৌঁছে দিক।'

মেয়েটি একহাতে বোর্ডিং ল্যাডার ধরে ক্র্যাফট স্থির করে রেখেছে। একে একে তরতর করে নেমে এল রানা ও সোহেল। কাঁধ থেকে ডেকের উপর নামিয়ে রাখল ব্যাগগুলো।

'অনেক ধন্যবাদ, স্টেলা,' বলল রানা।

ওরা সিটে বসতেই ক্রোম থ্রটল কন্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত হলো সুন্দরী।

পঁচিশ ফুট উপরে মার্ভেলের রেলিং, ওখান থেকে ডেকে উঠল আতাসি, 'বস্, এক মিনিট!'

'কী?'

'একটা ব্যাপার খুঁজে পেয়েছি।'

'পরে বললে হয়? হাতে সময় নেই, অপেক্ষা করছে কপ্টার।'

'এক মিনিট! আসছি!' রেলিং টপকে নামতে শুরু করেছে আতাসি। বামহাতে মই বেয়ে নামছে, ডানহাতে ল্যাপটপ কম্পিউটার। প্রথমবারের মত দেখল স্টেলাকে। বিশাল চওড়া এক হাসি ফুটে উঠল গালে, মনে হলো ভুলে গেছে কী কারণে আসছে। 'নাউযুবিল্লাহ্! এ তো হুরপরি, বস্! আমার চাচাতো ভাইয়ের বউ হওয়ার মত! এতদিন একেই তো খুঁজছি আমরা!'

আতাসি নেমে আসতেই মেয়েটির দিকে সামান্য মাথা দোলাল রানা। থ্রটলে মোচড় দিল সুন্দরী। সোহেল চলে গেল বোটের সামনে, মেয়েটির মনোযোগ ধরে রাখবে। এই সুযোগে কী ঘটেছে রানাকে বলবে আতাসি। রওনা হয়ে গেল বোট। প্রচণ্ড গর্জন করছে ইঞ্জিন। গলা উঁচিয়ে কথা বলতে হবে। সামনে থেকে আসছে প্রবল হাওয়া।

'কী?' জানতে চাইল রানা।

কম্পিউটার খুলল আতাসি। 'জাহাজে অস্বাভাবিক দুর্ঘটনার ব্যাপারে চেক করছি, বস্! রেসপন্সিভিস্টদের ওই সব সি রিট্রিট!'

'কী পেলে?'

'কী পাইনি, বস্! আপনি কিছুদিনের খবরগুলো দেখেছেন? ক্রুজ শিপে বেড়ে গেছে ভাইরাসের আক্রমণ! গ্যাসট্রোইন-টেস্টিনাল নরোভাইরাস!'

'গত কয়েক বছর ধরে চলছে।'

'এটা সাধারণ বিষয় নয়। প্রথমে আমি ক্রুজ কোম্পানির কাছ থেকে নিয়েছি যাত্রীদের ম্যানিফেস্ট।' কীভাবে তথ্য জোগাড় করেছে, জানতে চাইল না রানা। 'ওটা ক্রস-রেফারেন্স করেছি রেসপন্সিভিস্টদের সদস্য লিস্টের সঙ্গে। তারপর বুঝলাম সব কিছুর ভিতর রয়েছে সরল প্যাটার্ন। আমি বিশেষ মনোযোগ দিলাম ক্রুজ লাইনারগুলোর দিকে। যেসব যাত্রায় দেখা দিয়েছে অস্বাভাবিক অসুস্থতা। এরপর মাটি খুঁড়ে বহু কিছু পাওয়া গেল। এসব জাহাজে দুই বছরে সতেরোটা অস্বাভাবিক অসুস্থতা ঘটে। এগুলোর মধ্যে ষোলোবার ঘটে এমন সব জাহাজে, যেখানে ছিল রেসপন্সিভিস্টরা। সতেরোতম আক্রমণ কোনও নোরোভাইরাস ছিল না, ওটা ছিল ই-কোলাই। পাওয়া যায় ক্যালিফোর্নিয়ায় এক লেটুস ফার্মের সাপ্লাইয়ে। ওই ই-কোলাইয়ের স্ট্রেন ফ্লোরিডা, জর্জিয়া ও অ্যালাবামাকেও আক্রমণ করে।'

'আর কিছু?'

'পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গেল। আপনি তো জানেন, বস্, এসব ক্রুজ লাইন্স বা বন্দরে ভাইরাসের আক্রমণের কোনও প্যাটার্ন নেই। তবে ঠিক দেখবেন এক ধরনের প্যাটার্ন

আছেও। প্রথমবার সামান্য কয়েকজন যাত্রী আক্রান্ত হয়, তাদের বেশিরভাগই ছিল বয়স্ক। দ্বিতীয় আক্রমণে চল্লিশজন লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে দুই মাস আগে ডোমিনো নামের এক জাহাজে সতেরোতম আক্রমণ হয়। তখন প্রায় প্রতিটি মানুষ ইনফেক্টেড হয়। সে সময় কপ্টারে করে মেডিকেল টিম নিয়ে যেতে হয়। এরপর বন্দরে জাহাজ ফিরিয়ে নেবার দায়িত্ব নেয় নতুন একদল অফিসার।'

নরম চামড়ার সিটে হেলান দিল রানা। বোটের ইঞ্জিন গর্জে চলেছে। তার উপর দিয়ে ভেসে এল স্টেলার হাসির নূপুর-ঝংকার। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল রানা, 'ওরা নিখুঁত করছে ডিসবার্সাল মেথড।'

'মিস্টার অনিলও একই কথা বললেন। প্রতিবার আগের চেয়ে খুঁত কমিয়ে আনছে। আর এখন তো এক শ' পার্সেন্ট লোককে ইনফেক্টেড করতে পারছে।'

'এই প্যাটার্নে গোল্ড অভ মার্সের ভূমিকা কোথায়?'

'এরা যখন বুঝল পুরো জাহাজ ভরা লোক খুন করা সম্ভব, তখন দরকার পড়ল শেষ একটা পরীক্ষা। কাজেই টেস্ট করল তাদের টক্সিনের কার্যকারিতা।'

'নিজ লোকের উপর,' প্রায় বিড়বিড় করে বলল রানা।

শুনতে পেয়েছে আতাসি। মাথা দুলিয়ে বলল, 'এরা সেই লোক, যারা তৈরি করেছে ভাইরাস। তাদের কেউ যদি মনস্থির করত মুখ খুলবে, আর এসবের সঙ্গে জড়াবে না, তাই।'

'তাই এই টোটাল এলিমিনেশন!'

রানার সামনে মস্ত এক পাযলের টুকরো মিলতে শুরু করেছে। তবে অনেক অংশ এখনও মিলছে না। ক্রুজ শিপে গণহত্যা করে লাভ কী? জবাব নেই কোনও। রেসপন্সিভিস্টদের

সংগঠন কোনও টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন নয়। তেমন হলে আগেই ধরা পড়ত। এ ধরনের অস্ত্র পাওয়ার জন্য বহু কিছু দিতে রাজি বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠন বা সন্ত্রাসীরা। তবে বিক্রি করে টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে তৈরি করেনি এরা ভাইরাস। রেসপন্সিভিস্টদের টাকার অভাব নেই, এদের কাছে হুড়-হুড় করে আসছে হলিউডি টাকা।

এরা চায় জনসংখ্যা কমিয়ে রাখতে। সেজন্য জাহাজ ভরা রিটায়ার্ড মানুষগুলোকে খুন করলে লাভ কী? এভাবে ক'জনকে মারবে? পনেরো হাজার, বিশ হাজার? তাতে বিশ্ব ভরা কোটি কোটি মানুষ কমবে না। যদি এতই উন্মাদ হয়ে থাকে, আরও অনেক বড় কোনও পরিকল্পনা নিয়ে এগুবে। খুন করতে চাইবে লাখ লাখ মানুষকে।

রানার মনের ভিতর ঘুরপাক খেয়ে চলেছে পাযল। তবে অসংখ্য টুকরো মিলছে না। 'আমরা এখনও অনেক তথ্য জানি না, যেগুলো খুব জরুরি।'

ইনার হার্বারে ঢুকতেই গতি কমে এল স্পিডবোটের। চলেছে অভিজাত এক রেস্টুরেন্টের পাশের পিয়ারের দিকে। এক ওয়েটার হোসপাইপ দিয়ে ধুয়ে চলেছে কাঠের জেটি। বারবার চাইছে একটা ভিড়ের দিকে। লোকগুলো সারারাত মদপান করে এখন আসছে নাস্তার জন্য।

'আমরা আসলে সব তথ্য একটার সঙ্গে আরেকটা মেলাতে পারছি না, তাই না, বস্?' বলল আতাসি। 'এটা তো ধরে নিতে পারি, ওদের লোকের কাজ ক্রুজ শিপে সাধারণ মানুষকে ইনফেক্ট করা। এখন মানুষ খুন করতে তারা এক শ' পার্সেন্ট সফল।'

'এক শ' পার্সেন্ট নয়, ওরা যদি গোল্ড অভ মার্সে ভাইরাস

ছড়িয়ে থাকে, বাঁচত না হেলেনও।'

'সে তো বেঁচেছে সাপ্লিমেণ্টাল অক্সিজেনের কারণে।'

'নাকে ক্যানিউলা থাকলেও জাহাজের ভেণ্টিলেশন সিস্টেমের ভিতর দিয়েই শ্বাস নিয়েছে।'

'ভাইরাস হয়তো এয়ারবোর্ন ছিল না। পানি বা খাবারে মিশিয়ে দিতে পারে। তদন্ত করলে হয়তো জানা যাবে পানি বা খাবার গ্রহণ করেনি হেলেন।'

'তুমি নিজেও জানো অমন হতে পারে না। একই সময়ে প্রত্যেকটা লোক মারা পড়ে। এমন কী কেউ রেডিও করতেও পারেনি। শত শত মানুষকে পানি বা খাবার খেতে বাধ্য করা যায় না। কাজেই, খাবার বা পানির ভিতর ভাইরাস ছিল না।'

আস্তে করে মাথা দোলাল আতাসি। 'দুঃখিত, বস্। এঁড়ে ষাঁড়ের মত তর্ক করেছি, খামোকা।'

'অবশ্য এমন হতে পারে, গোল্ড অভ মার্সের আক্রমণ সাধারণ প্যাটার্নের বাইরের কিছু।'

'যেমন, বস্?'

'জানি না। ভাবছি। রেসপন্সিভিস্টরা প্রায় এক শ' পার্সেণ্ট সফল হয় দু' মাস আগে।'

'ডোমিনো জাহাজে।'

'ঠিক। ওখানে। তা হলে নতুন করে আবার অন্য কোনও জাহাজে হামলা কেন? ওরা তো জেনে ফেলেছে ওদের ভাইরাস ঠিক ভাবে কাজ করছে।'

'এমন হতে পারে গোল্ড অভ মার্সের লোকগুলোর মুখ বন্ধ করতে এই ব্যবস্থা নেয়া হয়।'

পিয়ারের সঙ্গে বোটের লাইন বেঁধে ফেলেছে স্টেলা, উঠে দাঁড়াল রানা। 'তা হতে পারে। তুমি কাজ চালিয়ে যাও। আমরা

চার্টার জেট নিয়ে পৌঁছব ম্যানিলায়। তার আগেই অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে আলাপ করব। উনি ডিয়েটস কেসলারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না নিলেও, ক্রুজ লাইন্সগুলোকে জানিয়ে দিতে পারেন, তাদের যে-কোনও সময়ে আক্রমণের হুমকি দেবে একদল টেরোরিস্ট।' ওয়াটার ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বলল রানা, 'স্টেলা?'

'কুই, ক্যাপিটেইন।'

'আমার সঙ্গীকে আবার আমাদের জাহাজে পৌঁছে দেবে, তোমার বসের সঙ্গে বিলের ব্যাপার পরে ঠিক করে নেব।'

'অফ কোর্স, স্যর। কোনও সমস্যা নেই।'

আতাসির দিকে চাইল রানা। 'লেগে থাকো। নতুন কিছু জানলে আমাকে জানিয়ে দিয়ো।'

'ঠিক আছে, বস্। আর এই সুযোগে দেখি এ মেয়ের সঙ্গে চাচাতো ভাইয়ের বিয়েটা লাগিয়ে দিতে পারি কি না।'

কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বোট থেকে ডকে নেমে এল রানা ও সোহেল। হাঁটতে শুরু করে শুনতে পেল আতাসির কণ্ঠ। মিহি স্বরে আলাপ জুড়েছে সুন্দরীর সঙ্গে।

দুই

ঘুম ভেঙে গেছে উর্বশীর। ভাবতে চাইল কখন ঘুমিয়েছে। মনে নেই কিছুই। দপদপে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে ঊরু থেকে। বিশ্রী

টিসটিসে অনুভূতি মাথার তালুর ভিতর। প্রথমে মন চাইল, মাথা টিপে ধরে। কিন্তু সাইক্লোনের মত ছিটিয়ে পড়ছে উরুর ব্যথা। তবে চেতনা ফিরে এসেছে ওটার কারণেই। বুঝতে পারছে পড়ে থাকতে হবে চুপচাপ। আগে জানা দরকার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে কি না। এ খুব জরুরি, কিন্তু কেন জরুরি, মনে পড়ছে না। তিলতিল করে পেরিয়ে চলেছে সময়। কতক্ষণ পেরুল? পাঁচ মিনিট? আবার দশ মিনিটও হতে পারে। মাথার তালুর ব্যথা, বা উরুর ব্যথা, এ ছাড়া কোনও অনুভূতি নেই। ...না, আছে, হৃৎপিণ্ডের কম্পন? শান্ত ভাবে চলছে ওটা।

আরও সচেতন হয়ে উঠল উর্বশী। শুয়ে আছে কটে। চাদর বা বালিশ নেই। পিঠের নীচে নারকেল-ছোবড়ার কর্কশ ম্যাট্রেস। ভঙ্গি নিল, যেন ঘুমে কাদা। তারই ফাঁকে নড়ে-চড়ে শুলো। এখন জানে, ওকে উলঙ্গ করা হয়নি। বুকের উপর শার্ট। জিন্সের প্যান্ট কোমরে। তবে পায়ের গোড়ালি ও হাতের কব্জিগুলোতে শক্ত দড়ির বাঁধন। বন্দি করে রাখা হয়েছে ওকে।

হঠাৎ আচমকা সব মনে পড়ল। জ্যারোন ব্রাঙ্কো, ফু-চুঙের পালিয়ে যাওয়া, তারপর কে যেন ওর নাকে-মুখে চেপে ধরল মিষ্টি সুবাসের কাপড়। খুব মাথা ধরল ড্রাগ দেয়ায়। তারপর কী?

এরপর একটা ভ্যানের ভিতর ছিল। হোটেল থেকে সরিয়ে নিল ওকে। স্বল্প পরিমাণে নার্কোটিক দিয়েছে ব্রাঙ্কো, মাতাল হয়ে উঠল। যেন পার্টি থেকে সরিয়ে নিয়ে চলেছে ওকে। ভ্যানের পিছনে শুইয়ে দেয়া হলো। আবছা ক'জনের অবয়ব। তাদের ভিতর ছিল অমল? বা ডক্টর চার্চ? বলতে পারবে না।

ওর দেহের উপর ডাণ্ডার মত কিছু বোলাল ব্রাঙ্কো। জিনিসটা এয়ারপোর্টের মেটাল ডিটেক্টরের মত। তারপর উরুর উপর ডাণ্ডা

আসতেই টিট-টিট শব্দ উঠল। পায়ে বাঁধা খাপ থেকে ছোরা বের করল ব্রাঙ্কো, ওটা দিয়ে চিরে দিল ওর প্যান্ট। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর লোকটা পুরনো ক্ষতটা পেয়ে গেল। ঘ্যাচ করে ওই ক্ষতের উপর চালাল ছোরা। চিরচির করে কাটছে পেশি। সামান্য অ্যানেস্থিযিয়া ছিল, তবে ওর মনে হলো গনগনে আগুন পুড়িয়ে দিচ্ছে পা-টা। তীব্র ব্যথায় চিৎকার করতে চাইল। কিন্তু আগেই মুখ বেঁধে দিয়েছে। ছটফট করে সরে যেতে চাইল, কিন্তু কে যেন ওর দুই কাঁধ ধরে মেঝের সঙ্গে চেপে রাখল।

চিরে যাওয়া জায়গার ভিতর ছোরা দিয়ে খুঁচিয়ে চলেছে ব্রাঙ্কো, তারপর দুই আঙুল ভরে দিল কাটা মাংসের ভিতর। বহু গুণ বেড়ে গেল ব্যথা। গলগল করে বেরুতে লাগল রক্ত। কষ্ট সহ্য করতে চাইল উর্বশী, কিন্তু ব্যথা অসহ্য। হাতে কোনও গ্লাভস্ নেই, ক্ষত ঘেঁটে চলেছে ব্রাঙ্কো। রক্তে ভিজে গেল কব্জির কাছে শার্ট।

মনে হলো এক যুগ পর বলল, 'হ্যাঁ।' তারপর সরিয়ে নিল হাত।

ওই ট্র্যান্সডার্মাল ট্র্যান্সপণ্ডার বড়জোর ছোট একটা ডিজিটাল ঘড়ির মত। জিনিসটা ওর চোখের সামনে ধরল ব্রাঙ্কো, তারপর ওটা ফেলল ভ্যানের মেঝের উপর, পিস্তলের বাট দিয়ে পিষে দিল। ভুরু কুঁচকে ফেলল উর্বশী। দেখতে না দেখতে গুঁড়ো হয়ে গেল প্লাস্টিক ও ইলেকট্রনিক্স।

এবার ওর বাহুর ভিতর গেঁথে দিল হাইপোডারমিক নিডল, নিচু স্বরে বলল, 'ড্রাগ কাজ শুরু করার পর ট্র্যান্সপণ্ডারটা বের করতে পারতাম, কিন্তু সেক্ষেত্রে এরকম মজা হতো?'

আর কিছুই মনে নেই ওর। এরপর এইমাত্র ফিরেছে জ্ঞান। কোথায় বন্দি, জানে না। ইচ্ছে করছে মাথার তালু টিপতে, তা

ছাড়া পরীক্ষা করে দেখতে হবে পায়ের অবস্থা। কিন্তু শক্ত বাঁধনের কারণে কিছু করা অসম্ভব। ঘরে একা। বেশ কিছুক্ষণ হলো কান পেতেছে। কাজ করছে সব ক'টি ইন্দ্রিয়। বুজে রইল চোখ। দেয়ালে ক্যামেরা থাকতে পারে, তা ছাড়া কাছেই থাকতে পারে মাইক্রোফোন। ও যে জেগে উঠেছে, তা শত্রুরা বুঝবার আগে একটু সময় পেতে চাইছে। আগে শরীর থেকে কমে আসুক ড্রাগসের প্রতিক্রিয়া। বুঝতে পারছে, সামনে কঠিন সময় পার করতে হবে। তার আগে যতটা পারা যায় নিজেকে ফিট রাখা।

একঘণ্টা পেরুল, বা দশ মিনিটও হতে পারে। বুঝবার উপায় নেই। ধারণা নেই এখন ক'টা বাজে। দেহ-ঘড়ি সঠিক ভাবে জানান না দিলে, বা সময় জানতে না পারলে অসহায় হয়ে পড়ে মানুষ। আর সে-সুযোগ গ্রহণ করে দক্ষ ইন্টারোগেটর। কাজেই মন থেকে মুছে ফেলল উর্বশী দিন-তারিখ-সময়—সব। এখন দিন, সকাল, দুপুর, বিকেল বা রাত, এ নিয়ে ভাবতে গিয়ে পাগল হয়ে ওঠে বেশিরভাগ বন্দি। কিন্তু কিছুই জানতে চাইছে না উর্বশী, সময় বিষয়টি নিয়ে অত্যাচার করতে চাইবে ব্রাঙ্কো। কিন্তু ব্যর্থ হতে হবে তাকে।

ইরাক যুদ্ধে বন্দি হওয়ার পর বেশি ভাবতে হয়নি ওকে। খাঁচা বা বাক্সের ভিতর পুরে রাখা হতো। তখন প্রতিদিন সূর্যের আলো দেখতে পেয়েছে। তবে ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সে এসে শিখেছে ইন্টারোগেশন টেকনিক। বন্দির কাছে সময় অর্থবহ মনে হলে, তা শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ব্রাঙ্কো তাই চাইবে।

এরা আর কী করবে, ওর জানা নেই। কাজেই মন থেকে সব চিন্তা দূর করে দিয়ে অপেক্ষা করতে চাইছে। যা হওয়ার তা

এমনিতেই হবে।

কাছেই কোথায় যেন ভারী তালা খোলা হলো। দূর থেকে কে যেন হেঁটে আসছে। দরজা নিশ্চয়ই ভারী কিছুর। তা হলে বোধহয় এই ঘর জেলখানার মত করে তৈরি। ওকে অল্পক্ষণের জন্য এখানে রাখা হয়নি। তার মানে রেসপন্সিভিস্টদের এ ধরনের সেল আছে। দরকার পড়লে সেখানে বন্দি করা হয়।

ক্যাচ-কোঁচ আওয়াজ তুলে খুলে গেল দরজা। ধাতব কবজার উপর মরিচা। নিয়মিত ব্যবহার হয় না সেল। অথবা এ ঘরের আশপাশের আবহাওয়া ভেজা। ঘরটা মাটির নীচেও হতে পারে। সামান্যতম নড়ল না উর্বশী। দু' জোড়া পায়ের আওয়াজ। আসছে ওর কটের দিকে। দু'জনের একজন ভারী গড়নের। তবে কোনও সন্দেহ নেই দ্বিতীয়জন পুরুষ। ব্রাঙ্কো? সঙ্গে কোনও চ্যালা?

'এতক্ষণে জেগে ওঠার কথা,' বলল ব্রাঙ্কো।

'ঠিক,' সায় দিল তার সঙ্গী। আমেরিকান নাকি সুর। 'তবে মানুষ একজন থেকে আরেকজন আলাদা।'

আস্তে করে উর্বশীর গালে চাপড় দিল ব্রাঙ্কো। খুব দুর্বল স্বরে কী যেন বলে উঠল উর্বশী। এমন ভঙ্গি নিয়েছে, আবছা ভাবে টের পেয়েছে কেউ আশপাশে আছে। তবে গাঢ় ঘুম ভাঙতে চাইছে না।

'চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে,' বলল খুনি সার্ব। 'আর এক ঘণ্টার ভিতর যদি না ওঠে, ওকে স্টিমুল্যান্ট ইনজেক্ট করব।'

'দুই ধরনের ড্রাগ মিলে হার্ট অ্যাটাক হলে?'

'হলে কী আর করা!'

মনের ভিতর গেঁথে নিল উর্বশী, ব্রাঙ্কো ইঞ্জেকশন দেয়ার আগেই জেগে উঠতে হবে।

'যে-কোনও সময়ে পৌঁছুবেন মিস্টার কেসলার। তার আগেই জানতে হবে এ ওর ভাইয়ের সঙ্গে কী আলাপ করেছে। যতক্ষণ পেরেছে সিডেটিভ দিয়ে রেখেছিল। তবে ছোকরা ড্রাগের ঘোরে কী বলেছে, তা কে জানে!'

এদের দ্রুত তথ্য দরকার, ভাবল উর্বশী। সাধারণ মানুষ মনে করে দ্রুত ইন্টারোগেশন করা সম্ভব। মস্ত ভুল ধারণা। ভাল ভাবে তথ্য আদায় করতে চাইলে কখনও কখনও সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাজ করতে হয়। কখনও কয়েক মাস। সহজে তথ্য পেতে হলে প্রচণ্ড ব্যথা দেয়ার নিয়ম। কিন্তু সমস্যা হলো: ইন্টারোগেটর ব্যথা দিলে সে যা শুনতে চাইছে, তাই জানাতে শুরু করে মানুষ। সঠিক পথ: ইন্টারোগেটর মোটেই নিজের উদ্দেশ্য প্রকাশ করবে না। এমন পরিস্থিতি তৈরি করবে, যাতে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সত্যি কথা বলতে শুরু করে বন্দি।

আপাতত এক ঘণ্টা হাতে, ভাবল উর্বশী। সত্যি কথা কক্ষনো বলব না, তবে এরইমধ্যে ভেবে বের করতে হবে ব্রাঙ্কো কী জানতে চায়।

ব্যারিকেড পেরিয়ে মুভি সেটে ঢুকে পড়ল মোফিজ বিল্লাহ, তিক্ত হাসল। এই মায়াজগতে যখন ছিল, তখনও ভাল লাগত না চারপাশের মানুষগুলোর ভণ্ডামি। তারপর তো কাজ ছেড়ে চলেই গেল নিজ দেশে। বোনের কাছে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর কখনও এ জগতের নোংরামির ভিতর পা রাখবে না। কিন্তু মাসুদ ভাইয়ের কারণে আসতেই হলো। হয়তো মাফ করবে আদরের ছোট্ট বোনটি।

স্ক্রিপ্টের এ অংশে জার্মানির রিউনিফিকেশনের সময় পরিত্যক্ত এক ওয়্যারহাউসে বন্দি হবে পার্লা মোনা। বিল্ডিং

দেখে মার্ভেলের কথা মনে পড়ল মোফিজের। তবে এখানে সত্যিকারের মরিচার অভাব নেই। বাঁকা চাঁদের মত রাখা হয়েছে ছ'টা সেমিট্রেইলার। পাশেই দুটো ক্যাটারিং ট্রাক। চারদিকে ক্যামেরার জন্য স্ক্যাফোল্ড ও ডলি ক্রেন। রয়েছে ন্যারো গেজ ট্র্যাক। তার উপর দিয়ে চলছে শট তোলা। জায়গাটা যেন পার্কিং লট। সেটের চারপাশে দৌড়াদৌড়ি করছে অসংখ্য মানুষ। এখন ওভারটাইম চলছে। সিনেমার জগতে সময় খুব জরুরি, সময় মানেই টাকা। মোফিজ শুনেছে এই সিনেমার প্রডিউসার প্রতিদিন এখানে তিন লাখ ডলার খরচ করছেন।

বিগ বাজেট মোশন পিকচারে থাকবে মানুষের হই-চই, এতে অভ্যস্ত ছিল বিল্লাহ। তবে এখন কেমন যেন বিরক্তি ধরে গেল। এসব যেন অনেক দূরে অন্য কোনও গ্রহে ঘটছে।

ইউনিফর্ম পরা নিরস্ত্র এক গার্ড আসছে ওর দিকে, তবে লটের আরেক পাশ থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি কাকে দেখছি! এ কি সত্যিই আমাদের সেই মোফিজ বিল্লাহ?'

গার্ডকে পাশ কাটিয়ে ছুটতে ছুটতে এল কাইলি স্মিথ, পরক্ষণে এসে জড়িয়ে ধরল মোফিজ বিল্লাহকে। চপাচপ দুটো ভেজা চুমো দিল দুই গালে। দশ সেকেণ্ড পর এক পা পিছিয়ে দেখল মোফিজকে। 'আরে, বিল্লাহ, তোমাকে তো দারুণ সুন্দর লাগছে!'

'কোনও ডায়েট দিয়ে কাজ হয়নি, শেষে কয়েক বছর আগে স্টমাক বাইপাস সার্জারি করিয়েছি।'

এখন সে এক শ' পঁচাশি পাউণ্ড ওজন নিয়ে খুশি। থলথল করছে না শরীর। ব্যায়াম করে না বটে, তবে বাইরের খাবার ত্যাগ করেছে।

'দারুণ কাজ হয়েছে দেখছি, এখন আবার তরুণ!'

মোফিজকে প্রায় ঘুরিয়ে ফেলল কাইলি, ডানহাত দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছে ওর বাহু। একসারি ট্রেইলারের দিকে নিয়ে চলল। কাইলি মেয়েটির বয়স তিরিশ থেকে শুরু করে পঞ্চাশ পর্যন্ত যা খুশি হতে পারে। আসল বয়স মোফিজ বলতে পারবে না। জানে না কেউ। চুলগুলো বেগুনি রঙের। উজ্জ্বল রঙের সাইকেল প্যান্ট পরেছে, পেটের কাছে থেমে গেছে ছেঁড়া অক্সফোর্ড শার্ট। গলা থেকে ঝুলছে কমপক্ষে বিশটা সোনার নেকলেস। দুই কানে কম করেও বিশটা খুদে গর্ত। একসময় ছিল মোফিজ বিল্লাহর অ্যাসিস্ট্যান্ট। এখন নিজগুণে নামী-দামি মেকাপ আর্টিস্ট। সে সময়ে মেকআপ আর্টিস্ট হিসাবে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের জন্য বিল্লাহকে নমিনেট করা হয়। তবে অ্যাওয়ার্ড মেলেনি ওর। অযোগ্য এক শ্বেতাঙ্গ মেকআপ-ম্যানকে দেয়া হয় সেটা। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে কাইলি।

'অন্তত দশ বছর হলো তুমি সবার রেইডার থেকে হারিয়ে গেছ। কেন? কেউ জানে না তুমি কোথায়, কী করছ।' ঝড়ের মত বলে চলেছে কাইলি। 'খুলে বলো তো শুনি, এখন কী করছ!'

'বলার মত কিছু না।'

একটা বাবল-গাম ফোলাল কাইলি। 'যা বললে না! তুমি হঠাৎ উধাও হয়ে গেলে। দশ বছরের বেশি হলো। বলার মত কিছু নেই বললেই শুনব? মানব? এক মিনিট, ওহ্-হো, তুমি তো পার্লা মোনার সঙ্গে কথা বলতে চাও। তুমি আবার ওর দলের সঙ্গে মিশছ নাকি? মানে ওই রিয়্যাকশনিস্ট হয়ে গেছ?'

'রেসপন্সিভিস্ট,' শুধরে দিল মোফিজ।

'যা খুশি হোক, আমার কী?' বলল কাইলি। 'তো ওদের সঙ্গে আছ?'

'না। ঠিক তা নয়। তবে এদের সম্পর্কে কিছু জানতে চাই ওর কাছে।'

মেকআপ ট্রেইলারে পৌঁছে গেছে ওরা। নিজেরটার দরজা খুলল কাইলি, মোফিজকে নিয়ে উঠে পড়ল ভিতরে। চারপাশে কসমেটিক্সের মোম ও পটপউরির গন্ধ ভুরভুর করছে। এক পাশে ছয়টি চেয়ার রাখা। সামনের দেয়ালে বিস্তৃত আয়না। কাউন্টারের উপর অসংখ্য বোতল ও জার, হাজারো আকৃতির। এখানে ওখানে আইলাইনার পেন্সিল। এতরকমের ব্রাশ যে ফুটবল স্টেডিয়াম ঝাড়ু দেয়া যায়। ছোট্ট ফ্রিজ থেকে দুটো পানির বোতল নিল কাইলি, একটা বাড়িয়ে দিল মোফিজের দিকে। হাতের ইশারা করে চেয়ারে বসতে বলল। নিজেও বসে পড়ল। তীব্র আলোয় কাইলির চুলগুলো হাওয়াই মিঠাইয়ের মত লাগছে, তবে বেগুনি রঙের।

'বলো না, বিল্লাহ, এরপর কী করলে। অস্কারের পরপরই উধাও হয়ে গেলে কোথায়? ওই পুরস্কার তোমার পাওয়ার কথা ছিল। এরপর স্রেফ উধাও হয়ে গেলে। কোথায় কী করলে?'

'বাধ্য হয়ে হলিউড থেকে সরে গেলাম। আর সহ্য করতে পারিনি নকল ওই জগৎটা।' নিজ জীবনের গল্প শোনাতে আসেনি মোফিজ, তবে কাইলি সত্যি ভাল বন্ধু ছিল। মিথ্যা বলতে চাইল না সে। 'তুমি তো আমাকে চেনো। কেউ দুর্ব্যবহার করলে পাল্টা জবাব দিই। এখানে আর ভাল লাগছিল না। দেশে ফিরে ব্যবসা শুরু করলাম। ওখানেই রয়ে গেলাম।'

'সত্যিই, নাইন/ইলেভেনের পর খুব খারাপ ব্যবহার করেছে সবাই তোমার সঙ্গে।'

'ওরা জানে না সেদিন আমার ছোট বোন বস্টন থেকে আসছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। বিমানটা বিধ্বস্ত হলো নর্থ

টাওয়ারে।'

আফসোস করে মাথা দোলাল কাইলি। 'থাক, না-ই বা বললে ওই কষ্টের কথা।' মোফিজের হাত ধরল সে। 'আমি সত্যিই দুঃখিত। মনে করিয়ে দিতে চাইনি।'

'কাউকে কিছু বলতে চাইনি। সহ্য করে গেছি চুপচাপ।'

'এরপর চলে গেলে তুমি বাংলাদেশে। যোগাযোগ করতে চেয়েছি, কিন্তু ঠিকানা পাইনি।'

'দেশে ফিরে দ্বিতীয়বার ফিরতে চাইনি আর হলিউডে। ওই জগৎ নকল মানুষে ভরা। কারও মন ছুঁতে পারবে না তুমি। মিথ্যা গর্ব নিয়ে ময়ূরের মত পেখম মেলে চলছে সবাই। টাকার জোরে সব পেতে চাইছে, কিন্তু ভিতরটা ফাঁপা।'

'সত্যিই তাই,' বলল কাইলি। 'টাকা পাই তাই রয়ে গেছি। যখন বুঝব বাকি জীবন চালিয়ে নেয়ার মত টাকা হয়ে গেছে, আমিও অবসর নেব।'

মেয়েটির কথার পর নীরবতা নামল ট্রেইলারে। থমথম করছে পরিবেশ। দুই বন্ধু কোনও কথা খুঁজে পেল না। কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল, তারপর হঠাৎ খুলে গেল ট্রেইলারের দরজা। ধাপ বেয়ে উঠে এসেছে পার্লা মোনা। প্রায় প্রতিদিন তাকে ইন্টারভিউ দিতে হয়, যেখানে যায় মেলে লাল কার্পেট সম্বর্ধনা—সে যেন হয়ে উঠেছে আভিজাত্য ও সৌন্দর্যের প্রতিমা। প্রায় ঝড়ের গতিতে ট্রেইলারে ঢুকল সে, চুলগুলো ঢেকেছে বেসবল ক্যাপের নীচে। এই মুহূর্তে কোনও মেকআপ নেই মুখে। রোগী মনে হলো। বয়স হবে পঁচিশ কি তিরিশ। মুখভঙ্গি বলছে সে জানে নিজের ক্ষমতা। দুই চোখের শিরাগুলো রক্তলাল, চোখ ঘিরে গোলাকার কালো দাগ। এগিয়ে আসতেই তার মুখে গতরাতের অ্যালকোহলের বাসি গন্ধ পেল বিল্লাহ।

‘কে এই জাহান্নামের লোক? এখানে কী করছে?’ কড়া স্বরে জানতে চাইল পার্লা মোনা। এ মুহূর্তে তার মিষ্টি স্বর ফেটে গেছে হ্যাংওভারের কারণে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল, চেয়ে রইল মোফিজ বিল্লার দিকে, কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝতে পারল সামনে কে। ‘তুমি মোফিজ বিল্লাহ্ না? তুমিই তো ফ্যামিলি টাই সিনেমায় আমার মেকআপ করেছিলে।’

‘সে সিনেমায় তুমি ভাল ব্রেক পাও,’ উঠে দাঁড়াল মোফিজ।

‘সেরা আমি হতামই, আগে আর পরে,’ বলল পার্লা মোনা। কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ল গর্ব। নিজেকে মস্ত কেউ ভাবছে। মোফিজ যে চেয়ার ছেড়েছে সেটাতে বসে পড়ল, কাঁধের উপর দিয়ে চাইল কাইলির দিকে। ‘আমার চোখের নীচে যে থলিগুলো ঝুলছে, ওগুলো দূর করে দাও। কয়েক ঘণ্টা পর শুট করতে হবে, তবে চাই না কেউ এই অবস্থায় আমাকে দেখে ফেলুক।’

মোফিজের বলতে ইচ্ছে করল, তোমার উচিত নয় সারারাত ধরে একের পর এক ক্লাবে ঢুঁ দেয়া। জিভ সামলাও, নইলে কিছুদিনের মধ্যেই হারিয়ে যাবে।

চট্ করে একবার মোফিজের দিকে চাইল কাইলি, নীরবে যেন সায় দিয়ে চলেছে। ‘ঠিক আছে, হানি, সব ঠিক করে দিচ্ছি। এখনই ব্যবস্থা হবে।’

‘এই সিনেমার সঙ্গে আছ তুমি, বিল্লাহ?’ জানতে চাইল পার্লা মোনা। ব্রাশ ও আইলাইনার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কাইলি।

‘ঠিক তা নয়। আমি এখানে এসেছি তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে, যদি খানিক সময় দাও।’

বিরক্ত ভঙ্গিতে শ্রাগ করল পার্লা মোনা। ‘বলো কী বলতে চাও।’

কাইলির দিকে চাইল মোফিজ। বুঝতে পেরেছে মেয়েটি।

'মোনা হানি, মোফিজ তোমার মেকআপ করে দিক, সেইসঙ্গে আলাপও চলতে পারে।'

'ঠিক আছে।'

নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়ল মোফিজ, নিঃশব্দ ধন্যবাদ। চেয়ারের পাশ থেকে সরে গেল কাইলি, ওর হাত থেকে ব্রাশ নিল মোফিজ। ট্রেইলার থেকে নেমে চলে গেল মেয়েটি, এবার কাজে নামল দুনিয়ার সেরা মেকআপ আর্টিস্ট। 'আমি আসলে এসেছি ডিয়েটস কেসলার আর রেসপন্সিভিস্ট মুভমেণ্ট সম্বন্ধে জানতে।'

মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল পার্লা মোনা। 'দুঃখিত, এ বিষয়ে কথা বলব না আমি।'

'খুব জরুরি, হানি। এর উপর মানুষের জীবন নির্ভর করছে।'

'আমি এসব নিয়ে আলাপ চাইছি না, ঠিক আছে? তুমি যদি আমার ক্যারিয়ার নিয়ে জানতে চাও, বা সামাজিক অবস্থান নিয়ে, তো ঠিক আছে; কিন্তু রেসপন্সিভিজম নিয়ে কোনও কথা বলতে চাই না, শুনতেও চাই না।'

'শুনতে দোষ কী?'

'আমি শুনতে চাই না, ব্যস!'

সানজিদা স্বর্ণা ইণ্টারোগেশনের ব্যাপারে গত একদিন কী শিখিয়েছে, মনে করতে চাইল মোফিজ। 'দু' সপ্তাহ আগে একটা জাহাজ চার্টার করে রেসপন্সিভিস্টরা, তবে সে জাহাজ ডুবে যায় মেডিটারেনিয়ান সাগরে।'

'হ্যাঁ, জানি। টিভির খবর শুনেছি। ওরা বলে বিশাল এক ঢেউ এসে ডুবিয়ে দেয় জাহাজ। ওই ঢেউকে কী যেন বলে।'

'রোগ ওয়েভ,' তথ্য যোগান দিল মোফিজ। 'ওগুলোকে বলে রোগ ওয়েভ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। সেই ঢেউ ডুবিয়ে দেয় জাহাজ।'

ব্যাকপ্যাক থেকে পাতলা ল্যাপটপ বের করল মোফিজ, ওটা খুলে রাখল কাউন্টারের উপর। সরে গেল কাইলির মেকআপের জিনিসগুলো। ওর কয়েক সেকেণ্ড লাগল সঠিক ফাইল খুঁজে বের করতে।

যে ছবি ভেসে উঠল তার কোয়ালিটি মোটেই ভাল নয়। ক্যামেরার জন্য যথেষ্ট আলো ছিল না। এসব তোলে ফু-চুং। তবে পরিষ্কার দেখা গেল ব্রিজের ভিতর বিকৃত ভাবে পড়ে আছে মৃতদেহগুলো। শরীর থেকে ঝরঝর করে ঝরেছে রক্ত। পুরো পাঁচ মিনিট দৃশ্যগুলো দেখাল মোফিজ বিল্লাহ।

ছবিগুলো মিলিয়ে যেতে চাপা শ্বাস ফেলল পার্লা মোনা। 'ওটা কীসের ছবি? ওই সিনেমায় কাজ করছ?'

'এই ছবিগুলো নেয়া হয়েছে গোল্ড অভ মার্স থেকে। আসলে ডুবে মরেনি ওরা, সমস্ত প্যাসেঞ্জার ও ক্রু খুন হয় ওখানে। কোনও ধরনের টক্সিন দিয়ে খুন করা হয়। মানুষগুলো এত দ্রুত মারা পড়ে যে রেডিও পর্যন্ত করতে পারেনি।' ভিডিওর আরেকটা দৃশ্য স্ক্রিনে নিয়ে এল মোফিজ। এটা এসেছে মার্ভেলের মাস্তুলের উপর থেকে। ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল গোল্ড অভ মার্স। তার আগে সার্চ লাইটে দেখা গেল জাহাজের বো-তে লেখা নাম।

বিভ্রান্ত মনে হলো পার্লা মোনাকে। 'ওই ছবিগুলো তুলেছে কে? তা ছাড়া সে বা তারা মিডিয়াকে জানায়নি কেন?'

'ফুটেজগুলো কে তুলেছে, তা জানাতে পারব না। তবে এখনও মিডিয়াকে জানানো হয়নি। এর কারণ ওই জাহাজে টেরোরিস্ট হামলা হয়। কর্তৃপক্ষ চাইছে না টেরোরিস্টরা আগে থেকে কিছু টের পেয়ে যাক।'

মনে মনে নিজের প্রশংসা না করে পারল না মোফিজ। ওর

কণ্ঠে কর্তৃত্ব ফুটে উঠেছে।

'তুমি কি..., সিআইএ... বা এ ধরনের কোনও সংগঠনের সঙ্গে রয়েছ?' বলল পার্লা মোনা।

'সরাসরি জবাব দেব না, হানি। তবে এই ছবি সঙ্গে থাকা কি প্রমাণ করে না, আমি কী ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত?'

'আমাকে এসব দেখালে কেন? আমি তো টেরোরিস্টদের ব্যাপারে কিছু জানি না।'

'ইণ্টারোগেশনের সময় কয়েকবার তোমার নাম উঠে এসেছে। প্রমাণগুলো আঙুল তাক করছে এই হামলার সঙ্গে জড়িত রেসপন্সিভিস্টদের কেউ কেউ ঠাণ্ডা মাথার খুনি।' নরম স্বরে বলছে মোফিজ। এখনও নিশ্চিত নয়, এই নায়িকা ওর কথা বিশ্বাস করবে কি না। হয়তো এখনই সিকিউরিটিকে ডাক দিয়ে ওকে এখান থেকে বের করে দেবে।

আয়নার ভিতর প্রতিচ্ছবি পড়ছে পার্লা মোনার। পাথরের মত বসে। মোফিজ বিল্লাহ ক্যারিয়ার শুরু করে মানুষের মুখের ছাপ দূর করতে। তবে এ মুহূর্তে পার্লা মোনার চোখ দেখে কিছুই বুঝতে পারল না। মনে মনে বলল, আমার কেমন লাগত, যদি জানতাম যে পীরকে শ্রদ্ধা করি, সে এক নৃশংস জঙ্গি।

'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না,' কিছুক্ষণ পর বলল পার্লা মোনা। 'আমার মন বলছে তুমি ওই ফুটেজ তৈরি করেছ কেসলার আর বার্থাকে ছোট করতে।'

যাক, কান ধরে বের করে দেবে না, ভাবল মোফিজ। জানতে চাইল, 'বলো তো কেন মিথ্যা বলব? আমার উদ্দেশ্য কী? এসব ভিডিও নকল করেছি, অর্ধেক দুনিয়া উড়ে এসেছি, শুধু তোমাকে দেখাতে?'

'আমি কী করে জানব তোমার উদ্দেশ্য কী!' ঝাঁঝ বেরুল

পার্লা মোনার কণ্ঠ থেকে।

'প্লিয, মোনা হানি, যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখো। আমার উদ্দেশ্য যদি হতো রেসপন্সিভিজমকে ছোট করা, তো আমি চলে যেতাম না সিএনএন বা ফক্সে?' কিছুক্ষণ পেরুল, জবাব দিল না পার্লা মোনা। এবার বলল মোফিজ, 'এবার নিজেই বলো, হানি।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।'

'আমি কি সিএনএন বা ফক্সে গেছি? আমার নিশ্চয়ই অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। ঠিক কি না?'

'তাই তো মনে হয়,' স্বীকার করল নায়িকা।

'তা হলে কেন আমি মিথ্যা বলব?'

'রেসপন্সিভিস্টরা কখনও হিংস্রতা পছন্দ করে না। এ হতে পারে না যে আমাদের গ্রুপ এসব করছে। তবে হতে পারে এরা র‍্যাডিক্যাল অ্যান্টিঅ্যাবর্শনিস্ট বা এ ধরনের কোনও সংগঠন।'

'মিস মোনা, আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো, মিথ্যে বলছি না—আমরা দুনিয়ার সমস্ত গ্রুপ ঘেঁটে দেখেছি। শেষ কথা হচ্ছে, ওই গণহত্যা করেছে রেসপন্সিভিস্টরাই। এতে কোনও ভুল নেই। কে বা কারা করেছে, এ নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না।' কিছুক্ষণ হলো গোয়েন্দা চরিত্রে অভিনয় শুরু করেছে মোফিজ। এবং বুঝছে, বেশ ভালই করছে। 'আমরা জানি রেসপন্সিভিস্টদের একটা দল এসব করতে শুরু করেছে। তারা বড় কোনও গণহত্যার জন্য তৈরি হচ্ছে।

'আমাদের চেনাজানা কিছু লোক আছে যারা সবসময় নিজ বিশ্বাসকে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। এরা জঘন্য লোক। আমরা এখানে এক্সট্রিমিস্টদের নিয়ে কথা বলছি। তোমাদের সংগঠনের ভিতর আছে তারা। তুমি যদি সত্যিই তোমার বন্ধুদের

সাহায্য করতে চাও, আমাকে সব খুলে বলতে হবে।'

'ঠিক আছে,' মিইয়ে যাওয়া স্বরে বলল নায়িকা।

পরবর্তী প্রায় এক ঘণ্টা আলাপ করল ওরা। তারপর ফিরল কাইলি। সঙ্গে কয়েকজন এক্সট্রা। আগামী সিনের জন্য এদের মেকআপ দিতে হবে। ততক্ষণে বুঝে গেছে মোফিজ বিল্লাহ, ওরা যা নিয়ে কাজ করছে তার কিছুই জানে না পার্লা মোনা। আরও বুঝতে পেরেছে, পার্লা মোনা দুঃখী ও একাকী এক মেয়ে, নিজের তৈরি সাফল্যের ভিতর আটকা পড়েছে। ওকে ব্যবহার করছে রেসপন্সিভিস্ট মুভমেন্টের নেতারা। ওর কারণে ভিড়ছে বহু লোক। মনে মনে বলল মোফিজ: *প্রার্থনা করি একদিন যেন তুমি শক্তি পাও নিজ বুকের ভিতর। সেদিন যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারো।* তবে জানে, এমন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, তবুও...

'আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ তোমাকে,' ল্যাপটপ ব্যাগে ভরে রাখল মোফিজ।

'আমার মনে হয় না তেমন কোনও সাহায্য করতে পেরেছি।'

'তা নয়। অনেক কিছু জানতে পারলাম। ধন্যবাদ।'

আয়নার দিকে চেয়ে নিজেকে দেখছে পার্লা মোনা। নতুন করে আবার হয়ে উঠেছে আভিজাত্য ও সৌন্দর্যের প্রতিমা। এ রূপ দেখে মুগ্ধ হয় কোটি কোটি দর্শক। হারিয়ে গেছে গতরাতের অত্যাচারের ছাপ। ফুটফুটে সুন্দর রমণীয় লাগছে ওকে। এসব সম্ভব শুধু মেকআপ আর্টিস্টের কারণে। তবে পার্লা মোনার দুই চোখে যে একাকীত্বের হাহাকার, তা দূর করবে কোন্ মেকআপ?

তিন

ফিলিপিন্সে পৌঁছতে চোদ্দ ঘণ্টার কিছু বেশি সময় লাগল রানা ও সোহেলের। এই দ্বীপ-রাজ্যে রয়েছে ছোটবড় সাত হাজারেরও বেশি দ্বীপ। ম্যানিলা থেকে পৌঁছতে হবে বোহোল দ্বীপের টুবিগোন-এ। সেটা রাজধানী থেকে পাখির হিসাবে তিন শ' মাইলেরও বেশি দূর। বোহোলে গাড়ি পাওয়া যাবে কি না তার ঠিক নেই। কাজেই প্রথমে বিমান ধরে কাছের দ্বীপ কেবুতে নামল রানা ও সোহেল। ওখান থেকে ভাড়া নিল শক্তপোক্ত কিন্তু পুরনো এক জিপগাড়ি। এরপর বোহোল স্ট্রেইটের ফেরি আসতেই ধরল। ফেরিটা এতই প্রাচীন ও মরচে ধরা, পাশ থেকে যে টায়ারগুলো ঝুলছে, সব ফেটে ঝুরঝুর করে পড়ছে। স্টারবোর্ডের দিকে কাত হয়ে পড়েছে ফেরি, কাজেই ইচ্ছে করে মালামাল বেশি তোলা হয়েছে পোর্টসাইডে। ওরা ভেবেছিল মাঝখানের এ সময়টা কাটিয়ে দেবে ঘুমিয়ে। তা হলো না। ওদের জিপের পাশে রাখা হয়েছে একটা ট্রাক্টর ট্রেইলার। তার উপর বাঁধা একপাল শুয়োর। ওগুলোর গা থেকে এমন উৎকট মলের গন্ধ আসছে যে মরা লাশও চমকে জেগে উঠবে। সেইসঙ্গে সবকটা মিলে সারাক্ষণ এমনই ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ করছে যে দুই চোখের পাতা এক করার উপায় নেই।

সাগর-প্রণালী পেরুনোর সময় দু'বার বন্ধ হয়ে গেল ফেরির

ইঞ্জিনগুলো। প্রথমবার কয়েক মিনিট পর চালু হলো। তবে দ্বিতীয়বার প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষার পর রওনা দিল ফেরি। নাক-ডাকা এক ইঞ্জিনিয়ার ছিল, কিন্তু সে ঘুম থেকে কিছুতেই উঠল না। ক্রুরা ঘটাং-ঘট আওয়াজ তুলে অনেক কষ্টে চালু করল ফেরি।

উত্তাল সাগরে ফেরি শেষ পর্যন্ত পৌঁছবে, নাকি তলিয়ে যাবে, বুঝে উঠতে পারল না রানা। ফলে অন্য দিকে তেমন মনোযোগ দেয়া হলো না। ভাববার সময় মিলল না এ মুহূর্তে কোথায় উর্বশী। কিন্তু অনেকক্ষণ পর যখন চালু হলো ইঞ্জিনগুলো, ভাবতে শুরু করল রানা বান্ধবীর কথা। ওর মনে পড়ল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে করেগিডোর দ্বীপে মারা পড়েন উর্বশীর দাদা।

রানা জানে, যে ভাবে হোক ছোট ভাইকে রক্ষা করতে চাইবে উর্বশী। বংশের বাতি। নিজে শেষ হয়ে যাবে উর্বশী, কিন্তু কর্তব্য থেকে হটবে না এক কদমও। এখন ওদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে উর্বশীকে উদ্ধার করা। সেজন্য যা করবার করতে হবে। ওর মনে কোনও সন্দেহ নেই, তথ্য পাওয়ার জন্য উর্বশীকে যে-কোনও ধরনের অত্যাচার করবে জ্যারোন ব্রাঙ্কো। এবং যদি বেচারি কথা বলতে বাধ্য হয়, তাতেও ছাড়া পাবে না, চিরতরের জন্য ওর মুখ বন্ধ করে দেবে সে।

একই চিন্তা ঘুরে ফিরে আসছে রানার মনে।

অনেকক্ষণ পর দূরে চোখে পড়ল টুবিগোনের আলো। তার একটু পর বেজে উঠল স্যাটালাইট ফোন।

'হ্যালো, স্বর্ণা বলছি। মাসুদ ভাই?'

'নতুন কিছু জানলে?'

'কেসলারের বিষয়ে? না।'

রেসপন্সিভিস্টদের ডিরেক্টর বরাবর দশটি কল পাঠিয়েছে রানা, জানিয়েছে ও সিকিউরিটি কোম্পানির এমডি। তারাই উদ্ধার করে অমল দাশাকে। রিসেপশনিস্টের সঙ্গে আলাপ থেকে জানা গেছে সে লাঞ্চের সময় রোমান্টিক বই পড়তে ভালবাসে। মেয়েটি প্রতিবার ওকে বলেছে মিস্টার কেসলারকে এখন পাওয়া যাবে না। চাইলে ভয়েস মেইল করতে পারে। তাই করেছে রানা। তারপরও যখন জবাব এল না, শেষ বার স্পষ্ট করে বলেছে, উর্বশীকে ছেড়ে দেয়া হোক, নইলে কেসলার এবং তার স্ত্রীকে তাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে।

এই হুমকিও বোধহয় পাত্তা দিতে চাইছে না কেসলার।

'তা হলে ফোন কেন, স্বর্ণা?'

'পার্লা মোনার সঙ্গে কথা বলেছেন মোফিজ বিল্লাহ। সে কিছুই জানে না।'

'তোমরা শিওর?'

'একঘণ্টা কথা বলেন,' আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল স্বর্ণা। 'এই অভিনেত্রী ফালতু এক কাল্টের সঙ্গে মিশছে, তবে সরাসরি জড়িত নয়। কেসলার নিজেদের ঝামেলার ভিতর হাই-প্রোফাইল কাউকে জড়াতে চাইবে না। তার চেয়ে বড় কথা, পার্লা মোনা এখন যে সিনেমার শিডিউল দিয়েছে, তাতে আগামী চারমাস দম ফেলার ফুরসত পাবে না। তার বর্তমান প্রেমিক এক অস্ট্রেলিয়ান ব্যাণ্ড লিডার—তাকেও সময় দিতে পারছে না।'

'ক্রিংগল যদি কেসলারকে পার্লা মোনার কথা না বলে থাকে, তা হলে অন্য কী বলল? সেটা হয়তো জরুরি কিছু। আতাসি টেপ চালু করে আবার শুনে দেখুক।'

'বলব। আমাকে বলেছেন ওই টেপ শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছেন।'

'আর কিছু?'

'রোম থেকে ফিরেছেন মিস্টার ফু-চুং। আমরা আর্মস ডিলারের ইয়ট থেকে ভাল অডিও ফিড পাচ্ছি। তবে লোকটা আপাতত কিছু করছে না।'

ওই মিশনের কথা চট্ করে মনে পড়ে গেল রানার। 'ঠিক আছে। তোমরা শুনতে থাকো। সোহেল আর আমি পৌঁছে গেছি ফিলিপিন্সে। রেসপন্সিভিস্টদের রিট্রিট থেকে তিন ঘণ্টা দূরে। কিছু পেলে তোমাদের জানাব।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই। মার্ভেল আউট।'

রানা পকেটে রেখে দিল ফোন।

'পার্লা মোনার ব্যাপারে এগুনো গেল না?' জিপের অন্ধকার থেকে বলল সোহেল। পরনে কালো শার্ট-প্যান্ট, বসেছে রানার পাশে।

'কিছুই জানে না।'

'হতে পারে। এসব মেয়ে মর্নিংওয়াকে কুকুর সঙ্গে নেবে না, যদি না পাপারাৎসিরা আশপাশে থাকে।'

'আগেই বোঝা উচিত ছিল ওখানে গিয়ে লাভ হবে না,' নিম পাতার মত তেতো রানার কণ্ঠ।

'শুরু থেকেই আমাদের হাতে সলিড কোনও তথ্য-প্রমাণ নেই, সামান্য সূত্র পেলেই হন্যে হয়ে এদিক ওদিক ছুটছি তার পিছনে। তবে আমার যদি কোনও ভুল না হয়ে থাকে, নতুন তথ্য মিলবে। ফিলিপিন্সে কী ঘটছে বা ঘটেছে, সবই বেরিয়ে আসবে।'

'হয়তো।'

'এখন পর্যন্ত পাওয়া সেরা সূত্র ধরে এখানে এসেছি। চার শ' রেসপন্সিভিস্ট এখানে কেন জড়ো হয়েছিল, আমরা জানি না।

সবাই এখন লাশ। মরা মানুষ কথা বলে না। তবে তাদের কীর্তি রয়েই যায়। সেই সূত্র ধরে চললে বেরিয়ে আসবে অনেক কিছু। ফেরত পাব উর্বশী আর ওর ভাইকে।'

দরকার পড়লে নিজের হাতে ডিয়েটস কেসলার ও জ্যারোন ব্রাঙ্কোকে নির্মম শাস্তি দেবে, ভাবছে রানা। লোকগুলো পালাবে কোথায়? দুনিয়ার শেষ মাথা পর্যন্ত ধাওয়া করবে ও।

ধুঁকতে ধুঁকতে জেটিতে এসে ভিড়ল ফেরি। মড়মড় করে উঠল কাঠের পাইলিং। এত অদক্ষ পাইলটিং আগে চোখে পড়েনি রানার। দশ মিনিট পেরিয়ে গেল ঠিক ভাবে ফেরি বাঁধতে। এরপর নামানো হলো র‍্যাম্প। জিপ চালু করল রানা, কয়েকটা ট্রাকের পিছন পিছন নেমে এল মাটিতে। এতক্ষণ জানালা বন্ধ করে বসে ছিল সোহেল, এবার শুয়োরের গায়ের গন্ধ দূর হতেই খুলে দিল কাঁচ।

'এবার জিনিসগুলো বের কর্,' বলল রানা। পা দিয়ে চেপে ধরেছে অ্যাক্সেলারেটার। ঝিরঝির আওয়াজ তুলল ডিজেলের পুরনো ইঞ্জিন।

কাঁধ থেকে বাম হাতটা খুলতে শুরু করল সোহেল। দেখতে জিনিসটা বিশ্রী, শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে রঙ করা প্লাস্টিকের হাত। বাহুর একটু উপরে ছোট্ট একটা ক্যাচ। ওটা টিপতেই একটু আলগা হয়ে এল নকল হাত। প্যাণ্টের পকেট থেকে বের করল এলেন রেঞ্চ, ওটা বসাল একটা ফুটোর ভিতর। ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে ঘোরাতে শুরু করল। কয়েক প্যাঁচ দেয়ার পর বাহুর দু'পাশে সরে গেল পাত। ভিতর থেকে দুটো কেল-টেক পিস্তল বের করে নিল সোহেল।

অস্ত্রদুটো দেখতে খুদে, তবে কেল-টেক দিয়ে পি-রেটেড .৩৮০ ক্যালিবারের বুলেট বেরোয়। এই মিশনের জন্য এটা

বাছাই করেছে স্বয়ং রানা। পিস্তলের ভিতর রয়েছে সাতটা করে বুলেট। এ ছাড়া রয়েছে বাড়তি তিনটে করে লোডেড ম্যাগাজিন। প্রতিটা বুলেটের ভিতর রয়েছে পারদ। কোথাও আঘাত হানলে গতির কারণে বিস্ফোরিত হয় বুলেট। ফলাফল ভয়াবহ। বিশ্রী ক্ষত তৈরি করে। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কাঁধ বা উরু। একটা কোমরে গুঁজল সোহেল, অন্যটা দিল রানাকে।

বাহুর ভিতর থেকে আরও বেরুল প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ও দুটো ডেটোনেটর পেন্সিল। পাঁচ মিনিটে সেট করা। সোহেলের নকল হাতের কারণে বাড়তি সুবিধা মেলে ওদের। এয়ারপোর্টের মেটাল ডিটেক্টর থামিয়ে দেয় ওকে, তবে যখন কাস্টমসকে শার্ট তুলে হাতটা দেখায় সোহেল, প্রতিবার তারা আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ করে হাতের ইশারায় এগিয়ে যেতে বলে। এখন পর্যন্ত কোনও বোমা শুঁকতে অভ্যস্ত কুকুরের খপ্পরে পড়েনি, তবে ওগুলোর জন্যও তৈরি আছে ও। ছোট একটা বোতলে রেখেছে নাইট্রোগ্লিসারিন পিল। কর্তৃপক্ষ জানতে চাইলে বলবে, ওর হার্টের সমস্যা।

কিছুক্ষণ হলো শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে জিপ। সামনে পাহাড়ি এলাকা। আধপাকা রাস্তার উপর পিচের আস্তরণ পড়েনি গত বিশ বছর। রেসপন্সিভিস্টদের রিট্রিট দ্বীপের আরেক প্রান্তে। কাছাকাছি পৌঁছতে লাগল প্রায় এক ঘণ্টা। তার আগেই পুবে মুখ তুলেছে সূর্য। রাস্তার দুইপাশে প্রাচীন রেইন ফরেস্ট, মাথার উপর ছুঁয়েছে পরস্পরকে। ফলে আধপাকা সড়কটা বেশিরভাগ জায়গায় দেখায় সুড়ঙ্গের মত। মাথার উপর সবুজের আচ্ছাদন। ডাইনে-বামে চোখে পড়ল এক আধটা কুঁড়ে ঘর। ছাত হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে নিম্নমানের ঢেউটিন। বিশ্বযুদ্ধের সময় এসব এলাকা দখল করে নেয় জাপানিজ আর্মি, এখানে সেখানে রয়েছে

বিধ্বস্ত ফ্যাসিলিটি। চারদিকের জঙ্গল দেখে মনে হয় চিরকাল এমনই ছিল এ দ্বীপ।

গন্তব্যের পাঁচ মাইল দূরে পৌঁছে গতি কমাল রানা, রাস্তা থেকে সরে ঢুকে পড়ল ঝোপঝাড় ও গাছপালার ভিতর। সড়ক থেকে পঞ্চাশ গজ ভিতরে ঝোপের আড়ালে রাখল গাড়ি। চট্ করে কেউ বুঝবে না, এখানে কেউ জিপ রেখেছে। রানা ও সোহেল জানে না রেসপন্সিভিস্টরা নিজ আখড়ায় গার্ড রেখেছে কি না। কোনও ঝুঁকি নিতে চাইল না তাই। দশ মিনিট ব্যয় করল ওরা গাড়িটা ক্যামোফ্লেজ করতে। আরও দশ মিনিট গেল ওদের ভেজা, নরম মাটি থেকে চাকার দাগ মুছে ফেলতে। জিপগাড়ি যেখানে রাখা হয়েছে, তাতে রাস্তা থেকে কেউ ওটাকে খুঁজে পাবে না। ওটার সামনে নুড়িপাথর যোগাড় করে ছোট একটা স্তূপ তৈরি করল রানা। পরে ওটা দেখে খুঁজে বের করবে গাড়ি।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ভরা দুটো ব্যাগ কাঁধে তুলে নিল ওরা, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগুতে শুরু করল। বহুদূর হাঁটতে হবে। মনে হলো হারিয়ে গেছে সূর্য, বদলে মাথার উপর থেকে আসছে সবুজ আভা। অনেক উপরে গাছের চাঁদোয়া। রানার মনে পড়ল রাতে মার্ভেলের মুন পুলে আলো জ্বাললে এমন আলো দেখা যায়।

দুই বন্ধু জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে শিকারি চিতাবাঘের মত। কোনও শব্দ করছে না বললেই চলে। ঘন হয়ে জন্মেছে গাছপালা। তার ভিতর দিয়ে পথ খুঁজে এগোতে হচ্ছে। আওয়াজ বলতে পোকার গুঞ্জন ও পাখির ডাক। আওয়াজ বাড়ছে না বা কমছে না, এটা ভাল লক্ষণ। আশপাশে কেউ নেই।

রানার পিছু নিয়ে চলেছে সোহেল। চারপাশ দেখছে, যদি কোনও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে। বাতাস আর্দ্র, হাঁটতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে ওরা। দরদর করে ঘামছে। দুই ঘণ্টা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগুলো ওরা, তারপর হাতের ইশারা করল রানা। শুয়ে পড়ল আস্তে করে। ওর পাশে শুলো সোহেল। একটু সামনে শেষ হয়ে গেছে জঙ্গল। তারপর সিকি মাইল ঘাসজমি। তারপর হঠাৎ জমি শেষ হয়ে শুরু হয়েছে একের পর এক টিলা।

সূর্য ওদের পিছনে, কাজেই বিনকিউলার বের করল রানা, চারপাশ দেখে নিল। টিলা থেকে খানিক দূরে রেসপন্সিভিস্টদের টিনের ঘর। একটাই। তবে প্রকাণ্ড। মনে হলো যেন বিশাল এক গুদামঘর। ঢালু ছাত। হওয়ারই কথা: এ অঞ্চলে প্রতি বছর গড়ে সাড়ে তেরো ফুট বৃষ্টি পড়ে। ঘরে আলো আসার জন্য ঢালু ছাতে বেশ কিছু স্বচ্ছ প্লাস্টিকের প্যানেল আছে। জানালা একটাও নেই। তিন পাশ দেখে মনে হলো টিনের দেয়ালে লাল অক্সাইড অ্যান্টিকরোশন পেইন্ট দেয়া হয়েছে। একটা মাত্র দরজা। সেটার সামনে বিশাল এক পার্কিং লট। ওখানে অন্তত পঞ্চাশটা গাড়ি রাখা সম্ভব। ওয়্যারহাউস থেকে তিরিশ গজ দূরে গোটা সীমানা ঘিরে ছোট ছোট অসংখ্য চৌকো কংক্রিট প্যাড। এলাকাটা বেড়া দেবার জন্য লোহার খুঁটি বসানো ছিল সেগুলোয়। এখন খুঁটি বা কাঁটাতার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। গুনতে শুরু করল রানা। সামনের দিকটায় চল্লিশটা খুঁটি ছিল।

রানার কাঁধে টোকা দিল সোহেল, ওয়্যারহাউসের দিকে চাইতে বলছে। তারপর আঙুল তুলল চৌকো প্যাডগুলোর দিকে। বিনকিউলার কাজে লাগাল রানা, ওয়্যারহাউসের চারপাশটা জরিপ করছে। প্যানেলগুলোর দুই পাশে ঘাসের রঙে সামান্য তফাত দেখা গেল।

'একসময় কম্পাউণ্ড ঘিরে ছিল কোনও ধরনের বেড়া,' মনে মনে বলল সোহেল। এবার দুই আঙুল দিয়ে চোখের কোনা ঠেলে উঁচু করল।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

এটা একসময়ে জাপানিদের দখলে ছিল। সম্ভবত যুদ্ধবন্দিদের রাখা হতো এখানে। অনেক আগেই অদৃশ্য হয়েছে তারকাঁটার বেড়া আর খুঁটি। রয়েছে শুধু কংক্রিটের স্ল্যাব। হঠাৎ একটা চিন্তা এল রানার মাথায়—রেসপন্সিভিস্টরা ইচ্ছা করে এ জায়গা বেছে নিয়েছে, না খালি পড়ে ছিল বলে ব্যবহার করেছে?

পরবর্তী আরও দু'ঘণ্টা চারপাশে নজর রাখল ওরা। কিছুক্ষণ পর পর হাত বদল হলো বিনকিউলার। ক্লান্ত হয়ে উঠল চোখ। সামনে কোনও নড়াচড়া নেই। শুধু হাঁটু সমান ঘাসগুলোকে দুলিয়ে দিচ্ছে এলোমেলো হাওয়া।

বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'দুশ্‌শালা, আমরা গাধা,' বলে উঠল। 'কেউ নেই এখানে।' এতক্ষণ নীরবতার পর বিদঘুটে লাগল কথাগুলো ওর নিজের কানেই।

'শিওর হলি কী করে?' নিচু স্বরে বলল সোহেল। 'থাকতেও তো পারে।'

'কান পেতে শুনে দেখ,' নিজের উপর রেগে গেছে রানা।

'প্রায় কোনও আওয়াজ নেই,' কিছুক্ষণ পর বলল সোহেল। 'আছে শুধু টিলার পায়ে আছড়ে পড়া সাগরের ঢেউ।'

'সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিল আমাদের। এখানে তাপমাত্রা কমপক্ষে নব্বুই ডিগ্রি, তার মানে ওই টিনের ওয়্যারহাউসের ভিতর এক শ' পঁচিশ। এক সময়ে প্রকাণ্ড সব এয়ার-কণ্ডিশনার ইউনিট চালু ছিল এখানে। ওরা যখন চলে যায়, তার আগে সেসব খুলে নিয়ে গেছে। পারলে টিনগুলোও সঙ্গে

নিত। এখানে কিছুই নেই।'

হাত ধরে সোহেলকে টেনে তুলল রানা। ভুরু কুঁচকে রেখেছে। মূল্যবান সময় বিফলে পেরিয়ে গেছে, উর্বশীকে উদ্ধারের ব্যাপারে কোনও অগ্রগতিই হয়নি।

দুই বন্ধু হাঁটতে শুরু করল ওয়্যারহাউসের দিকে। তবে সতর্ক। প্রয়োজন পড়লে ছোঁ দিয়ে বের করবে পিস্তল। দরজা এড়িয়ে ধাতব দেয়ালের পাশে পৌঁছে গেল ওরা। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে দেয়াল স্পর্শ করল রানা। আগুনের মত গনগনে। পুড়ে যেতে চাইল ত্বক।

হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। দরজার দিকে চলেছে ওরা। একবার থামল রানা, ব্যাগ নামাল পিঠ থেকে। ওটার ভিতর থেকে বের করল বেশ লম্বা এক রাবারের টিউব। ওটা দিয়ে প্যাঁচ দিল দরজার নবে। একপ্রান্ত দিল সোহেলের হাতে, অন্য প্রান্ত নিজের হাতে। দরজার দু'পাশে সরে দাঁড়িয়েছে ওরা। টিউব টানতে শুরু করল রানা। নবে ঘসা খেয়ে সরছে টিউব। ফলে ঘুরতে শুরু করেছে নব। কয়েক সেকেণ্ড পর ক্লিক্ করে খুলে গেল লক। বিস্ফোরক থাকতে পারে, কাজেই দরজার কাছ থেকে দূরে ছিল ওরা।

'তালাটা খোলা দেখছি,' বলল সোহেল।

ভিতরে উঁকি দিল রানা। 'বন্ধ থাকবে কেন, ভিতরে তাকিয়ে দেখ।'

ছাতে বেশ কিছু টিন নেই, সে-পথে ওয়্যারহাউসের ভিতর এসে পড়েছে রোদ। তারপরও বেশিরভাগ জায়গা আঁধার মত। চোখে পড়ল ভিতরে কিছুই নেই। এমন কী ছাত ধরে রাখবার যে সাপোর্ট কলাম থাকবার কথা, তাও নেই। ছাতের আড়াগুলো একটু ঝুলে পড়েছে। দরজা যদি এত ছোট না হতো, রানা

ধারণা করত এটা এয়ারক্রাফট হ্যাঙার। মেঝের উপর ধূসর রং করা, চারপাশ একদম পরিষ্কার। ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা। নাকে কীসের যেন গন্ধ। কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল ব্লিচ দিয়ে ধোয়া হয়েছে চারপাশ। কেন?

'দেরিতে এসেছি,' রানার পাশে চলে এসেছে সোহেল।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। তিক্ত লাগছে মন। কেসলারকে দায়ী করবার মত কিছুই নেই এখানে। উর্বশীকে উদ্ধারের কোনও ক্লু নেই। কিছুই হলো না। এত দৌড়ঝাঁপ সব বিফলে গেছে। রেসপন্সিভিস্টরা এই গুদামঘরের ভিতর যাই করে থাকুক, তার কোনও চিহ্ন বা প্রমাণ নেই। এমন কী খুলে নিয়ে গেছে এয়ার-কণ্ডিশনিং ডাক্টও। ওয়ায়্যারিং থেকে শুরু করে প্লাম্বিং—সব।

'অনেক সময় নষ্ট করলাম,' কিছুক্ষণ পর বলল রানা।

উবু হয়ে মেঝের দিকে কী যেন দেখছে সোহেল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'বহুদিনের কংক্রিট। কারাগার যখন তৈরি করে জাপানিজ আর্মি, তখনকার।'

'কিন্তু কেন এত প্রকাণ্ড ঘর লাগল তাদের?' আনমনে বলল রানা। 'চারপাশে পাহাড়ি এলাকা, এয়ারস্ট্রিপ নেই যে এটাকে হ্যাঙার মনে করা যাবে।'

'জানি না। কোনও ধরনের স্টোর হতে পারে।'

'ফ্যাক্টরি,' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা। 'যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাসের মত খাটাত জাপানিরা। যে দেশ জয় করত, সেখানে ওদের মজুর হিসাবে ব্যবহার করা হত।'

'তাই পড়েছি যুদ্ধের ইতিহাসে।'

স্যাটালাইট ফোন বের করল রানা, যোগাযোগ করতে চাইল মার্ভেলের সঙ্গে। নিশ্চয়ই রেসপন্সিভিস্টদের রিট্রিট থেকে পাওয়া

টেপ নিয়ে কাজ করছে আতাসি ও অনিল। ডিউটিতে থাকা কমিউনিকেশন অফিসারকে রানা বলল অনিলের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে।

'হ্যাঁ, বল্।' কয়েক সেকেণ্ড পর ভেসে এল অনিলের কণ্ঠ।

'তোর সাহায্য দরকার। ফিলিপিন্সের বোহোল দ্বীপ যখন দখল করে নিল জাপানিরা, সে সময়ের ইতিহাস ঘাঁটতে হবে। আমার জানা দরকার এখানে কোনও কারাগার বা ফ্যাক্টরি ছিল কি না।'

'এক মিনিট। দাঁড়া।'

রিসেপশন এতই পরিষ্কার যে কি বোর্ডের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। ঝড়ের গতিতে টাইপ করে চলেছে অনিল। 'কম্পিউটার যা বলছে,' কিছুক্ষণ পর বলল, 'একটা জিনিস পেলাম। উনিশ শ' তেতাল্লিশের মার্চে ওখানে সাধারণ অপরাধীদের জন্য একটা কারাগার চালু করা হয়। এরপর যখন চুয়াল্লিশের অক্টোবরে ফেরত এলেন ম্যাকআর্থার, ওটা বন্ধ হয়ে গেল। ওই কারাগারকে বলা হতো ইউনিট সেভেন টোয়েণ্টি টু। তুই বললে ওটার ব্যাপারে সার্চ দিয়ে দেখতে পারি।'

'না, থাক,' বলল রানা। গুদামের ভিতর এক শ' বিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা, তারপরও ওর মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নেমে গেল শীতল এক প্রবাহ। চাপা স্বরে বলল, 'আমি জানি এটা কী।'

কানেকশন কেটে দিল রানা। বন্ধুর দিকে চাইল। 'এটা একটা ডেথ ফ্যাক্টরি। অপারেট করত ইউনিট সেভেন টোয়েণ্টি টু।'

'শুনিনি কখনও।'

'অবাক হওয়ার কিছু নেই। জার্মানি তো যুদ্ধাপরাধ করে

মাফ চেয়েছে, কিন্তু জাপান সরকার কখনও যুদ্ধাপরাধের জন্য ক্ষমা চায়নি। বিশেষ করে ইউনিট সেভেন টোয়েণ্টি টু-র ব্যাপারে একদম চুপ থেকেছে।'

'কী করত তারা?'

'অকুপেশনের সময় পুরো চিন জুড়ে ফ্যাক্টরি আর ল্যাবোরেটরি তৈরি করে জাপানিরা। তাদের ইচ্ছা ছিল বায়োলজিকাল ওঅরফেয়ার পরীক্ষা করা। আন্দাজ হিসাব থেকে জানা যায়, ইউনিট সেভেন টোয়েণ্টি টু এবং ওটার মত ইউনিটগুলো যত লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, তত হত্যা করতে পারেনি জার্মানির হিটলারও। হত্যা ক্যাম্পগুলো ছিল নির্বিকার ভাবে খুন করবার জন্য। বন্দিদের উপর পরীক্ষা-নীরিক্ষা করত তারা। আজ পর্যন্ত যত ভাইরাস পাওয়া গেছে তার বেশির ভাগ ব্যবহার করা হয় মানুষগুলোর উপর। ভাইরাস ইঞ্জিনিয়ারিং করত তারা, মানুষের উপর প্রয়োগ করত বিউবোনিক প্লেগ, টাইফাস বা অ্যানথ্রাক্সের মত ভাইরাস। কয়েকবার ছেড়ে দেয়া হয় চিনের কয়েকটি শহরে। কখনও বিমান ব্যবহার করেছে তারা, আকাশ থেকে ছড়িয়ে দিয়েছে ভাইরাস। এ কাজে ব্যবহার করত রোগাক্রান্ত মাছি, বোমার ভিতরে বিশেষ কম্পার্টমেণ্টে ভরে দিত ওগুলোকে। তাদের আরেকটা প্রিয় কৌশল ছিল স্থানীয় ওভারহেড ট্যাঙ্কিগুলোর পানিতে ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়া। এর ফলে শহরকে শহর খতম হয়ে গেছে।'

'এবং এসব করে পারও পেয়ে গেছে?'

'মোটামুটি তাই বলা যায়। তাদের আরেকটা গবেষণা ছিল মানুষের দেহে নানারকম বিস্ফোরকের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা। গুলি করে মানুষ মারত তারা, উড়িয়ে দিত বোমা দিয়ে, কখনও একইসঙ্গে শতখানেক মানুষকে পুড়িয়ে মারত। যত রকমের

অত্যাচার ভেবে বের করা যায়, সব করেছে ওই ইউনিট। একটা এক্সপেরিমেন্টের কথা শুনেছি বসের কাছে। ওরা বন্দিদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দেখত কতক্ষণ পর মরে লোকটা।'

'বুড়ো কখনও আমাকে এসব বলেনি,' বলল সোহেল।

'বুড়ো ডিনারের দাওয়াত দিলে একটু একটু ছাড়ে। যা বলে অল্প কথায়।'

'তা হলে তোর ধারণা এটা ছিল ওই ধরনের কোনও ল্যাবোরেটরি?' চারপাশে একবার চাইল সোহেল।

'আর স্থানীয় ফিলিপিনোরা ছিল ল্যাবোরেটরির ইঁদুর।'

'একটা কথা ভাবছি।'

'ভাবছিস এই জায়গা কেন বেছে নিয়েছে কেসলার?'

'বিশেষ কারণ, যারা গবেষণা করল, গোল্ড অভ মার্সে তাদেরকে তুলে তাদেরই উপর ব্যবহার করেছে সেই টক্সিন। পুরনো এই জার্ম-ওয়ারফেয়ার ফ্যাক্টরি বেছে নিয়েছে ভাইরাস তৈরি করতে। এসব কাকতালীয় হতে পারে না। এমনও হতে পারে, জাপানী আর্মি কিছু ভাইরাস ফেলে গেছিল, সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং করে তৈরি হয়েছে ওই টক্সিন। হতে পারে না?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'পারে। ইউনিট সেভেন টোয়েন্টি টু-র কথা অনিল বলতেই মনে হয়েছে এমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এখানে বসে তৈরি করেছে ভাইরাস।'

'তোর কি মনে হয়, বায়োহ্যাজার্ড সুট ছাড়া ঘোরা ঠিক হচ্ছে?'

'অসুবিধে নেই। গন্ধেই তো টের পাচ্ছিস, এই ঘর ওরা ডিজইনফেক্ট করেছে, আক্রান্ত হব না।'

'তারপরও কেমন যেন লেগে উঠছে।'

'ফারার ইয়োগা টেকনিক কাজে লাগা,' হাসল রানা। 'চোখ

দিয়ে বাতাস নেয়ার চেষ্টা কর্।'

টিটকারি গায়ে মাখল না সোহেল।

ফ্ল্যাশলাইট বের করেছে ওরা, দু'জন বিপরীত দিকে রওনা হয়ে গেল। ওয়্যারহাউসের প্রতি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখল। মেঝের উপর কিচ্ছু নেই। একটা ম্যাচের কাঠিও না। সব পরিষ্কার।

'কিছুই নেই,' বলল রানা।

'অত তাড়াতাড়ি করলে ভুল হবে, বৎস,' প্রশান্ত একটা ভঙ্গি নিল সোহেল। চেয়ে রয়েছে ওয়্যারহাউসের পিছন দেয়ালের দিকে। চলে গেল ওখানে, ন্যাংটো স্টিলের সাপোর্ট কলামগুলোর একটার উপর টোকা দিল। ফাঁপা নয়। এবার হাত রাখল কলামের পাশের দেয়ালে। উষ্ণ, তবে উত্তপ্ত নয়। এটা তেমন কোনও ব্যাপার নয় যে উৎসাহী হওয়া যায়। মাথার উপর সূর্য নেই এখন।

'দেয়াল ধরে কী ভাবছিস?' জানতে চাইল রানা। 'নীলার কথা?'

'ভাবছি রে, ভাবছি।' দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল সোহেল। পা মেপে চলেছে। 'চুরানব্বুই... আটানব্বুই... এক শ', উল্টো দিকের দেয়ালের সামনে পৌঁছে গেছে। 'প্রতি পদক্ষেপে তিন ফুট, তা হলে আমরা পেলাম তিন শ' ফুট লম্বা একটা গুদাম।'

'বাহ্, তুই তো গুনতে পারিস!'

'তার চেয়ে বেশি পারি,' চোখ পাকালো সোহেল। 'বিশ্বাস হয় না তোর?'

রানার কনুই ধরে ওকে নিয়ে ওয়্যারহাউস থেকে বেরিয়ে এল সোহেল। দেয়ালের পাশ দিয়ে চলেছে। প্রতি পা আবার

গুনতে শুরু করেছে। 'আটানব্বুই, নিরানব্বুই, এক শ', এক শ' এক...'

'তুই গুনতে ভুল করেছিস,' সোজা কথা জানিয়ে দিল রানা।

'দেয়ালের উপর হাত রেখে দেখ,' সোহেল জানে এবার টের পাবে বৎস।

টের পেল বটে, চমকে গিয়ে হাত সরিয়ে নিল রানা। আগুনের মত গরম দেয়াল। রাহাত খানের ভঙ্গিতে কড়া চোখে চাইল বন্ধুর দিকে। 'আমার হাতে ফোস্কা ফেলার কারণ কী, প্রভু?'

'ভিতরের কলাম কিন্তু লোড বিয়ারিং না। ওপাশের ধাতু অনেক পাতলা।'

'তা-ই?' মগজ নড়াতে শুরু করেছে রানা।

'তুইও বুঝতি। আর্মি ট্রেইনিঙের কথা ভাবিসনি। মনে নেই, আমাদের শিখিয়েছে এসব কীভাবে গড়তে বা ভাঙতে হয়। ঠিক এই জায়গায় একটা ফলস দেয়াল আছে। ছয় ফুট চওড়া ফাঁকা জায়গা।'

'চল্ দেখি সত্যিই আছে কি না।'

আবার ওয়্যারহাউসের ভিতর ঢুকে পড়ল ওরা। দম বন্ধ করা গরম। পকেট থেকে ফোল্ডিং নাইফ বের করল রানা, খোঁচা দিল দেয়ালের উপর। ফুটো হয়ে গেল কাগজের মত পাতলা ধাতু। এবার ছুরি দিয়ে কাটতে শুরু করল পাতটা। কেটে চলেছে, নামিয়ে দিল মেঝে পর্যন্ত। যে ফুটো তৈরি হয়েছে সেখানে ছুরি ভরে এবার বাম দিকে চিরে দিল মেঝের সমান্তরালে তিন ফুটের মত টিন, তারপর আবার টিন কেটে নামিয়ে আনল নীচে। দাঁত কিড়মিড় করবার মত আওয়াজ হলো।

'এই ছুরি এমার্সন সিকিউসি-৭এ,' দু' আঙুলে নিজের কলার

ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'প্রমাণ পেলি, এ দিয়ে লোহা কাটা যায়।'

দেয়ালের গর্ত দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল সোহেল। দুপাশে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল, তারপর দেখল...

'কিছুই তো নেই, রে! একদম ফাঁকা। পুরো ওয়্যারহাউসের মতই খালি।' মুখটা জিলাপির মত পেঁচিয়ে ফেলল সোহেল।

'তবু চল্, ঘুরে দেখি,' ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা।

ওয়্যারহাউসের ফলস দেয়ালের ভিতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল দুই বন্ধু। অপ্রশস্ত জায়গা। সামনের দিকে, উপরে, নীচে আলো ফেলছে। টিনের দেয়ালের কারণে প্রচণ্ড গরম, যেন স্টিল মিলের ভিতর ঢুকেছে।

ছাতের দিকে টর্চ তাক করেছে সোহেল, এমন সময়ে মেঝের উপর আলো ফেলল রানা। কী যেন চোখে পড়েছে ওর। ওখানেই থমকে গেল, উবু হয়ে আরও ভালভাবে দেখতে চাইল। জায়গাটায় হাত বুলিয়ে দেখল মেঝের কংক্রিট মসৃণ। বন্ধুর দিকে চাইল রানা।

'কী পেলি?' রানার দিকে ফিরল সোহেল।

'এই কংক্রিট নতুন। পুরো মেঝে না, কেবল এই জায়গা।'

টর্চ ফেলে দেখল সোহেল। ঠিকই বলেছে রানা। দৈর্ঘ্যে জায়গাটা দশ ফুট মত। চওড়ায় ছয় ফুট। এ অংশের কংক্রিট অন্য অংশের তুলনায় অনেক মসৃণ। মনেই হয় না পুরনো।

'তোর কী মনে হয়?' জানতে চাইল রানা।

'নীচ তলায় যাবার সিঁড়ি ছিল। আকৃতিও মেলে।'

'আয় দেখি কী পাই।' ব্যাগ হাতড়ে সি-ফোর প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বের করল রানা। দু'হাতে বোমা বানাতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পর সন্তুষ্ট হলো। এটা ফাটালে নীচের দিকে ছুটবে বিস্ফোরকের প্রচণ্ড শক্তি। ওটার ভিতর গেঁথে দিল টাইমার

পেন্সিল। একবার প্রিয় বন্ধুর দিকে চাইল। তৈরি সোহেল। এবার ডেটোনেটর অ্যাকটিভেট করল রানা।

গোপন কক্ষ থেকে বেরোবার জন্য ছুট লাগাল ওরা। যেন উড়ে চলেছে, কেউ কাউকে হারাতে পারছে না দৌড়ে। ফোকর গলে বেরিয়ে ধুপধাপ পা ফেলে দরজার দিকে ছুটল। গরমের ভিতর ঘেমে গোসল হয়ে গেছে। দরজা দিয়ে পাশাপাশি বেরিয়ে এল ওরা বাইরে। দু'সেকেণ্ড পর চাপা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেল। ছাত থেকে উড়ে গেল একটা স্কাইলাইট প্যানেল, বেশ দূরে গিয়ে পড়ল। ওয়্যারহাউসের ভিতর থেকে ঘন ধোঁয়ার মত বেরুতে লাগল কংক্রিটের ধুলো। ছাতের ফোকর দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল ধুলো। দেখে মনে হলো আগুন ধরে গেছে ওয়্যারহাউসে।

কংক্রিটের কণার মেঘ ধীরে ধীরে নামছে। পরস্পরের দিকে চাইল দুই বন্ধু। দু'জনই টের পেল, কেমন যেন অস্বস্তি চেপে ধরেছে ওদের। বার কয়েক জঙ্গলের দিকে চাইল। এবং একই সঙ্গে চোখে পড়ল সূর্যের আলোর প্রতিফলন। পার্কিং লটের মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা ও সোহেল। তার ঠিক দু' সেকেণ্ড পর শোনা গেল দুটো রাইফেলের গর্জন। আধ সেকেণ্ড আগে মেঝেতে শুয়ে পড়েছে, তাই বেঁচে গেল ওরা। মাথার উপর দিয়ে গেল বুলেট। গাছের আড়াল থেকে গুলি শুরু করেছে দুই আততায়ী। সুইচ অটোমেটিকে সরিয়ে নিয়েছে। পার্কিং লটের যেখানে রানা ও সোহেল, সে জায়গা লক্ষ্য করে এল অন্তত তিরিশটি বুলেট।

মাত্র দুটো পিস্তল দিয়ে কিছুই করতে পারবে না রানা বা সোহেল। কোনও কাভারও খুঁজে নিতে পারেনি। আগামী কয়েক সেকেণ্ড পর লাশ হতে হবে। কোনও কথা হলো না দু'জনের

ভিতর, ছিটকে উঠে দাঁড়াল ওরা, তারপর ধনুকের ছিলা থেকে বেরিয়ে যাওয়া তীরের মত ছুটল ওয়্যারহাউস লক্ষ্য করে। নুড়ি পাথর ছিটকে উঠল ওদের পায়ের কাছে। বুলেট এসে মাথা খুঁড়ছে পার্কিং লটের মেঝেতে।

ওয়্যারহাউসে আগে ঢুকতে পারল সোহেল। পরক্ষণে রানা। ছুটল ওরা বিস্ফোরণের জায়গা লক্ষ করে। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ওখানে ফাটিয়ে দিয়েছে মেঝে, কিন্তু নীচে নামার মত গর্ত তৈরি হয়নি। অত কম বিস্ফোরক কংক্রিটে গর্ত তৈরি করতে পারেনি। শুধু প্রচণ্ড খরায় ফেটে যাওয়া জমির মত অবস্থা হয়েছে। মেঝের উপর আলো ফেলে আঁকাবাঁকা ফাটলগুলো দেখল রানা। ওখানে এমন কোনও ফুটো নেই যেখান দিয়ে ভিতরে নামা যেতে পারে।

চট্ করে একবার সোহেলের দিকে চাইল রানা। ওরা জানে, আটকা পড়েছে ফাঁদে। ওয়্যারহাউসের দেয়াল ফুটো করল বেশ কয়েকটা বুলেট। দু'বন্ধু কখন যেন হাতে তুলে নিয়েছে পিস্তল। ওদের পিছন পিছন তেড়ে এসেছে আততায়ীরা। দরজার দু'পাশে অবস্থান নিয়েছে। তিনবার কাভারিং শট নিল রানা। কেল-টেকের রেঞ্জের বাইরে রয়েছে ওরা, কাউকে গুলি লাগল না। লোকগুলো জানে নিরাপদে রয়েছে।

রানাকে পাশ কাটিয়ে লাফিয়ে শূন্যে উঠল সোহেল। নামার মুহূর্তে জোড়া পায়ে জোর এক লাথি মারল ফাটা মেঝেতে। বিস্ফোরণের ফলে এমনিতেই প্রচণ্ড চাপ পড়েছে কংক্রিটের উপর, এখন উঁচু থেকে লাফিয়ে নামা হয়েছে। আর অত্যাচার সহ্য করতে পারল না মেঝেটা, চার বর্গফুট এলাকার রড-সিমেন্ট ধসে পড়ল নীচে। সবকিছুর সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল সোহেলও।

কংক্রিটের চাপড়া তখনও ফাটছে। সিঁড়ির নীচে গিয়ে পড়ছে

সব। একবার অন্ধকার ফোকরের দিকে চাইল রানা, তারপর অন্ধের মত লাফ দিল। নাকে এসে লাগল শীতল হাওয়া। সেই হাওয়ায় মিশে রয়েছে যেন মৃত্যুর গন্ধ।

চার

'উহ্!' কাতরে উঠল লেফটেন্যাণ্ট কমাণ্ডার উর্বশী।

উর্বশীর ডান স্তন টিপে মুচড়ে ধরেছে ব্রাঙ্কো। পরক্ষণে স্তন ছেড়ে দিল, এক পা পিছিয়ে আরেকটা চড় কশিয়ে দিল গালে। তীব্র জ্বলুনি গালে, তবুও সোজা হয়ে বসতে চাইল উর্বশী। চেয়ারের সঙ্গে পা থেকে বুক পর্যন্ত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে। গায়ের শক্তির সিকি ভাগও খরচ করেনি ব্রাঙ্কো, তার পরেও উর্বশীর মনে হলো ছিঁড়ে গেছে ঘাড় ও চোয়ালের পেশি। গুঙিয়ে চলেছে। ফাটা ঠোঁটের কোণ থেকে গড়িয়ে পড়ছে লালার সঙ্গে রক্ত।

একমিনিট আগেও বামহাতে ওর চুলের ঝুঁটি পেঁচিয়ে নিয়ে ডানহাতি চড় কশিয়েছে গালে।

এ নিয়ে তৃতীয়বার গায়ে হাত তুলল ব্রাঙ্কো। লোকটা এত শীঘ্রি অত্যাচার শুরু করবে, ভাবতে পারেনি উর্বশী। বেঁধে রেখেছে ওর চোখদুটো। বুঝবার উপায় নেই কখন কোনদিক থেকে হামলা আসবে। গরিলার শক্তি লোকটার হাতে। পাঁচ মিনিট আগে ঘরে ঢুকেছে। এখন পর্যন্ত একটা প্রশ্ন করেনি। শুধু

মেরে চলেছে।

চোখের উপর থেকে হ্যাঁচকা টানে তুলে নেয়া হলো ডাক্ট টেপ। সঙ্গে উঠে গেল ভুরুর চার ভাগের এক ভাগ রোম। উর্বশীর মনে হলো চোখের উপর জ্বলে উঠেছে আগুন। চোখে অ্যাসিড ঢেলে দিল? ভীষণ জ্বলছে! মুখ বুজে থাকতে চাইল, কিন্তু পারল না, গুঙিয়ে উঠল আবারও।

চারপাশে চাইল। চোখদুটো ঝাপসা হয়ে গেছে পানিতে। ঘরে প্রায় কিছুই নেই। দেয়ালগুলো কাঠের গুঁড়ির, মেঝে কংক্রিটের। একটা ড্রেন গেছে ওর পায়ের নীচ দিয়ে। পাশে রাখা বদনা। সঙ্গে লাগানো লম্বা হোসপাইপ। ওটা গেছে লোহার দরজার ওপাশে। এখন দরজা খোলা। চোখ পড়ল হলওয়েতে। পুরু কাঠের দেয়ালগুলো সাদা রং করা।

ওর সামনে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রাঙ্কো, পরনে সুট। কোটের নীচে সাদা শার্ট। সর্বক্ষণ ঘেমে চলেছে লোকটা। শার্টে লেগেছে উর্বশীর লালা ও রক্ত। দু'পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই প্রহরী, পরনে জাম্পসুট। লোকগুলোর চেহারা পাথুরে। একজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ব্রাঙ্কো। কয়েক শিট কাগজ ওর হাতে দিল লোকটা। জবানবন্দি লেখা হবে।

'তোমার ভাইয়ের কথা অনুযায়ী,' শুরু করল ব্রাঙ্কো, 'তোমার নাম উর্বশী দাশা। তুমি ইন্দোনেশিয়ান নেভির লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ঠিক?'

'জাহান্নামে যাও,' নিচু স্বরে বলল উর্বশী। ফাটা ঠোঁটের কারণে জড়িয়ে গেল কথা।

ওর ঘাড়ের নার্ভগুলো খামচে ধরল ব্রাঙ্কো। ভয়ঙ্কর ব্যথা পেয়ে ছিটকে সরে যেতে চাইল উর্বশী। কিন্তু নড়তে পারল না

একচুল। নার্ভে প্রেশার দিয়ে চলেছে খুনি, আরও বাড়িয়ে দিল চাপ। দাঁতে দাঁত চেপে ফোঁপানি থামাতে চাইল উর্বশী।

'এসব তথ্য কি সত্য?'

'হ্যাঁ!'

ঘাড় থেকে হাত সরিয়ে নিল ব্রাঙ্কো, এবার বামহাতে চড় লাগাল গালে। কট-কট্ করে ফুটল ঘাড়ের হাড়।

'মিথ্যা বলেছ। তোমার সঙ্গে একটা ট্র্যান্সপণ্ডার ছিল। ঊরুর ভিতর। ...সাধারণ নেভি অফিসারের সঙ্গে এ জিনিস থাকে না।'

'আমার ভাইকে ফিরে পেতে সিকিউরিটি কোম্পানিকে হায়ার করি, তারা দিয়েছে,' বিড়বিড় করে বলল উর্বশী। স্বাভাবিক রাখতে চাইল চেহারা। কুঁচকে গেছে মুখ। 'ওরাই ট্র্যান্সপণ্ডার ইমপ্ল্যান্ট করে।'

চড়াৎ করে আবার জোরালো চড় পড়ল গালে। একটা দাঁত নড়ে গেছে, টের পেল উর্বশী।

'ভালই মিথ্যা বলছ। তবে ওই ক্ষত অন্তত একবছর আগের।'

সঠিক আন্দাজ করেছে ব্রাঙ্কো। দুনিয়া জুড়ে স্বর্ণ-বিপর্যয় হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তার কিছুদিন আগেই ঊরুর ভিতর ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট করা হয় ওই ট্র্যান্সপণ্ডার।

'শপথ করে বলতে পারি...' বলল উর্বশী। 'আমি খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠি।'

উর্বশীর মুখ থেকে এক ইঞ্চি দূরে থামল ব্রাঙ্কোর নাক। 'সারাজীবনে অনেক ক্ষত তৈরি করেছি, যে-কোনও অভিজ্ঞ সার্জনের চেয়ে অনেক... অনেক বেশি। কত দ্রুত সুস্থ হয় দেহ আমার জানা আছে। ওই ইমপ্ল্যান্ট হয় কমপক্ষে ছ'মাস আগে। এবার বলো তুমি কে, এবং কী করো। তোমার কাছে ট্র্যান্সপণ্ডার

কী কারণে?'

মাথা পিছনে নিল উর্বশী, যেন ভয় পেয়েছে। পরক্ষণে জবাব দিল দ্রুত কপাল ঠুকে। ওর কপালের হাড় নেমে এল ব্রাঙ্কোর খাড়া নাকের উপর। ভাঙতে পারত নাকের হাড়, কিন্তু তত জোরে মারতে পারেনি, চেয়ার আটকে রেখেছে উর্বশীকে। আধবোজা চোখে দেখতে পেল লোকটার নাকের দুই ফুটো দিয়ে ঝরঝর করে ঝরছে রক্ত। ডানহাতে রক্ত মুছতে চাইল ব্রাঙ্কো।

জান্তব ক্রোধ নিয়ে মেয়েটির দিকে চাইল দৈত্য। দাঁতে দাঁত পিষতে শুরু করেছে। এবার ওকে প্রচণ্ড মারপিট করবে, বুঝতে পারছে উর্বশী। তবে সেজন্য কোনও পরোয়া নেই। হিম চোখে চাইল ব্রাঙ্কো, রক্তে মাখামাখি নাক-মুখ। এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে, ভাবল উর্বশী।

ঘুসিগুলো এল শিলাবৃষ্টির মত, কোনও নিয়ম ছাড়াই। কোথায় গিয়ে ঘুসি পড়ছে সেদিকে খেয়াল নেই সার্ব খুনির। যেন একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটছে। আদিম মানুষ যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ত হিংস্র জানোয়ার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। ঘুসি নামছে উর্বশীর মুখ-কাঁধ-বুক-পেট-তলপেটে। যেন থামবে না লোকটা। তারই ফাঁকে লাথি পড়ছে ঊরুর উপর। ব্রাঙ্কো এত দ্রুত নড়ছে যে পরিষ্কার দেখতে পেল না ওকে উর্বশী। বারবার মন বলল, একজন লোক মারছে না ওকে, পিটিয়ে চলেছে কয়েকজন মিলে। প্রচণ্ড ব্যথায় উল্টে গেল দুই চোখের মণি। বুঝে ফেলেছে, ওকে খুন করছে ব্রাঙ্কো। বারবার ঝাঁকি লাগছে দেহে, তবে নির্দিষ্ট কোনও ব্যথা নেই।

দেড় মিনিট পর চেয়ারে এলিয়ে পড়ে রইল উর্বশী। ফোলা বেলুনের মত হয়ে উঠেছে চেহারা। দুই গাল, ও ঠোঁট থেকে ঝরছে রক্ত। প্রহরীদের একজন সরিয়ে নিয়েছে কসাই

ব্রাঙ্কোকে। হাতের কাজে বাধা পড়ায় খুনির চোখে লোকটার দিকে চাইল সে।

সার্বের কাছ থেকে কয়েক পা পিছিয়ে গেল প্রহরী। বাধা পড়ায় এরইমধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে ব্রাঙ্কোর মাথা। সামলে নিয়েছে নিজেকে। শীতল চোখে অচেতন মেয়েটির দিকে চাইল। হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছে ব্রাঙ্কো, শিরা হতে বিদায় নিচ্ছে অ্যাড্রেনালিন। দুই কব্জির হাড় মটমট করে ফোটাল, দু'জনের মিশ্রিত রক্ত ঝরছে মেঝের উপর। উর্বশীর ডান চোখের পাতা খুলে পরীক্ষা করল। ওখানে শুধু সাদা অংশ।

পালা করে দুই প্রহরীর দিকে চাইল ব্রাঙ্কো। 'এক ঘণ্টা পর এসে দেখবে জ্ঞান ফিরেছে কি না। এর পরের বার যদি ভাঙতে না পারি, কোরিন্থ থেকে ওর ভাইকে নিয়ে আসব। ভাইকে পেটালে দেখব কী করে। আমাদের জানতেই হবে এরা কতটা কী জানে!'

গট-গট করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ব্রাঙ্কো। কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুই প্রহরী, তারপর পিছু নিল। দরজার কাছে থেমে হোসপাইপ টান দিয়ে খুলে ফেলল। ওটা ঘরের ভিতর ফেলে বন্ধ করে দিল দরজা। মেয়েটির দিকে দ্বিতীয়বার তাকায়নি। তাকালে অন্য কিছু দেখত।

প্রায় বুজে আসা চোখে তাদের চলে যেতে দেখছে উর্বশী। তবে প্রহরীদের পিঠ এদিকে ফিরতেই নড়ে উঠেছে নিজেও। ওই প্রচণ্ড মার খাওয়ার সময় ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে চেয়ারটা সামনে-পিছনে সরিয়েছে ও, নিজেও নড়েছে। এর ফলে বেশ ঢিল হয়েছে বাঁধন। এদিকে খেয়াল ছিল না ক্রোধান্ধ ব্রাঙ্কোর। প্রহরীরা ধারণা করেছিল মেয়েটি ঝাঁকি খেয়েছে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে। তবে প্রতিটা কাজ ঠাণ্ডা মাথায় করেছে উর্বশী।

গার্ডরা বেরিয়ে যাবার আগেই চট্ করে উবু হয়ে তুলে নিয়েছে উর্বশী ব্রাঙ্কোর ফেলে যাওয়া কয়েকটা কাগজ। নাকের উপর কপালের আঘাত লাগতেই ব্রাঙ্কোর হাত থেকে পড়ে গেছিল ওগুলো। কাগজগুলো মুচড়ে একটা বলের মত তৈরি করল সে। এবার ধাতব চেয়ারটা সামান্য উঁচু করে তুলে দরজার দিকে এগোবার চেষ্টা শুরু করল উর্বশী। প্রতি পদক্ষেপে দু'তিন ইঞ্চি এগুতে পারল। একবার মাত্র সুযোগ পাবে। আবার যদি পিটাতে আসে ব্রাঙ্কো, বাঁচবে হয়তো, কিন্তু অমলকে রক্ষা করতে গিয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে বহু কথা। তার ফল ভাল হবে না।

নিখুঁত হলো উর্বশীর লক্ষ্যভেদ। বন্ধ-প্রায় দরজা ও লকের মাঝখানে পড়ল গোল পাকানো কাগজের বল। ঠিক তখনই দরজা বন্ধ করল প্রহরী। কিন্তু চৌকাঠে আটকাল না লক, কাগজের বলের কারণে খুলে রইল বোল্ট। আস্তে করে চেয়ার সহ বসে পড়ল উর্বশী। আগে কখনও এমন হিংস্র মারের মুখে পড়েনি। দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধে আমেরিকানরাও এভাবে অত্যাচার করতে পারেনি। ওরা পেটালে অন্তত একঘণ্টা বিশ্রাম নিত। তারপর আবার ফিরত ইন্টারোগেশন করতে। জিভ দিয়ে মুখের ভিতর অনুভব করতে চাইল উর্বশী। নড়ছে দুটো দাঁত। কপাল ভাল যে ভেঙে যায়নি নাকের হাড়। যে-কোনও তীব্র আঘাতে বিকল হতে পারত হৃৎপিণ্ড, কিডনি বা পাকস্থলী। ওগুলো কাজ করছে ঠিকই।

ঊরুর ভিতর যেখানে বাইয়োইলেকট্রিক ট্র্যান্সপণ্ডার ছিল, সেখানে চাপা ব্যথা। সে-তুলনায় অনেক গুণ বেশি ব্যথা সারা শরীরে। বুকের পেশিগুলো স্তনসহ ছেঁচে গেছে, এখন বেগুনি হয়ে উঠছে চামড়া। মুখের অবস্থা কী হতে পারে, কল্পনা করার সাহস পাচ্ছে না।

কখনও অত সুন্দরী ছিলাম না, নিজেকে সান্ত্বনা দিল উর্বশী। খচ্ করে লাগল হৃদয়ে। রানার চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি দেখেছে ও। আর কখনও ওই মায়াবী চোখদুটো ওর দিকে ওভাবে চাইবে? তিক্ত হাসল উর্বশী। ফাটা ঠোঁটের কারণে বেড়ে গেল ব্যথা। নিজেকে দশ মিনিট সময় দেবে, ঠিক করল। এরই ভিতর সামলে নিতে হবে। আর দেরি করলে আড়ষ্ট হয়ে উঠবে মাংসপেশিগুলো। শেষে নড়তেই পারবে না। সারাশরীরে ঝনঝনে ব্যথা, তবু ভাল—সামনে মুক্তির আলো। ভাল হয়েছে লোকটা এখানে আনেনি অমলকে। ওর ভাই কোথায় আছে কে জানে। আবার সেই গ্রিসে? রেসপন্সিভিস্টদের খপ্পরে, তারপরও বোধহয় খানিক নিরাপদ। মনকে সান্ত্বনা দিল উর্বশী, শেষ হয়নি সব আশা।

ওর হিসাব অনুযায়ী পেরিয়ে গেছে ছয় মিনিট। এবার দড়ির বাঁধন খোলার চেষ্টা শুরু করল উর্বশী। মোচড়ামুচড়ি করে একটু পরেই বাঁধন থেকে বের করে আনতে পারল দু'হাত। এবার খুলছে বুকে বেঁধে রাখা দড়ির গিঁঠ। শেষে বাঁধন খুলল দুই পায়ের। উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ধরে রইল চেয়ার, নইলে পড়ে যাবে হুমড়ি খেয়ে। ধীরে ধীরে বিড়বিড় করে বলল, 'এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।' চেয়ার ছেড়ে নড়ল না। চোখের সামনে সব ঝাপসা লাগছে, ঘুরছে মাথাটা। কিছুক্ষণ পর পরিষ্কার হলো দৃষ্টি।

মন্থর পায়ে দরজার কাছে চলে গেল উর্বশী, নিঃশব্দে খুলল ভারী কবাট। সামনের হলওয়ে ফাঁকা। কেউ নেই। কংক্রিটের ছাতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফ্লুরোসেন্ট ফিক্সচার। দূরে দূরে জ্বলছে নগ্ন আলো। মাঝের অংশে আলো অনেক কম। দু'পাশে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি দেয়াল, কালো ছায়া পড়ছে। নতুন দেয়াল, তবে অযত্নে তৈরি। এবড়োখেবড়ো মনে হলো। দরজার বাইরে পা

রাখল ও।

লকে আবার কাগজের বল গুঁজে দিল উর্বশী। আর বন্ধ হবে না দরজা। একবার চারপাশ দেখে নিল। কুঁজো হয়ে গেছে। বুক-পেটের ব্যথা ওকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। সামনের হলওয়ে ধরে রওনা হয়ে গেল। আগেই দেখে নিয়েছে, রক্তের ফোঁটা রেখে এগুচ্ছে না।

প্রথম ইণ্টারসেকশনে এসে বামে অস্পষ্ট গলার আওয়াজ শুনতে পেল। কাজেই এগুতে শুরু করল ডানদিকে। একটু পর পর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে পিছনে। সামনে একের পর এক দরজা পড়ছে। ঠাণ্ডা ধাতব দরজাগুলোর উপর কান রাখছে, তারপর আবার এগোচ্ছে। এখন পর্যন্ত কারও কণ্ঠ শুনতে পায়নি।

করিডোরে কোনও জানালা নেই। আবহাওয়া ভেজা। এ থেকে মন বলছে, এটা কোনও ভূগর্ভস্থ সেটলমেণ্ট। হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। সব আন্দাজের উপর নির্ভর করে ভাবছে।

আরও দু'বার বাঁক নিল উর্বশী। এই গোলকধাঁধার ভিতর যেন আর কোনও রং নেই, শুধুই ধূসর ও সাদা। সামনে আরেকটা দরজা পড়ল। ওপাশ থেকে আসছে মেশিনারির আওয়াজ। হ্যাণ্ডেল ধরে মোচড় দিতেই খুলে গেল দরজা। সামান্য ফাঁক করে ভিতরে উঁকি দিল উর্বশী। কয়েক গুণ বেড়ে গেল আওয়াজ। ঘরে কোনও আলো নেই। অর্থাৎ, অন্য কেউ নেই। চট্ করে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল উর্বশী, পিছনে বন্ধ করে দিল কবাট। নিকষ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। কেমন যেন লাগছে। দরজার পাশের দেয়াল হাতড়ে সুইচ পেয়ে টিপে দিল।

জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো, ধাঁধিয়ে দিল চোখ। সামনে গুহার মত একটা ঘর। যেখানে দাঁড়িয়েছে, তার খানিক সামনের মেঝে দু'ফুট নীচ থেকে শুরু হয়েছে। এটা ফ্যাসিলিটির পাওয়ারহাউস, কণ্ট্রোল রুম। পুরু কাঁচের ওপাশে মেঝের সঙ্গে বোল্ট দিয়ে আটকানো চারটে জেট ইঞ্জিন। সেগুলোর ভিতর ঢুকেছে এক দঙ্গল ফিউয়েল লাইন আর এক্সযস্ট ডাক্ট। ডাক্টগুলোর সঙ্গে জোড়া রয়েছে একটা করে ইলেকট্রিকাল জেনারেটার। প্রতিটি ইউনিট একেকটা লোকোমোটিভের চেয়েও বড়। আপাতত চলছে মাত্র একটা টারবাইন। এপাশের ঘর থেকেও স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে কী পরিমাণ শক্তি নিয়ে চলছে জেট ইঞ্জিন।

ফ্যাসিলিটির পাওয়ারহাউস সত্যিই প্রকাণ্ড, ভাবল উর্বশী। ওর অভিজ্ঞ চোখ আরেকবার চাইল ঘরের চারপাশ। যে শক্তি তৈরি হচ্ছে, তাতে মনে হয় কয়েক হাজার লোককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। অথবা, অন্য কোনও কাজে ব্যবহার হয় ওই শক্তি।

দরজা খুলে আবারও হলওয়েতে বেরিয়ে এল উর্বশী।

করিডোরে কোনও ক্যামেরা চোখে পড়ছে না। পাহারা দেয়ার জন্য কোনও গার্ড নেই। অর্থাৎ, ব্রাঙ্কো এখানে নিজেদের নিরাপদ মনে করে। তথ্যগুলো মনের ভিতর গেঁথে নিল উর্বশী। এবার এই পাতালপুরী থেকে বেরুতে হবে।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটবার পর এক দরজার সামনে পৌঁছে গেল। ওটার উপর লেখা: সিঁড়ি। দরজা খুলে ফেলল উর্বশী, তবে হতাশ হতে হলো। সিঁড়ি বটে, তবে নীচের দিকে যাওয়ার!

'হতাশ হোয়ো না,' বিড়বিড় করে নিজেকেই বলল উর্বশী, পিছনে দরজা বন্ধ করে নামতে শুরু করল। চলেছে ফ্যাসিলিটির আরও গভীরে।

স্টিলের সিঁড়িগুলো বারবার বাঁক নিয়ে নেমেছে। একের পর এক ধাপ ডিঙিয়ে চারতলা নীচে থামল সিঁড়ি। কম ওয়াটের বাতি টিমটিম করে জ্বলছে। প্রায়ান্ধকার ল্যাণ্ডিং। সামনের করিডোর অন্ধকার। খানিক যাওয়ার পর সামনে পড়ল একটা দরজা। তার ওপাশে মাথাসমান উঁচু গোল একটা গুহা। উপরতলায় কাঠের গুঁড়ির তৈরি দেয়াল ছিল, এখানে শুধু পাথরের। কালো পাথুরে দেয়ালে খননের দাগ। কোথাও কোনও আলো নেই। কতদূর গেছে এই সুড়ঙ্গ? ছাতের সঙ্গে আঁটা সিরামিক ইনসুলেটারের সঙ্গে বাঁধা তামার পুরু তার। সংখ্যায় এক শ'র বেশি হবে। ওর ইঞ্জিনিয়ারিং অভিজ্ঞতা বলল, উপরের জেনারেটরগুলোর প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুৎ সহজে তারগুলোর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করা সম্ভব। কিন্তু কোন্ কাজে ব্যবহার হচ্ছে এসব?

'তুমি ঠিক কী করতে চাইছ, ব্রাঙ্কো?' বিড়বিড় করে বলল উর্বশী। মন থেকে কোনও জবাব পেল না।

তারগুলো অনুসরণ করবে কি না, ভাবতে চাইল উর্বশী। সেটা অন্ধের মত এগুনো হবে। বদ্ধ বাতাস যেন ওকে জানিয়ে দিল, সামনে বেরুবার রাস্তা নেই। আরেকটা কথা, ও রয়েছে কমপক্ষে পঞ্চাশ ফুট নীচে। এদিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথ থাকবার কথা নয়।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আবারও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল উর্বশী। প্রতিবাদ করছে সারাশরীর। পা ফেলতে গিয়ে বাড়ছে পেশিগুলোর ব্যথা। ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে। হাঁপিয়ে উঠছে। আঁকড়ে আসছে বুক। পাঁজরের হাড় হয়তো ভাঙেনি, তবে ক'টায় চিড় ধরেছে কে জানে।

উপরতলার মেঝেতে আবার যখন পৌঁছল, ততক্ষণে বুক জুড়ে দম আটকানো ব্যথা।

দরজার উপর কান পাতল উর্বশী। ওপাশ থেকে শুনতে পেল অস্পষ্ট আওয়াজ। কারা যেন কথা বলে চলেছে। একজন আরেকজনকে বলল, '...আর মাত্র দুই দিন পর পার্লা মোনার..., কাজেই আমাদের এবার...' চলে গেল লোকগুলো। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল উর্বশী, তারপর সাবধানে খুলল দরজা। হলওয়ে আবারও ফাঁকা। মিলিয়ে গেছে লোকগুলোর পদধ্বনি।

নিঃশব্দে এগুতে লাগল উর্বশী। নতুন করে খুঁজতে শুরু করেছে বেরিয়ে যাওয়ার পথ। দীর্ঘ এক হলওয়ের মাঝখানে পৌঁছে গেল। ঠিক তখন সামনে থেকে এল লোকজনের আওয়াজ। দ্রুত এবং নিশ্চিত পদক্ষেপে আসছে। ব্রাঙ্কো বা তার প্রহরী? চমকে গেল উর্বশী। বন্দিশালা চেক করে ফিরছে? বোধহয় তা নয়। বড়জোর তিরিশ মিনিট হয়েছে ও বেরিয়েছে ওখান থেকে। এখন কারও সামনে ধরা পড়লে? শরীরের এই অবস্থায় দৌড়াতেও পারবে না! একমাত্র উপায় এখন, করিডোরের কোনও দরজা দিয়ে ঢুকে পড়া।

পাশেই ধাতব এক দরজা। নব খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল উর্বশী, তবে পুরো বন্ধ করল না দরজা। কবাটের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। দ্রুত এল পদধ্বনি। লোকগুলো পেরিয়ে যাওয়ার পর প্রথমবারের মত অন্ধকার ঘরে চোখ বোলাল উর্বশী। একটা টেবিলে জ্বলছে ডিম করা ল্যাম্প। সে আলোয় দেখা গেল দু'পাশের দেয়ালে তিনটে করে ছয়টি কট। ওগুলোর মালিক ক'জন ঘুমে কাদা। দু'জন জোরে নাক ডেকে চলেছে। তবে ছ'জনের মধ্যে একজনের হালকা হয়ে এসেছে ঘুম। হঠাৎ বিড়বিড় করে কী যেন বলল সে, তারপর হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল। আবছা আঁধারে চেয়ে জানতে চাইল. 'ক্যাথি?' মিষ্টি কণ্ঠ।

'হ্যাঁ,' চাপা স্বরে বলল উর্বশী। 'ঘুমিয়ে পড়ো।'

কটে শুয়ে পড়ল মেয়েটি। কয়েক সেকেণ্ড পর ঘুমিয়ে পড়ল আবার। স্বাভাবিক হয়ে এসেছে শ্বাস।

চেপে রাখা দম ফেলল উর্বশী, ধড়ফড় করছে বুক। কয়েক মুহূর্ত ওখানে চুপ করে রইল, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ডরমেটরি থেকে। পিছনে আস্তে করে বন্ধ করে দিল দরজা।

প্রায় একঘণ্টা গোলকধাঁধার ভিতর ঘুরপাক খেল উর্বশী, তারপর সামনে পেল সিঁড়ি। উপরদিকে উঠে গেছে ধাপগুলো। যা ভেবেছে তা-ই, ও রয়েছে মাটির নীচে কোনও সেটলমেণ্টে। এটা কোনও ধরনের বেস। প্রতিটি ঘর যে আকৃতির, তাতে আন্দাজ করা যায়, এ ফ্যাসিলিটির আয়তন কমপক্ষে এক লাখ বর্গফুট বা তারও বেশি। এখানে মাটির নীচে কেন এটা তৈরি করা হয়েছে, কে জানে।

উপরে উঠে এল উর্বশী, তারপর সামনে পড়ল একটা দরজা। ধাতব কবাটে কান পাতল। ওপাশ থেকে আসছে সামান্য আওয়াজ। কিন্তু কীসের, বোঝা গেল না। ধীরে ধীরে দরজা খুলল উর্বশী, সামান্য ফাঁক করে ওদিকে চাইল। যতটুকু দেখা গেল তাতে মনে হলো সামনে ওটা কোনও গ্যারাজ। বিশ থেকে পঁচিশ ফুট উপরে ধাতব ছাত। একটা র‍্যাম্প চলে গেছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাইজের দরজার দিকে। পাথুরে দেয়ালের মাঝে পুরু স্টিলের ব্লাস্ট দরজা। আপাতত বন্ধ। দেখলে মনে হয় এ জিনিস ঠেকিয়ে দেবে নিউক্লিয়ার বোমাকে। গ্যারাজে কোথায় যেন বেজে চলেছে রেডিও। বাজনা শুনে মনে হলো ব্যাগের ভিতর ঢোকানো হয়েছে দুই হুলোবেড়াল, প্রাণপণে ঝগড়া করছে ওরা। নামকরা কোনও নতুন ব্যাণ্ড বোধহয়।

প্রকাণ্ড ঘরে কাউকে চোখে পড়ছে না। প্রায় পিছলে বেরিয়ে এল উর্বশী। একটু দূরে কাঠের ওঅর্কবেঞ্চ, ওটার আড়াল নিল।

পরক্ষণে চমকে উঠল। ইলেকট্রনিক লক মেকানিজম বন্ধ করে দিয়েছে দরজাটা। সম্ভবত, পাম রিডার আর নিউমেরিক কি-প্যাড ধরে ফেলেছে ট্রেসপাস। চাইলেও ও এখন ওপথে ফিরতে পারবে না। আর ফিরেই বা কী হবে? ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো পিটিয়ে মেরে ফেলবে ওকে ব্রাঙ্কো।

গ্যারাজের ভিতর কম ওয়াটের আলো জ্বলছে। তবে দূর দেয়ালের কাছে উজ্জ্বল বাতি আছে। ওখানে একটা ফোর-হুইল-ড্রাইভ পিকআপের উপর ঝুঁকে কাজ করছে দুই মেকানিক। এখান থেকে মনে হলো একজন রেডিয়েটর বদল করছে। দ্বিতীয়জন গাড়ির নাকের কাছে ওয়েল্ডিঙের কাজে ব্যস্ত—পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, হু-হু করে বেরিয়ে আসছে অক্সিঅ্যাসেটিলেন টর্চের নীল আভা। বাতাসে ধাতু পোড়ার কড়া গন্ধ। গ্যারাজে কয়েক ধরনের গাড়ি পার্ক করা। তার মধ্যে রয়েছে দুটো ট্রাক ও কয়েকটা ফোর হুইলার। ওই জিনিসের মত একটা নিয়ে রেসপন্সিভিস্টদের গ্রিস আস্তানা থেকে মার্ভেলে পৌঁছায় রানা।

উর্বশীর মন বলছে, খরচ হয়ে চলেছে সময়, এখুনি কিছু করা উচিত। একবার ভাবল, খুব ভাল হতো সঙ্গে রানা থাকলে। সত্যিই অদ্ভুত মানুষ রানা, একপলকে পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে নিখুঁত পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলে। ওই একই পরিকল্পনা দাঁড় করাতে ওর হয়তো লাগবে অনেকক্ষণ।

বোধহয় কিছুক্ষণের ভিতর ইন্টারোগেশন চেম্বারে ফিরবে ব্রাঙ্কো। তার মানে সবাই জানবে বন্দিনী পালিয়েছে। খুঁজতে শুরু করবে তারা। যেমন করে হোক তার আগেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে ওকে।

একবার গ্যারাজের দরজা দেখে নিয়ে সাবধানে এগুতে শুরু

করল উর্বশী। একটা রেঞ্চ তুলে নিল ওঅর্কবেঞ্চ থেকে, আড়াল আবডাল নিয়ে চলেছে পিকাপটার দিকে। আগেই খেয়াল করেছে, বেরিয়ে যাওয়ার অন্য কোনও পথ নেই। বেরুতে হবে গ্যারাজের ওই দরজা দিয়েই। তবে আগে খুলতে তো হবে ওটা। রেডিওর আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠবে ধাতব আওয়াজ। কাজেই একমাত্র উপায় এখন...

শক্তি দিয়ে হার মানাতে হবে দুই মেকানিককে!

যে রেঞ্চ সঙ্গে নিয়েছে, ওটা দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে পনেরো ইঞ্চি। ওজন হবে আট পাউণ্ড। এমন ভাবে বয়ে নিয়ে চলেছে, মনে হবে স্ক্যালপেল তুলে নিয়েছে দক্ষ সার্জন। বারো বছর বয়সে বাবার পেট্রল স্টেশনে একবার হামলা করেছিল দুই ছিনতাইকারী। সেবারই জীবনে প্রথমবারের মত লড়তে হয়েছিল উর্বশীকে। ওদের কাছে ছোরা ছিল। কিন্তু রেঞ্চ হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিল ও। নয়টা দাঁত খসিয়ে দিয়েছিল এক শয়তানের। অন্যজন ঝেড়ে দৌড়। পুলিশ এসে দেখল দাঁতগুলোর পাশে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে ছিনতাইকারী। পুলিশবাহিনী থেকে উর্বশীকে একটা সোনার মেডেল দেয়া হয়—অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই সবুজ রং ধরে সে সোনায়। যা-ই হোক, সেসময় যে রেঞ্চ হাতে ছিল, ঠিক তেমনই একটা এখন ওর হাতে।

গ্যারাজের ভিতর নিঃশব্দে চলেছে উর্বশী। বারবার কাভার নিচ্ছে, তারপর আবার সামনে বাড়ছে। খুব সাবধান। মানুষের পেরিফেরাল ভিশন সব সময় কোনাকুনি ভাবে অনেক দূর দেখে। নড়াচড়া চোখে পড়ে গেলে সর্বনাশ। তবে পা ফেলার শব্দ নিয়ে ভয় নেই, সব আওয়াজ ঢেকে দিয়েছে ব্যাণ্ড মিউজিক।

এক মেকানিকের মুখ ঢাকা গাঢ় রঙের ওয়েল্ডার শিল্ডে। কাজেই দ্বিতীয় মেকানিকের উপর মনোযোগ দিল উর্বশী। চিকন

লোক, তবে তাল গাছের মত লম্বা। গালে চাপ দাড়ি। বয়স হবে পঁচিশের মত। চুলে লেগেছে গ্রিজ। ইঞ্জিনের উপর ঝুঁকে পড়ে হোসপাইপ ঠিক করছে। এ লোক টের পেল না পাশে কেউ পৌঁছে গেছে। মাপা হাতে পাশ থেকে রেঞ্চ চালাল উর্বশী।

মাথার পাশে আঘাত লাগায় বিনা বাক্যব্যয়ে জ্ঞান হারাল লম্বু, হুমড়ি খেয়ে ইঞ্জিনের উপর পড়ল লোকটা। ওখানেই রইল। মাথার উপর তৈরি হয়েছে ডিম। আগামী অন্তত এক সপ্তাহ থাকবে ওটা।

ঘুরে দাঁড়াল উর্বশী। কী কারণে যেন সচেতন হয়ে উঠেছে ওয়েল্ডার। মাত্র সোজা হতে শুরু করেছে সে। একহাতে খুলতে শুরু করেছে মুখোশ। কিন্তু তৈরি উর্বশী, দু'পা সামনে বাড়ল, পরক্ষণে ডানদিক থেকে ঘোরাল রেঞ্চ। ঠিক সময়ে ছেড়ে দিল অস্ত্র। ওটা উড়তে শুরু করে লাগল গিয়ে প্লাস্টিকের ভাইযরে। প্লাস্টিকের ওই মুখোশটাই বাঁচিয়ে দিল লোকটার চেহারা, নইলে নাক-মুখ বলতে কিছু থাকত না। তবে রেঞ্চের গতি বেগ লোকটাকে ছিটকে ফেলে দিল পাশের রোলিং টুলবক্সের ভিতর। তার আগেই সে অজ্ঞান। দীর্ঘ রাবার লাইন নিয়ে উর্বশীর পায়ের কাছে পড়ল ব্লো-টর্চ। নীল আগুন হিসহিস করে বেরুচ্ছে। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল উর্বশী। সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে ছ্যাঁকা লাগল খোলা পায়ে, তাতেই চামড়া পোড়া গন্ধ ছুটল।

তৃতীয় একজন ছিল পিকআপ ট্রাকের ওপাশে, হঠাৎ বাম্পার ঘুরে বেরিয়ে এল সে। অদ্ভুত আওয়াজ শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। অজ্ঞান ওয়েল্ডারের দিকে হাঁ করে চাইল সে। চোখ আটকে গেছে টুলবক্সের উপর।

ততক্ষণে লাফিয়ে সামনে বেড়েছে উর্বশী।

লোকটা বুঝতে দেরি করছে। প্রথমে বিহ্বলতা দেখা দিল চোখে, এরপর হঠাৎই বুঝল। চট্ করে রেগে উঠল। তবে পাল্টা আক্রমণের ভাবনা এখনও তৈরি হয়নি মনে। খপ করে ব্লো-টর্চ তুলে নিল উর্বশী, সোঁ-সোঁ আওয়াজ তুলে জ্বলছে ওটা। লোকটাকে লক্ষ্য করে ডানদিক থেকে জিনিসটা ছুঁড়ল উর্বশী। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখাল মেকানিক, খপ করে ধরতে চাইল ছুটে আসা জিনিস।

ব্লো-টর্চের শিখা জ্বলছে ছ'হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায়। মুহূর্তে দেহ পুড়িয়ে দেবে ওই ভয়ানক নীল আগুন। ব্লো-টর্চ খপ করে ধরল লোকটা, কিন্তু আগুনের শিখা তাক হয়েছে ঠিক বুকের উপর। মুহূর্তে ওভারঅলের বুকে তৈরি হলো ধোঁয়া ওঠা গর্ত, পরক্ষণে বাষ্প হয়ে গেল চামড়া ও পেশি। দেখা দিল সাদা পাঁজরের খাঁচা। এখনও পুড়ছে। এক সেকেণ্ডে কালো হয়ে গেল সাদা হাড়। লোকটার চোখে রইল শুধু অবাক চাহনি। হাত থেকে পড়ে গেল তামার টর্চ।

তিন সেকেণ্ড পর মস্তিষ্ক বুঝল আর চলছে না হৃৎপিণ্ড। অলস ভঙ্গিতে কাত হয়ে মেঝের উপর পড়ল লাশ। মাংস-পোড়া গন্ধে বমি এল উর্বশীর। নিরীহ মেকানিককে খুন করতে চায়নি, তবে নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে সে। ভাইয়ের কথা মনে পড়ল উর্বশীর। ওকে উদ্ধার করতে হবে। নিজেকেও। আর এই কাজে বাধা হয়েছে ওই তিনজন।

টুলবক্সের ভিতর হুমড়ি খেয়ে পড়া মেকানিক লম্বায় উর্বশীর সমানই হবে। তার কভারল খুলে নিল ও। তবে লোকটার জুতো অস্বাভাবিক বড়। তৃতীয় মেকানিকের বুট উর্বশীর পায়ে লাগতে পারে। বিকট গন্ধ সহ্য করে বুট খুলতে শুরু করল, লোকটার বুকের দিকে তাকাচ্ছে না।

বুট পরে নেয়ার পর ওয়্যার-কাটার নিয়ে চলে গেল দুই ট্রাকের কাছে। একে একে হুড খুলল উর্বশী, পটাপট কেটে দিল ডিস্ট্রিবিউটার ক্যাপের তার। ওগুলো কালো শুঁড়ের মত পড়ে রইল মেঝের উপর। এবার চলেছে ওয়াড বাইকের দিকে, এমন সময় চোখে পড়ল ওঅর্কবেঞ্চের পাশে এক কফি মেশিন। ফিল্টার, মগ, প্লাস্টিক কণ্টেইনারে ক্রিমার পাউডারের পাশেই পাওয়া গেল এক কৌটো চিনি। ওটা নিল উর্বশী, দেরি না করে চলে গেল কাওয়াসাকির পাশে, ফিউল ক্যাপ খুলে ট্যাঙ্কে ঢেলে দিল চিনি। এবার বড়জোর সিকি মাইল এগুতে পারবে এ বাহন। ফিউল লাইন আর সিলিণ্ডার পরিষ্কার করতে লাগবে কয়েক ঘণ্টা।

একমিনিট পেরুনোর আগেই অবশিষ্ট অপর কাওয়াসাকিতে সওয়ার হলো উর্বশী, ইঞ্জিন চালু করে রিমোট কণ্ট্রোলের সুইচ টিপল। ধীরে ধীরে খুলে গেল গ্যারাজের প্রশস্ত দরজা। বাইরে রাত এখন। বয়ে চলেছে তুমুল ঝড়। চমকে উঠছে বিদ্যুৎ-শিখা। গ্যারাজের ভিতর এসে পড়ছে বৃষ্টির ছাঁট। চমৎকার পরিবেশ, এর বেশি কিছু চায়নি উর্বশী। দরজা খোলা থাকুক, অসুবিধা নেই। ব্রাঙ্কো বুঝে নেবে ও বেরিয়ে গেছে।

কাওয়াসাকি নিয়ে গ্যারাজ থেকে বেরিয়ে এল উর্বশী। বৃষ্টির ছাঁট প্রায় বুজিয়ে দিতে চাইল দুই চোখ। থ্রটল মুচড়ে দ্রুত গতি তুলে রওনা হয়ে গেল ডানদিকের রাস্তা ধরে। কোথায় চলেছে, জানে না।

পাঁচ

দক্ষ পাঁচ কমাণ্ডোকে ফিলিপিন্সের রেসপন্সিভিস্ট ফ্যাসিলিটির উপর চোখ রাখার জন্য রেখে গেছে ব্রাঙ্কো। কেউ যদি ঘুরে ফিরে দেখতে চায়, তাদের বাধা দেবে না ওরা। তবে কেউ যদি ওটার নীচের ভূগর্ভস্থ টানেলে ঢোকে, সেক্ষেত্রে আক্রমণ করতে হবে। কয়েক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে তারা এই সাইট পাহারা দিয়ে চলেছে। একবার দুই ফিলিপিনি আসে তাদের পুরনো মোটরসাইকেল নিয়ে। কয়েক মিনিট ছিল। সব ঘুরে দেখে বুঝেছে লুঠ করবার মত কিছুই নেই। এরপর নীল ধোঁয়া ছেড়ে মোটরসাইকেল নিয়ে উধাও হয়েছে।

তবে আজ যে দু'জন এল, এদের আচরণ খুবই সন্দেহজনক। সতর্ক হয়ে উঠেছে রেসপন্সিভিস্টদের পাঁচ কমাণ্ডো। এরপর যখন মাঠ পেরিয়ে এল বিস্ফোরণের আওয়াজ, বুঝতে দেরি হলো না এদের মত লোকদের জন্যই রাখা হয়েছে ওদের পাহারাদারিতে।

সোহেল সিমেন্টের চাপড়ার সঙ্গে নীচে হারিয়ে যেতেই লাফিয়ে পড়েছে রানা নিজেও। দু'সেকেণ্ড পর ধাপের উপর পড়ল ওর ডান পা, পড়তে গিয়েও সামলে নিল। বাতাস বদ্ধ এখানে। পুরু ধুলোর আস্তরণ ভাসছে চারপাশে। কিছুই চোখে পড়ে না। প্রায়

অন্ধের মত ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করেছে রানা। আশা করছে নীচের ধাপ থেকে সরে গেছে সোহেল। হঠাৎ উপর থেকে খসে পড়ল মাথার সমান এক পাথর। কাঁধে লেগে পিছলে গিয়ে নীচে পড়ল ওটা। ব্যথায় কুঁচকে গেল রানার মুখ। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, শেষ কয়েক ধাপ গড়িয়ে নীচে গিয়ে পড়ল। উপর থেকে হুড়মুড় করে নেমে আসছে পাথর ও সিমেন্টের স্ল্যাব। রানার চারপাশে উড়ছে ধুলো।

শক্তিশালী একটা হাত রানার বুশ শার্ট খামচে ধরল, ওকে টেনে সরিয়ে নিল অ্যান্টি চেম্বারে। অ্যাভালাঞ্চ শুরু হয়েছে সিঁড়ির উপর থেকে।

রানাকে হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল সোহেল। দু'জনের পোশাক ও মুখ ধূলির কারণে হয়ে উঠেছে ধূসর। যে কাঠের গুঁড়ি সিঁড়ি-ঘর ধরে রাখে, হঠাৎ ধসে পড়ল সেগুলোও। নতুন করে পড়তে শুরু করেছে সিমেন্টের চাপড়া ও কাঠের গুঁড়ি। দেখতে না দেখতে হারিয়ে গেল সিঁড়ি। অসংখ্য পাথর এসে থামল অ্যান্টি চেম্বারের মুখে। এ ঘরে এক ফোঁটা আলো রইল না আর। চারপাশে নিকষ অন্ধকার।

হ্যাভারস্যাক থেকে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে জ্বালল সোহেল। এতই উজ্জ্বল আলো যে হারিয়ে দেবে গাড়ির যেনন হেডল্যাম্পকে। তবে সেই আলোয় চোখে পড়ল শুধু কংক্রিটের ধূলির মেঘ।

'অন্য কিছু মনে পড়ছে তোর?' শুকনো হাসল সোহেল। 'বছর খানেক আগে জুরিখের এক উকিলকে কিডন্যাপ করতে গিয়ে...'

'হুঁ।' কাশতে শুরু করেছে রানা।

'আমাদের রিসেপশন কমিটির ব্যাপারে কী মনে হয় তোর?'

'গাধা বনে গেছি। আগেই বোঝা উচিত ছিল। কোনও কাজ

এত সহজ হতে পারে না।'

'তোর কথার উপর *আমিন*, শ্যালক আমার।' রুদ্ধ প্রবেশ দ্বারের উপর আলো ফেলল সোহেল। কয়েকটা কংক্রিট স্ল্যাব ওজনে পাঁচ শ' কেজির বেশিই হবে। 'এখান থেকে বেরুতে হলে কয়েক ঘণ্টা খাটতে হবে।'

'আমরা একটা গর্ত তৈরি করি, আর অমনি নেমে আসুক ওরা রাইফেল বাগিয়ে।' সেফটি অন করে কোমরে পিস্তল গুঁজে রাখল রানা। 'আমাদের বাড়তি অস্ত্র নেই। তার উপর এরা দলে বোধহয় ভারী। অ্যাম্বুশের ভিতর গিয়ে পড়বে কে?'

'তো চুপচাপ বসে থেকে ওদের ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করব?'

'না, অন্য কিছু করব। সঙ্গে রয়েছে কেবল একটা ক্যান্টিন আর কয়েকটা প্রোটিন-বার। এই রসদ নিয়ে ওদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটানো যাবে না। নিশ্চিন্তে কেয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ব্যাটারা।' কথার ফাঁকে স্যাটালাইট ফোন বের করেছে রানা।

'ফু-চুঙের সঙ্গে যোগাযোগ কর,' পরামর্শ দিল সোহেল। 'চলে আসুক অ্যাসল্ট টিম নিয়ে। আটচল্লিশ ঘণ্টার ভিতর পৌঁছতে পারবে।'

'তাই চাইছিলাম,' শুকনো স্বরে বলল রানা, 'তবে কোনও সিগনাল নেই।' ফোনের পাওয়ার অফ করে দিল। এখন থেকে বাঁচাতে হবে ব্যাটারির শক্তি।

কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল। 'আমি যে কটা কথা বলেছি, সব মাঠে মারা গেছে, এবার তোর আস্তিনের ভাঁজে কী আছে দেখা।'

সোহেলের হাত থেকে আলো নিল রানা। চারপাশ দেখছে। ঢালু হয়ে সামনে নেমে গেছে সুড়ঙ্গ। বহু বছর আগে পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে। 'চল্, দেখি গিয়ে সামনে কী।'

'আর ওরা যদি পিছু নেয়?'

‘ওরা জানে আমরা কচি খোকা নই। অ্যাম্বুশ করতে পারি। সহজে পিছু নিতে চাইবে না।’

‘ভেবে দেখ, এখানেই অপেক্ষা করবি কি না।’

‘আমি যদি ওই দলের নেতা হতাম, সবাইকে নিয়ে নামার আগে ক’টা গ্রেনেড ফেলতাম এখানে। গুলি করার আগেই কিমা করে দিতাম। এদিকে আমরা যদি গ্রেনেড থেকে দূরে সরে যাই, সুড়ঙ্গের ভিতর হারিয়ে যেতে পারি। সবদিক ভেবে মনে হচ্ছে, আপাতত এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত। প্রতিরোধ করা যায় এমন জায়গা খুঁজে অপেক্ষা করব সেখানে। আর ভাল দিক, এরা যদি পিছু নেয়, তার অর্থ এই সুড়ঙ্গের আরেকটা মুখ আছে।’

কয়েক সেকেণ্ড ভাবল সোহেল, তারপর আস্তে করে মাথা দোলাল। ‘চল্, পাতালপুরীর দিকে রওনা হওয়া যাক।’

ঢালু হয়ে নীচের দিকে চলে গেছে সুড়ঙ্গ। একদিকের দেয়াল তৈরি পাথুরে স্ল্যাব দিয়ে। ওখানে মানুষের যন্ত্রপাতির দাগ। দু’জন পাশাপাশি হাঁটছে। ওদের দশ ফুট উপরে এবড়োখেবড়ো ছাত।

‘ন্যাচারাল ফিশার,’ পাথরের দেয়াল লক্ষ করছে রানা। ‘পরে সুড়ঙ্গ আরও দূরে নিয়ে গেছে জাপানিরা।’

‘ভূমিকম্পে বোধহয় ফেটে যায় নিরেট পাথর,’ সায় দিল সোহেল। ‘আর সেই সুড়ঙ্গ যেখানে শেষ হয়েছে, তার উপর ফ্যাক্টরি বা যাই হোক, তাই তৈরি করেছে।’

পাথরের মেঝের উপর আলো ফেলল রানা। এখানে ওখানে কালো ধাবড়া দাগ। কিছু জায়গায় পিচকারি দিয়ে ছিটানোর মত—সবই রক্ত, এখন কালো বর্ণ ধারণ করেছে। চাপা গলায় বলল রানা, ‘গুলি করে মেরেছে।’

‘শুধু একজনকে না, অনেককে,’ বলল সোহেল।

ওদিক থেকে আলো সরিয়ে নিল রানা। থমথম করছে মুখ।

সুড়ঙ্গের ভিতর নামতে শুরু করেছে তাপমাত্রা। সেইসঙ্গে বাড়ছে আর্দ্রতা। সুড়ঙ্গ ধরে চলেছে দুই বন্ধু। গম্ভীর হয়ে গেছে, ভাবছে এখানে কী ঘটেছিল। মানুষগুলোকে খুন করা হলো কেন? মেরুদণ্ডের ভিতর শিরশির করছে ওদের। তা তাপমাত্রা কমে যাবার জন্য নয়।

সোজাসুজি যায়নি সুড়ঙ্গ। বারবার বাঁক নিয়ে ক্রমেই নেমে চলেছে। পঁচিশ মিনিট পর দুই মাইল পেরিয়ে সমতল হলো মেঝে। প্রথমবারের মত একটা চেম্বার নজরে পড়ল। পাথর ধসে আংশিক ভাবে বুজে গেছে কুঠুরির প্রবেশদ্বার। বেশ ঝুঁকে নেমে এসেছে সুড়ঙ্গের ছাত। আলগা হয়ে এসেছে পাথরগুলো। যে-কোনও সময়ে ধস শুরু হতে পারে। প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি গুহা, তবে পাথর খুঁড়ে আরও বড় করে নিয়েছে জাপানিজ আর্মি। এ কুঠুরি প্রায় বৃত্তাকার, ব্যাসে পঞ্চাশ ফুটের মত। পনেরো ফুট উপরে ছাত। ঘরের ভিতর প্রায় কিছুই নেই। দেয়ালে রয়েছে শুধু কিছু বল্টু। একসময় ওগুলো ধরে রেখেছে ইলেকট্রিকের কেবল।

'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এরিয়া,' নিচু স্বরে বলল সোহেল।

'তাই মনে হয়।'

সুড়ঙ্গ ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা। কিছুক্ষণ পর দু'পাশের দেয়ালে ছোট দুটো গুহা পেল। ভিতরে কিছুই নেই। তবে চতুর্থ গুহার ভিতর পাওয়া গেল আর্টিফ্যাক্ট, ফেলে গেছে জাপানিরা। মেঝের সঙ্গে বল্টু দিয়ে আটকানো বারোটা লোহার বাঙ্ক। এক দেয়ালে ধাতব কেবিনেট, মরচে ধরে খসে পড়ছে এখন। ড্রয়ার টেনে দেখতে শুরু করল রানা।

বেডস্টেড পরীক্ষা করে দেখছে সোহেল। 'তোর কী মনে হয়, জাপানিরা তাদের বন্দিদের বিছানা দিত?'

'এসব ড্রয়ারে কিছুই নেই,' বলল রানা। বন্ধুর দিকে চাইল। 'কোনওদিন শুনিনি বিছানা দিয়েছে। তবে ভাইরাস দিয়ে যাদের উপর পরীক্ষা করত, তাদের জন্য বিছানা থাকত। একইসঙ্গে টাইফাস, কলেরা বা অন্য কোনও ধরনের বিষাক্ত গ্যাস পরীক্ষা করত মানুষগুলোর উপর। তখন বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখত তাদের।'

ধাতব বাক্স থেকে ঝট করে হাত সরিয়ে নিল সোহেল। বিড়বিড় করে কাকে যেন গালি দিল।

সুড়ঙ্গে বেরিয়ে এল ওরা, কিছু দূর যাওয়ার পর দু'পাশে পেল চারটে চেম্বার। এগুলো যথেষ্ট বড়। প্রতি গুহার ভিতর চল্লিশটা করে বাক্স। সুড়ঙ্গের পাশে কোমর উঁচু এক গুহা-মুখ চোখে পড়ল। ওটার ভিতর বুক-মাথা ঢোকাল রানা, আলো ফেলে চারপাশ দেখতে চাইল। সামনের মেঝে হঠাৎ উধাও হয়েছে। হাঁ করেছে কালো গহ্বর। নীচের দিকে আলো ফেলল রানা। গুহার মেঝের উপর জমেছে অজস্র জঞ্জাল। প্রায় কিছুই চেনা যায় না। ওখানে আবর্জনা ফেলা হতো। তবে তার ভিতর একটা জিনিস চোখে পড়ল রানার—মানুষের হাড়! কঙ্কালের অংশগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বোধহয় ইঁদুরের কাজ। ওখানে কত লোকের লাশ ফেলেছে, বুঝবার উপায় নেই। তবে আন্দাজ করা যায়, কমপক্ষে পাঁচ শ'।

'এটা কসাইখানা ছিল,' পিছিয়ে এল রানা।

'ডেথ ফ্যাক্টরি।' বিড়বিড় করল সোহেল। 'এখানে এই কাজই চালিয়ে গেছে ওরা আঠারো মাস ধরে।'

'মাটির উপর ছিল টিন শেড, নীচে এই ল্যাবোরেটরি। এটাকে গোপন রাখা হয়। ভাইরাসের আক্রমণ ঠেকাতে ব্যবহার করেছে সুড়ঙ্গকে। যদি হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ে রোগ, বন্ধ করে দেবে

উপরে ওঠার পথ।'

'সবই ঠাণ্ডা মাথায় করেছে, কোথাও কোনও ত্রুটি রাখেনি,' কর্কশ শোনাল সোহেলের কণ্ঠ। 'নাজিদের বাড়তি কিছু কৌশল শেখাতে পারত জাপানিরা।'

'শেখায়নি তা কিন্তু না,' বলল রানা। 'উনিশ শ' একত্রিশ সালে শুরু হয় ইউনিট সেভেন টোয়েন্টি টু। সেটা হিটলার ক্ষমতায় আসার দু'বছর আগে। আর যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত জার্মানি ও জাপান নিজেদের ভিতর আদান-প্রদান করে তথ্য ও প্রযুক্তি। জার্মানি দিয়েছে ইমপেরিয়াল জাপানকে জেট ও রকেট ইঞ্জিন, যাতে ওগুলো ব্যবহার করতে পারে সুইসাইডাল মিশনে। সঙ্গে দিয়েছে নিউক্লিয়ার মেটারিয়াল। বদলে জাপান সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করবার নানা পৈশাচিক কৌশল শিখিয়েছে জার্মানিকে।'

চুপ রইল সোহেল। এগিয়ে চলেছে ওরা। চারপাশে পাথরের সুড়ঙ্গ, যেন হঠাৎ চেপে আসবে। ওরা শুনতে পেল না সুড়ঙ্গের মুখে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। তবে কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল বেড়ে গেছে বাতাসের চাপ। মনে হলো হঠাৎ পাশ দিয়ে ছুটে গেল কোনও দ্রুতগামী ট্রাক। রেসপন্সিভিস্টরা বোমা বসিয়ে আবর্জনা ও জঞ্জাল সরাতে শুরু করেছে। তার মানে, ঠিক করেছে পিছু নেবে। মেরে রেখে যাবে ওদের।

'ওরা এই সুড়ঙ্গ চেনে, কাজেই দ্রুত আসবে,' গম্ভীর স্বরে বলল রানা। 'আন্দাজ আধঘণ্টা পাব, তার ভিতর বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে নিতে হবে। তা যদি না পারি, এমন কোনও জায়গা বাছাই করতে হবে, যেখান থেকে প্রতিরোধ করা যায়।'

'সঙ্গে দুটো পিস্তল আর এগারোটা বুলেট নিয়ে?' শুকনো হাসল সোহেল। 'ওদের কাছে অ্যাসল্ট রাইফেল আছে।'

'তাতে কী? যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।'

এরপরের মেডিকেল চেম্বার থেকে অনেক কিছুই সরিয়ে নেয়া হয়নি। বাঙ্কের উপর পাতলা ম্যাট্রেস। কেবিনেটগুলোর ভিতর অসংখ্য জার। জার্মান ভাষায় কেমিকালগুলোর নাম লেখা।

জার ও বোতলগুলো দেখাল রানা। 'প্রমাণ হয়ে গেল, জার্মানরা এদের সহায়তা দিয়েছে।'

লেবেল পড়তে শুরু করেছে সোহেল। এক এক করে বলে চলেছে: হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। সালফার ডাইঅক্সাইড। ক্লোরিন। ডিসটিল্ড অ্যালকোহল।

বন্ধুর দিকে চাইল রানা। 'জার্মান শিখে ভাল করেছিস। তুই তো সাইন্সে ছিলি। বের কর বাইকার্বোনেট।'

'আমার মত একই কথা ভাবছিস?' বলল সোহেল। 'কিন্তু হঠাৎ তোর আবার পেটে ব্যথা কেন? ...ভয়ে?' ঠাট্টা করতে চাইল সোহেল, কিন্তু জমল না। ঘাঁটতে শুরু করেছে বোতল ও জার। 'হাইস্কুলে ঘোলাটে চোখঅলা এক স্যর ছিলেন,' কাজের ফাঁকে বলল, 'আড়ালে আমরা ডাকতাম কুমির বলে। কেমিস্ট্রি পড়াতেন। তাঁর শেখানো নিরাপদ কেমিকালগুলোর নাম ভুলেই গেছি। তবে কী ধরনের কেমিকাল দিয়ে অস্ত্র তৈরি করা যায় মনে গেঁথে ছিল। ...তোর শিখতে হয়েছে আর্মিতে কমাণ্ডো ট্রেইনিঙে গিয়ে।'

'হুঁ।'

বাইকার্বোনেট পেয়েছে রানা। সোহেল আরও কী যেন খুঁজতে শুরু করেছে। রানা খুঁজছে অন্যান্য কেমিকাল। একটা একটা করে রাখছে ওরা কেবিনেটের ছাতে।

কিছুক্ষণ পর বলল সোহেল, 'এবার আমাদের কেমিকাল

ওয়ারফেয়ার শুরু।'

দু'জন মিলে ঠিক করল কোথায় অ্যাম্বুশ করবে। ওদের পছন্দ হলো ছোট এক মেডিকেল ওয়ার্ড। বাণ্ডিল বানিয়ে কিছু ব্ল্যাঙ্কেট ও ম্যাট্রেস নিয়ে এল রানা। শেষ বাঙ্কের নীচে রাখল ওগুলো। শুয়ে পড়া দুই লোকের মত করে সাজিয়ে দিল। সোহেলের ব্যাগ থেকে বেরুল ইলেকট্রিকাল টেপ। দু'জন মিলে কেমিকাল, ক্যান্টিন ও টেপ ব্যবহার করে তৈরি করল বুবি ট্র্যাপ। ফ্ল্যাশলাইটের অনিশ্চিত আলোয় মনে হলো যথেষ্ট ভাল হয়েছে ম্যানিকিন দুটো। রেসপন্সিভিস্টদের মনোযোগ কাড়বে। এবার সেল ফোন দুই মূর্তির মাঝে রাখল সোহেল। আগেই চালু করেছে ওয়াকি-টকি মোড।

ওই কুঠুরি থেকে বেরিয়ে পনেরো ফুট এগুলো ওরা, তারপর উল্টোদিকের কুঠুরির ভিতর ঢুকল। একবার পরস্পরের দিকে চাইল। গোল্ড অভ মার্স জাহাজে রেসপন্সিভিস্টরা যা করেছে, সে তুলনায় খুব বেশি কিছু করছে না ওরা।

এক এক করে মিনিট পেরুতে লাগল। রানার ঘড়ির লিউমিনিয়াস সেকেণ্ডের কাঁটা তিরতির করে এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পর ওর মনে হলো নড়ছে না কাঁটাগুলো। অধৈর্য লাগছে। অপেক্ষা সত্যিই বিরক্তিকর।

আগেও অসংখ্যবার অ্যাম্বুশ করেছে ওরা। ওদের জানা আছে অধৈর্য হওয়া চলবে না। আঁধারে চোখ জ্বেলে অপেক্ষা করছে। সুড়ঙ্গের ভিতর কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই। পাথুরে দেয়ালে কান পেতে রইল। সামান্য আওয়াজ পেলে ঠিকই শুনবে।

বিশ মিনিট পেরিয়ে গেল, এরপর শব্দ পেল। অন্ধকারে এগিয়ে আসছে দু'জন। এরপর এল তৃতীয়জনের পায়ের আওয়াজ। রেসপন্সিভিস্টদের সশস্ত্র লোকগুলো সুড়ঙ্গ ধরে দ্রুত

এগোচ্ছে। কোনও আলো জ্বলছে না। রানা-সোহেল বুঝে নিল, লোকগুলোর সঙ্গে রয়েছে ইনফ্রারেড ল্যাম্প, সঙ্গে নাইট ভিশন গগলস। লাল আলোয় সব পরিষ্কার দেখবে।

দু'পাশের কুঠুরির কাছে আসবার আগেই ছোটার গতি কমিয়ে এনেছে লোকগুলো।

কোনও অ্যাম্বুশের কথা ভাবছে?

তাদের দেখতে পেল না রানা বা সোহেল। তবে আওয়াজ থেকে আন্দাজ করছে, লোকগুলো কী করছে। হাঁটবার আওয়াজ প্রায় নেই বললেই চলে। ওদের পিছনে রেখে আসা মেডিকেল ওয়ার্ডের মুখে পৌঁচেছে তারা। বোধহয় ভিতরে ঢুকবে দু'জন। কাভার দেবে তৃতীয়জন।

পাথুরে মেঝের উপর ঠং-ঠনাৎ করে ঘষটে গেল ধাতব কিছু। সঙ্গে সঙ্গে কথা বলে উঠল কেউ।

'আমি তোমাদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। মাথার উপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো। তোমাদের কোনও ক্ষতি করা হবে না।'

কুঠুরির প্রবেশ-পথের পাশে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল গার্ডদের একজন, দু'হাতে নিষ্কম্প অ্যাসল্ট রাইফেল। নিশানা স্থির রেখেছে ম্যাট্রেসগুলোর উপর।

সোহেলের পিঠের কাছে মুখ নিয়ে সেল ফোনে নিচু স্বরে বলল রানা, 'যা, মর্ ব্যাটা, জাহান্নামে যা!'

মেডিকেল ওয়ার্ডে সোহেলের ফোনের ভলিউম ম্যাক্সিমাম করা, লোকগুলোর হয়তো মনে হলো কর্কশ স্বরে আপত্তি তুলেছে লোকটা। একইসঙ্গে গুলি শুরু করল দুটো অস্ত্র। মাযল ফ্ল্যাশ হতেই আবছা আকৃতি দেখা গেল তিনজন লোকের। অদক্ষ নয়, পেশাদার কমাণ্ডো। দু'জন কুঠুরির দরজার ঠিক সামনে। একজন কাভার দিয়েছে তাদের। একইসঙ্গে খেয়াল রাখছে সুড়ঙ্গ থেকে

কোনও হামলা হয় কি না।

এত বদ্ধ জায়গায় গুলির আওয়াজে ভোঁ-ভোঁ করছে কান।

কয়েক সেকেণ্ড পর থেমে গেল গুলি। অপেক্ষা করল রানা-সোহেল। দেখা যাক কী করে এরা। ওই কুঠুরির ভিতর যত গুলি পাঠিয়েছে, সেগুলো দিয়ে অনায়াসে খুন করা যেত বারোজনকে। যে কাভার দিয়েছে সে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল। দেরি না করে গগলস খুলে ফেলল তারা। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য অন্ধ হয়ে গেল। তারপর যে দু'জন ঘরের ভিতর গুলি চালিয়েছে, তারা সাবধানে সামনে বাড়ল। কোনও ফাঁদ থাকতে পারে, কাজেই তৈরি রইল তৃতীয়জন।

লোকগুলোকে হতাশ করল না রানা ও সোহেল।

যেখানে ওদের শেষ প্রতিরক্ষা-বূহ্য থাকতে পারে, সেটার একটু আগে বেডস্টেডের সঙ্গে ইলেকট্রিকাল টেপ পেঁচিয়ে তৈরি করেছে বাধা। সামনের গানম্যানের পুরো মনোযোগ রয়েছে মৃতদেহদুটোর দিকে, তার চোখেই পড়ল না গোড়ালির কাছে টান খেল টেপ। আরও এক পা এগুলো সে।

ইলেকট্রিকাল টেপ আটকে রেখেছিল ক্লোরিন ও সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের বোতলকে। টেপে টান পড়তেই ঠাস্ করে পড়ে গেল ভঙ্গুর বোতল। ফাটা কাঁচের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল কেমিকাল। সব পড়ল ক্যান্টিন থেকে ঢেলে দেয়া পানির ভিতর। তার সঙ্গে আগেই কয়েকটি কেমিকাল মিশিয়েছে রানা-সোহেল।

বোতল ভেঙে যেতেই গুলি শুরু করল ওরা। কাঁচ ভাঙবার আওয়াজ পেয়েই ঝট করে নড়ে উঠেছে তৃতীয় গার্ড, কিন্তু কোনও সুযোগই পেল না সে। একটা বুলেট বিঁধল কাঁধের হাড়ের ঠিক নীচে, পেশি ছিঁড়ল ওটা। দ্বিতীয় বুলেট সরাসরি লাগল কণ্ঠার উপর। এক পাক খেয়ে মেঝের উপর ঝুপ করে

পড়ল লাশ। হাতে তখনও শক্ত করে ধরা ফ্ল্যাশলাইট আর অ্যাসল্ট রাইফেল। আলো গিয়ে পড়ল কুঠুরির দরজার উপর। ওদিক থেকে বেরুতে শুরু করেছে সবজেটে মেঘ।

চেম্বারে কেমিকাল রিয়্যাকশনে তৈরি হয়েছে হাইড্রোক্লোরিক, হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড ও অন্য ক'টি কেমিকালের কুয়াশা। লোক দুটো দু'সেকেণ্ড পর বুঝতে পারল, কোথাও কোনও গোলমাল ঘটেছে। ভীষণ জ্বলতে শুরু করেছে গলা ও ফুসফুস। কণ্ঠনালী ও আশপাশকে আক্রমণ করেছে ঝাঁঝাল ধক। অসম্ভব হয়ে উঠল শ্বাস নেয়া। যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করেছে তারা।

কর্কশ ফিউমের কারণে কেশে চলেছে। প্রতি শ্বাসের সঙ্গে দেহের ভিতর মিশছে টক্সিন। শেষ পর্যন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু ততক্ষণে বেদম কাশছে, প্রায় উবু হয়ে গেল বারংবার ঝাঁকিতে। ফুসফুসের গভীর থেকে বেরুতে লাগল কফ ও তাজা রক্ত।

অতি অল্প সময়ের এক্সপোযার, তবে দ্রুত মেডিকেল চিকিৎসা না পেলে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটবে ওদের। বহু সময় নিয়ে কষ্ট পেয়ে মরবে। রানা বা সোহেল বাধা দেওয়ার আগেই এদের একজন হঠাৎ বুঝে ফেলল কী ঘটেছে, খুলে ফেলল সে হ্যাণ্ড গ্রেনেডের পিন।

এক সেকেণ্ড পেরুনোর আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হলো—পিছনের ছাত খুবই ভঙ্গুর—একমাত্র উপায় এখন ঝেড়ে দৌড় দেয়া। খপ্ করে সোহেলের হাত ধরল রানা, পরক্ষণে ক্ষিপ্র চিতার মত ছুটল। আরেকহাতে জ্বেলে নিয়েছে ফ্ল্যাশলাইট। বন্ধুর হাত ছেড়ে দিয়ে সুড়ঙ্গের দেয়াল ঘেঁষে ছুটছে রানা। পিছনে উড়ে আসছে সোহেল। একইসঙ্গে সেকেণ্ড গুনছে

ওরা, গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ার আগ-মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনে।

সুড়ঙ্গের চারদিকে ছিটিয়ে পড়ল গ্রেনেডের শ্র্যাপনেল। ঝলসে উঠল উজ্জ্বল আঁলো, সেই সঙ্গে বিকট আওয়াজ। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল ওভারপ্রেশার, যেন হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চলেছে সব। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল রানা-সোহেল, ছুটল তীরের মত। নতুন এক জোরাল আওয়াজ শুরু হয়েছে, যেন সুড়ঙ্গের ভিতর ছুটতে শুরু করেছে রেলগাড়ি। কানে ধাঁধা ধরল। বিস্ফোরণের ফলে উপর থেকে পড়ছে পাথরের স্ল্যাব। ছাত ও মেঝের বুকে ফাটল ধরছে, উপর থেকে হুড়মুড় করে পড়ছে পাথর, বালি। যে-কোনও সময়ে চাপা পড়বে ওরা। সুড়ঙ্গ ভরে উঠেছে ধুলোয়। চারপাশে পড়ছে ছোট থেকে শুরু করে বড় পাথর। একহাতে মাথা ঢেকে দৌড়ে চলেছে ওরা। পিছনে ধসে পড়ল ছাতের বড় এক অংশ। ছুটতে ছুটতে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল রানা। উপর থেকে নেমে এল ট্রাকের ইঞ্জিন আকৃতির এক পাথর, বিকট আওয়াজ তুলে সামনে পড়ল। লাফিয়ে পাথর টপকে গেল রানা, যেন হার্ডল রেসের প্রতিযোগী। মাথার উপর চড়চড় শব্দে ফাটছে ছাত। তৈরি হচ্ছে অসংখ্য সরু ফাটল। ওগুলো যেন কালো রঙের বিদ্যুৎ-শিখা। বেড়েই চলেছে পাথর পতনের আওয়াজ।

তারপর হঠাৎ থেমে গেল সব। বিকট গর্জন আর নেই। তবে কখনও একটা দুটো পাথর পড়ছে। ছুটবার গতি কমাল রানা, টের পেল ধুলোর কারণে শুকিয়ে গেছে মুখের ভিতরটা। আরও ক'পা গিয়ে থেমে গেল। ওদিকের সুড়ঙ্গ বুজে গেছে অসংখ্য পাথরে।

'তোর কী হাল?' প্রিয় বন্ধুর দিকে চাইল রানা।

উবু হয়ে বাম কাফ মাসল পরখ করল সোহেল। ওখানে তীক্ষ্ণ পাথরের একটা টুকরো ছিটকে এসে লেগেছে। ব্যথা করছে, তবে কাটেনি।

'তোর বোনের কপাল ভাল যে মরিনি। তোর কী অবস্থা?'

'এখনও টিকে। এবার চল্, সুড়ঙ্গ থেকে বেরুতে হবে।'

'ভাল দিকটা চিন্তা করে দেখ,' পাশে হাঁটতে শুরু করে বলল সোহেল। 'ওরা আর পিছু নেবে না।'

'হু নোজ?'

পরবর্তী দু'ঘণ্টা এগিয়ে চলল ওরা ভূগর্ভস্থ ফ্যাসিলিটির ভিতর দিয়ে। বেশকিছু প্রকাণ্ড ঘর পেল, যেখানে আটকে রাখা হতো এক শ' আশিজন করে বন্দি। সঙ্গে ছিল ল্যাবোরেটরি। কেমিকালগুলো ফেলে গেছে। একটা ইকুইপমেন্ট চিনল ওরা। এ জিনিসকে বলা হয় অ্যাটমসফিয়ার চেম্বার।

'বিস্ফোরণের ডিকমপ্রেশন পরীক্ষা করত,' বলল সোহেল।

চুপচাপ সুড়ঙ্গ ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা। তবে কিছুক্ষণ পর ফুরিয়ে গেল দীর্ঘ সুড়ঙ্গ। পরস্পরের দিকে চাইল রানা-সোহেল। পাথর গেঁথে বন্ধ করা হয়নি পথ, বোমা মেরে দু'পাশের দেয়াল ধসিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে গুহাপথ। এসব পাথরে এখনও লেগে রয়েছে বিস্ফোরকের কটু গন্ধ।

'গত কয়েকদিনের ভিতরই করেছে একাজ,' বলল রানা।

'যখন রেসপন্সিভিস্টরা চলে যায়।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। নিরাশ হতে রাজি নয়। আলগা পাথরের উঁচু স্তূপ সামনে। সাবধানে ওটার উপর উঠতে শুরু করল। পায়ের নীচ থেকে ঝরঝর করে নীচে পড়ছে ধুলোবালি, পাথরের টুকরো। ঢিবির উপর প্রায় পৌঁছে গেল। পাথরে হেলান দিয়ে উপরের দিকে আলো ফেলল। নীচের

পাথরগুলো ধরে রেখেছে ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া ছাতকে। উপর থেকে ডাকল রানাঃ 'এ গোরস্তানে কিছু নেই যা রেসপন্সিভিস্টদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারি। জাপান আর্মির পরিত্যক্ত পুরনো ফ্যাসিলিটি। ব্যস।'

'কিন্তু এই বাধা পেরুলে কী পেতে পারি?'

'জানি না,' বলল রানা। 'তবে কষ্ট করে এখানে এসেছে ওরা, বন্ধ করে দিয়েছে সুড়ঙ্গ। কাজেই আন্দাজ করতে পারি ওপাশে বেরুবার পথ থাকবে।'

'তাই যদি হয়, তা হলে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

সোহেল স্তূপ বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। রানার খানিক নীচে থামল। কাজ শুরু করল দুই বন্ধু।

গ্যাস আক্রমণ সৃষ্টি করতে গিয়ে ক্যান্টিনের পানি শেষ হয়েছে। এরপর ঘণ্টা দুয়েক হেঁটেছে। মুখের ভিতর একগাদা ধুলো। ওদের মনে হলো জিভ যেন বড়সড় শুকনো সন্দেশ। গলা শুকিয়ে কাঠ। আঙুলগুলো থেকে রক্ত বেরুতে শুরু করেছে। অমসৃণ পাথরগুলো সরিয়ে চলেছে। টনটন করছে সারাশরীরের পেশি, খিঁচ ধরছে এখানে-ওখানে। তার পরেও যন্ত্রের মত কাজ করে চলেছে ওরা। তবে মনে মনে জানে, আর বেশিক্ষণ পারবে না, দ্রুত কমে আসছে শরীরের শক্তি।

ধুলো-পাথরের ভিতর একটু একটু করে সামনে বাড়ছে। পাথর সরানোর সময় সাবধানে পরখ করছে ছাত। যে-কোনও সময়ে ওটা মাথার উপর নেমে আসতে পারে। প্রতিবার পা রাখবার আগে সামনের দিকটা দেখে নিচ্ছে। একটা একটা করে পাথর তুলে বাড়িয়ে ধরছে রানা, সেটা নিয়ে নীচে ফেলছে সোহেল।

প্রতি আধঘণ্টা পর পর পাঁচ মিনিট করে বিশ্রাম নিল ওরা।

অনেকক্ষণ পর পাথুরে স্তূপের উপর বন্ধ হলো কাজ। সামনে প্রকাণ্ড এক পাথর। নড়াতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা। আরও কয়েকবার চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দিল।

বন্ধুর দিকে চাইল সোহেল। 'পারা যায় না?'

'খোঁড়লের ভেতর ডিমের মত বসে আছে, নড়ে না। নীচ থেকে সরে যা তুই। আবার চেষ্টা করে দেখি।' ওটার আশপাশ থেকে মুঠোসমান পাথর সরাতে শুরু করেছে রানা। পাঁচ মিনিট পর মনে হলো এবার নড়বে প্রকাণ্ড পাথর। ঢিবির উপর দু'পা দৃঢ় করল রানা, প্রাণপণে ধাক্কা দিল বোল্ডারকে। মোটেই নড়ল না রক পাখির ডিম।

ওটার উপরের ছাত ফাটলে ভরা। অসংখ্য চিড়। এমনই ছিল পিছনেও। ওই ছাত গ্রেনেড দিয়ে ধসিয়ে দেয় রেসপন্সিভিস্ট গার্ডরা। এসব ছাতকে ঝুলন্ত আঙুরের থোকা বলে খনি-মজুররা। বিনা নোটিসে ওখানে যে-কোনও সময় শুরু হতে পারে পাথর বৃষ্টি। ক্লস্ট্রোফোবিয়া নেই রানার, তবে এ মুহূর্তে মনে হলো শীতল কোনও হাত খামচি দিয়ে ধরেছে ওর কলজেটা।

'থামলি কেন?' জানতে চাইল সোহেল। 'আমি আসব?'

শুকনো জিভ মুখের ভিতর ঘোরাতে শুরু করল রানা। জিভের আড়ষ্টতা কেটে যেতেই বলল, 'এ পাথর নড়বে না।'

'আমি পাশে এসে চেষ্টা করি। দু'জন মিলে...'

'আয়।'

রানার পাশে উঠে এল সোহেল। ছোট্ট খুপরির মত জায়গা। পিছনে দেয়ালের মত পাথরের বাধা। দেয়ালে পিঠ দিল দু'জন। ডিম আকৃতির পাথরের বুকে পা রেখেছে। প্রাণপণে ধাক্কা শুরু করল। জিমনেশিয়ামে পা দিয়ে এক হাজার পাউণ্ড সরাতে পারে ওরা। সে তুলনায় এ বোল্ডার বড়জোর অর্ধেক ওজনের। কিন্তু

কোলের মত এক জায়গায় বসেছে। পায়ের চাপ আরও বাড়াল ওরা। বেশ কিছুক্ষণ থেকেই ডিহাইড্রেশনে ভুগছে ওরা। টের পেল পায়ের পেশিগুলো থরথর করে কাঁপছে। তারপর হঠাৎ একটু নড়ে উঠল পাথর। পরক্ষণেই সকেট থেকে বেরিয়ে গুড়গুড় আওয়াজ তুলে নীচে গিয়ে পড়ল। ওটা ছিল মাড়ির ভিতর বসে থাকা পচা দাঁতের মত।

ধপ করে বসে পড়ল দুই বন্ধু। হাঁপিয়ে গেছে। তবে হঠাৎ চিড় ধরা ছাতের দিকে চেয়ে শুকিয়ে গেল রানার মুখ। বন্ধুর হাত ধরে তাড়া দিল, 'জলদি ওঠ।'

পাথর সরে যেতে দেখা দিয়েছে এক ছোট ফোকর। তার ভিতর ক্রল করে ঢুকল সোহেল, তারপর রানা। বুঝতে পেরেছে সামনে এগোনো যাবে। পাথরের স্তূপের উঁচু অংশ পেরুল দু'জন। নামতে লাগল ওপাশ বেয়ে। পাথরের ভিতর দিয়ে ক্রল করছে। ঢিবির শেষ অংশ হামাগুড়ি দিয়ে পেরুল, তারপর উঠে দাঁড়াতে পারল। পিছনে আলো ফেলল রানা। ঢিবির উপর যে গর্তের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, ওটা খুবই ছোট।

সুড়ঙ্গের মেঝেতে বসে পড়ল দুই বন্ধু। বিশ্রাম নিতে হবে। নিভিয়ে দিল আলো। ব্যাটারির শক্তি বাঁচানো দরকার। চারপাশে নামল ঘুটঘুটে অন্ধকার।

কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল রানা, 'গন্ধটা পেলি?'

'তুই যদি বরফ-ঠাণ্ডা বিয়ারের কথা বলে থাকিস, সেই একই দিবাস্বপ্ন দেখছি আমিও। লাগার বিয়ার।'

'নোনা পানি,' বলে উঠে দাঁড়াল রানা। আবার জ্বেলে নিল ফ্ল্যাশলাইট।

সুড়ঙ্গ ধরে এগুতে শুরু করল দুই বন্ধু। এক শ' গজ যাওয়ার পর সুড়ঙ্গ মিশে গেল প্রকাণ্ড এক সামুদ্রিক গুহার সঙ্গে। ওটার

ছাত কমপক্ষে পঞ্চাশ ফুট উপরে। ব্যাস দুশো ফুটের বেশি। এক পাশে পাতাল লেগুন। সেখানে কংক্রিট দিয়ে পিয়ার তৈরি করেছিল নিপন আর্মি। গুহার ভিতর দিয়ে গেছে ন্যারো গেজ রেললাইন। এক পাশে মোবাইল ক্রেন। একসময়ে ওটা দিয়ে মালামাল আনলোড করা হতো।

'জাপানিরা এটার ভিতর জাহাজ ঢুকিয়েছে?' প্রায় অবিশ্বাস নিয়ে বলল সোহেল।

'মনে হয় না,' বলল রানা। 'খেয়াল করে দেখেছি, ফেরি যখন ঘাটে ভিড়ল, ঠিক সেসময়ে জোয়ার পূর্ণ ছিল। তার মানে সাত ঘণ্টা আগে। অর্থাৎ এখন মরা ভাটা চলছে।' হাতের আলো দেখিয়ে চলেছে পিয়ার। ওটার একপাশ থেকে আরেকপাশ পর্যন্ত দেখল রানা। কংক্রিটের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে সামুদ্রিক শেওলা। তার মানে ভরা জোয়ারের সময় ভেসে যায় ডক। 'জাহাজ না, ওরা মালামাল আনত সাবমেরিন দিয়ে।'

বাতি নিভিয়ে দিল রানা, দু'জন চেয়ে রইল আঁধার পানির দিকে। দেখতে চাইছে এই গুহার ভিতর সূর্যালোক আসে কি না। নেই। না, আছে মনে হয়! পিয়ারের এক অংশে খুব আবছা একটু আলোর আভা। ওখানে পানি কুচকুচে কালো নয়, বরং কিছুটা যেন নীলচে।

'তোর কী মনে হয়?' টর্চ জ্বালল রানা।

'ডুবতে চলেছে সূর্য। আলো মিলিয়ে গেলে গাঢ় অন্ধকার নামবে গুহার ভিতর। আমার আন্দাজ, ওই পাতাল সুড়ঙ্গ কমপক্ষে সিকি মাইল লম্বা। তার বেশিও হতে পারে।' সোহেল বলল না পানির নীচ দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অত দম নেই কারও।

'ঠিক আছে, আয় চারপাশটা ঘুরে দেখি। এমন কিছু থাকতে

পারে, যেটা আমাদের কাজে লাগবে।'

প্রধান এই গুহার ভিতর একপাশে একটা ছোট ঘর। ভিতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল ওরা। ছাত থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় নেমে আসছে পানি। ফলে পাথুরে মেঝেতে ছোট একটা পাত্রের মত গর্ত তৈরি হয়েছে। পানি উপচে পড়ছে ওটা থেকে। নিশ্চয়ই মিঠে পানি। বাড়তি পানি সরু একটা ধারায় মিশেছে গিয়ে সাগরে।

'এটা ঠাণ্ডা বিয়ার না হলে কী হবে,' বেসিন থেকে দু'হাতে পানি তুলে কুলকুচি করল সোহেল, 'সত্যিই দারুণ কিছু পেয়েছি।'

ঘরের চারপাশে আলো ফেলছে রানা। একদিকে দেখতে পেল অদ্ভুত কিছু পোড়ামাটির ট্যাবলেট। আর্টিফ্যাক্টগুলোর কারণে তৃষ্ণার কথা ভুলে গেল রানা। প্রতিটি ট্যাবলেট চার ফুট উঁচু, চওড়ায় দুই ফুট, এক ইঞ্চি পুরু। রোদে শুকিয়ে তৈরি। বুঝতে পারছে রানা, এসব ট্যাবলেটের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু হবে। কাঠি দিয়ে আঁচড় কেটে লেখা হয়েছে, তারপর কাদা শুকিয়ে নিয়ে পোড়ানো হয়েছে। ওর মনে কোনও সন্দেহ রইল না এগুলো সত্যিকারের অ্যান্টিক। রূঢ় আবহাওয়ার কবলে পড়েনি। সব রাখা হয়েছে যেন তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত জাদুঘরে।

তারপর চোখে পড়ল তারগুলো। সরু তার, চলে গেছে এক ট্যাবলেট থেকে অন্যগুলোয়। এসব ট্যাবলেটের মাঝখানের সরু অংশে আলো ফেলল রানা। ট্যাবলেট থেকে পিছনের দেয়ালে চলে গেছে তার। প্রাচীন টেক্সট্-এর পিছনে এক টুকরো করে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। সংখ্যায় চারটে। কেবল অনুসরণ করল রানা, ওটা গেছে প্রধান সুড়ঙ্গে। রেসপন্সিভিস্টরা যখন ছাত ধসিয়ে দেয়, তখনই মৃৎ-চিত্রগুলোকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। যে

কারণেই হোক, কাটা পড়ে তার। গুহা পর্যন্ত পৌঁছায়নি সিগনাল। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের টুকরো দিয়ে সহজেই রেসপন্সিভিস্টরা গুঁড়ো করে দিতে পারত ট্যাবলেট।

'কী পেলি?' জানতে চাইল সোহেল। মুখ-হাত ধুয়ে পানি খেয়েছে। গ্রেনেড বিস্ফোরণের সময় ঘাড় কেটেছে, এখন ওখানে পানি দিয়ে মুছে ফেলল।

'কিউনিফর্ম ট্যাবলেট,' বলল রানা। 'সঙ্গে যথেষ্ট সেমটেক্স। এগুলো গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল ওরা।'

মনোযোগ দিয়ে বিস্ফোরক দেখল সোহেল। কাঁধ ঝাঁকাল। জানে, এ জিনিস ছোঁয়া উচিত নয়। তবে যখন ফাটবার কথা ছিল, তখন ফাটেনি। এখন বিস্ফোরিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

'কী বললি? এগুলো কিউনিফ্লাওয়ার?'

'কিউনিফর্ম। সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো লিখিত ভাষা। সুমেরিয়ানরা ব্যবহার করত। পাঁচ হাজার বছর আগে।'

'তো এসব এখানে কী করছে?'

'জানি না।' সেল ফোন বের করল রানা, ট্যাবলেটের ছবি তুলতে লাগল। 'এটা জানি পরের দিকে কিউনিফর্ম স্ক্রিপ্টগুলো ভীষণ জটিল হয়ে যায়। একের পর এক ত্রিকোণ আর দাঁড়ি। তবে এগুলো দেখে পিকটোগ্রাফ মনে হচ্ছে।'

'পিকপকেট? তার মানে কী রে, বদমাইশ?' ভীষণ গম্ভীর হয়ে উঠল সোহেল। 'তুই যা খুশি গালি দিবি, আর তাই শুনতে হবে আমার?'

যেন শোনেইনি রানা। 'মানে হচ্ছে, এই ভাষা তখন মাত্র তৈরি হয়েছে।' ক্যামেরা দিয়ে যেসব ছবি তুলেছে, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখছে। আরও কয়েকটা ছবি নিল। এবার স্পষ্ট

হয়েছে। 'এগুলো সাড়ে পাঁচ হাজার বছর বয়সী। তার চেয়েও বেশি পুরনো হতে পারে। দারুণ অবস্থায় আছে। কিউনিফর্মের যে স্ক্রিপ্ট পাওয়া যায় সেগুলো হাজারো টুকরো অবস্থায় থাকে। বহু বছর খেটে একটা স্ট্যাম্প রিক্রিয়েট করা যায়।'

'এসব তো ভাল কথা, যার খুশি সময় নষ্ট করুক, চিঠি লিখুক, স্ট্যাম্প সেঁটে পোস্ট করে দিক। তুই এবার অন্য দিকে মনোযোগ দে দেখি।'

'কোনদিকে? বলে দে।'

'আমরা যে পরিস্থিতির ভেতর পড়েছি, সেদিকে তোর খেয়াল আছে? এবার গলা ভিজিয়ে নে। তারপর চল্, চারপাশ ঘুরে দেখি।'

বেসিনের পানির কাছে চলে গেল রানা। হাজার ডলারের দামি ওয়াইনও পান করেছে, তবে নির্দ্বিধায় বলবে, পাহাড়ি ঝর্নার এই পানি পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি পানীয়। দু'হাতে পানি তুলে গিলতে শুরু করেছে। সপ্তমবারে তৃষ্ণা মিটল। মনে হলো পেশিগুলোর ভিতর ফিরতে শুরু করেছে প্রাণশক্তি। চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে ক্লান্তির কুয়াশা।

'আমার মনে হয় রেপন্সিভিস্টদের প্রেমকুটিরে হাজির হয়েছি,' বলল সোহেল। একহাত তুলে দেখাল এক বাক্স কণ্ডোম। তার ভিতর দুটো গায়েব। ঘরের একপাশে ট্র্যাশব্যাগ, তার ভিতর ছয়টা খালি ওয়াইনের বোতল।

মাথা নাড়ল রানা। 'ছিহ্, কনডোম পেলি? আমি ভেবেছি তুই দুটো স্কুবা ট্যাঙ্ক আর ডাইভ মাস্ক পাবি।'

'কপাল অতটা ভাল না, রে। সাঁতরে বেরুতে হবে। মনে মনে আশা করতে হবে পানির নীচে যেন মারা না পড়ি।'

'চল, মূল গুহায় যাই। কাছে বিস্ফোরক থাকলে মাথা

খেলতে চায় না।'

'শালা চাপাবাজ। আমি জানি, বোমা দেখলেই নানান দুষ্ট-বুদ্ধি খেলে তোর মাথায়।'

'আমি আর আগের সেই মানুষ নেই রে।'

চলে এল দু'বন্ধু প্রধান গুহার ভিতর।

ভাবতে শুরু করেছে রানা, ট্র্যাশব্যাগ ফুলিয়ে নিলে কেমন হয়? নিজেদের সঙ্গে ওটা টেনে নেবে। সুড়ঙ্গের অর্ধেক পথ যাওয়ার পর ব্যাগের ভিতর নাক ঢুকিয়ে বাতাস নেবে। তবে ভেসে উঠতে চাইবে ওটা, ছাতের সঙ্গে ঘষা লাগবে। সোজা কথা, পাঁচফুট যাওয়ার আগেই ছিঁড়বে প্লাস্টিকের ব্যাগ। উল্টো ওজনের চাপ তৈরি করলে? ব্যাগ টেনে নেয়া প্রায় অসম্ভব। অনেক সময় লাগবে, ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর কোনও পথ খুঁজতে হবে।

রানার হাতে একটা প্রোটিন-বার ধরিয়ে দিল সোহেল।

পরবর্তী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চিবিয়ে চলল ওরা। যে যার মত ভেবে চলেছে। সমাধান করতে চাইছে সামনের সমস্যা। আবারও আলো নিভিয়ে দিয়েছে রানা। গুহার একপাশ হতে অস্পষ্ট আলো আসছে। মুক্তির আলো জ্বলছে মনে, আবার খানিক পর হয়ে পড়ছে হতাশ। খুবই কাছে মুক্তি ওদের। কিন্তু মাঝখানে যেন জেলখানার প্রাচীর। পেরুবে কী করে? তারপর হঠাৎ রানার মনে জেগে উঠল সম্ভাবনার ঢেউ। এ কাজ তো খুব সহজ! আগে কেন মনে পড়েনি? নিজের উপর বিরক্ত হলো রানা।

'সোডিয়াম ক্লোরেটের জার্মান শব্দ কী, বল তো,' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওটা এক রকম বিষাক্ত লবণ, পোকামাকড় মারতে কাজে লাগে।'

'ন্যাট্রিয়াম ক্লোর। শেষ ল্যাবোরেটরির ভিতর একটা জারের ভিতর দেখেছি।'

'আমিও। তোর সঙ্গে দ্বিতীয় ডেটোনেটর পেন্সিলটা আছে না?'

'আছে।'

'আমরা একটা অক্সিজেন মোমবাতি জ্বালব। আমি চলে যাওয়ার পর রেললাইনের লোহা চেঁছে জমিয়ে রাখবি। দুটো জিনিস যখন মিশে জ্বলে উঠবে, তৈরি হবে আয়রন অক্সাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড আর নিখাদ অক্সিজেন। পানির নীচে সুড়ঙ্গ ধরে অর্ধেক পথ গেলে ওখানে কোনও জায়গা খুঁজে নেব। ওখানে জ্বেলে দেব মোমবাতি। সাগরের পানিকে সরিয়ে দিয়ে জায়গা নেবে অক্সিজেন। সেখানে পাব আমরা বড়সড় একটা বুদ্বুদ। ওটার ভিতর শ্বাস নেব।'

'আমি ছিলাম সায়েন্সে, আর বাজি মারলি তুই?' রানার কাঁধ চাপড়ে দিল সোহেল। 'দারুণ আইডিয়া, দোস্ত্!'

'এ জিনিস শিখেছি উর্বশীর কাছ থেকে। আটকা পড়েছিলাম জাপানি এক দ্বীপে। প্রাণ যায়-যায় অবস্থা, তারই মধ্যে আমাকে জোর করে ধরে বুঝিয়েছে কী করে চলে অক্সিজেন জেনারেটার।'

ফ্ল্যাশলাইট ওর লাগবে, কাজেই সোহেলকে রেললাইনের পাশে রেখে রওনা হয়ে গেল রানা। ছুরি দিয়ে লোহা চেঁছে তুলবে এখন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মহা প্রতাপশালী চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার ব্রিগেডিয়ার (অব.) শ্রীমান সোহেল আহমেদ।

হাসিমুখে ধসে পড়া ছাতের নীচ দিয়ে ফোকর গলে বেরুল রানা। পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল ডিসপেনসারি থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে সামুদ্রিক গুহায় ফিরতে। ততক্ষণে পুরনো রেল

চেঁছে যথেষ্ট লোহার কণা জমিয়েছে সোহেল।

ওদের ফ্ল্যাশলাইট এখন প্রায় নিভু-নিভু। সেই আলোয় কাজ শুরু করল। কেমিকালগুলো ওয়াইনের খালি বোতলের ভিতর ভরল রানা, ভাল ভাবে জড়িয়ে দিল অবশিষ্ট ইলেকট্রিক টেপ। এ সময়ে ডেটোনেটর খুলল সোহেল, কমিয়ে আনল বিস্ফোরকের চার্জ। ওদের কাজ শেষে বোতলের মুখে ডেটোনেটর বসাল রানা। এবার নিজেদের তৈরি অক্সিজেন জেনারেটার রাখল প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতর।

ডকের কাছে বুট ও প্যান্ট খুলে ফেলল রানা, তারপর শার্ট। আস্তে করে নেমে পড়ল লেগুনে, বলল, 'পাঁচ মিনিটের ভিতর ফিরব।' পানিটা গোসলের উপযোগী, মৃদু উষ্ণ। শরীর থেকে ধুলো ধুয়ে নামিয়ে নিল সাগর। সহজ ভঙ্গিতে ব্যাকস্ট্রোক শুরু করল রানা। এক হাতে ব্যাগ ও ফ্ল্যাশলাইট, অপর হাতে সাঁতার কাটছে। পাতাল সুড়ঙ্গের দিকে চলেছে। ওদিকটায় রয়েছে মৃদু আলোর আভাস।

ব্যাগটাকে ভাসতে দিয়ে ডুব দিল রানা, খাড়া নেমে চলেছে। ওয়াটারপ্রুফ টর্চ চারপাশের পানিকে হালকা সবজেটে করে দিয়েছে। নোনা পানির কারণে জ্বলে উঠল চোখ, কিন্তু সেটাকে পাত্তা দিল না ও। প্রথমে চোখে পড়ল এবড়োখেবড়ো রুক্ষ পাথর। সেগুলোর সঙ্গে লেগে রয়েছে বাদামি শেওলা ও শামুক। তবে পনেরো ফুট গভীরতায় পৌঁছে মিলল বড়সড় এক গুহা, বিকট হাঁ করে অপেক্ষা করছে। ওটার ভিতর দিয়ে চলাচল করত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি সাবমেরিনগুলো। অনেক দূরে সূর্যালোক। ওদিক দিয়ে বেরুতে হবে ওদের।

আবার ভেসে উঠল রানা, খপ করে ধরে নিল ব্যাগ। জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে চলেছে। কার্বন ডাইঅক্সাইড দূর করতে চাইল

সিস্টেম থেকে। বারকয়েক দম নেয়ায় হালকা হয়ে উঠেছে চিন্তা, এবার ঘুরতে শুরু করবে মাথা। আর দেরি না করে ডুব দিল রানা। ফ্ল্যাশলাইটের সবজেটে আলো নেমে চলেছে। তারপর ঢুকে পড়ল পাতাল সুড়ঙ্গের ভিতর। মনে মনে প্রতি সেকেণ্ড গুনে চলেছে। এক মিনিট পেরুতে সময়টা গেঁথে নিল মগজে। খেয়াল করেছে সূর্যালোক এখন ঢের উজ্জ্বল। সাঁতরে চলেছে রানা, মন থেকে দূর করে দিয়েছে সমস্ত চিন্তা। সুড়ঙ্গের অনেক গভীরে ঢুকে পড়েছে। তারপর পেরুল দেড় মিনিট। ছাতের দিকে আলো ফেলল রানা। দশ ফুট সামনে সুড়ঙ্গের ছাত যেন ছাতির মত। প্রাকৃতিক ভাবে উপরের দিকে গেছে। জায়গাটা ব্যাসে পাঁচ ফুট হবে, গভীরতা এক ফুট আন্দাজ।

প্লাস্টিক ব্যাগের ভিতর সামান্য যেটুকু বাতাস, তার কারণে ছাতের সঙ্গে প্রায় লেগে এগিয়ে চলেছে ব্যাগ। প্লাস্টিক হাতড়ে টাইমিং পেন্সিল বের করল রানা, অ্যাকটিভেট করল ডেটোনেটর। ঘুরে রওনা হয়ে গেল ফিরতি পথে। আসবার সময় যে গতিতে এসেছে, ঠিক সেই একই গতি তুলে ফিরছে। তিলতিল করে তিন মিনিট পেরুল, তারপর সুড়ঙ্গের মুখ থেকে বেরিয়ে এল ও। উপরের দিকে উঠতে শুরু করল। তার দশ সেকেণ্ড পর ডলফিনের মত সমতলে ভেসে উঠল। পানি ছেড়ে উপরে উঠে গেছে বুক ও মাথা। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস নিয়ে চলেছে।

'ঠিক আছিস তো?' অন্ধকার থেকে জানতে চাইল সোহেল।

'হ্যাঁ।'

'পানিতে নামব?'

'নামতে পারিস।'

পরক্ষণে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়বার আওয়াজ পেল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওর পাশে পৌঁছে গেল সোহেল। ওর কাঁধের দড়িতে ঝুলছে দু'জনের বুট। কোমরের সঙ্গে পেঁচিয়ে নিয়েছে পোশাক। 'তোর সেল ফোন কণ্ডোমের ভিতর ঢুকিয়ে মুখ বেঁধে দিয়েছি,' বলল সোহেল। 'প্যান্টের পকেটে পাবি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'ধর্ তোর এই ফ্র্যাংকেনস্টাইন এক্সপেরিমেন্ট ফেলই মারল, অক্সিজেনের বুদ্বুদ পেলাম না—তখন কী? আমরা এগুতে থাকব?'

দুনিয়ার সেরা সাঁতারু মাইকেল ফেল্‌প্‌স্‌ও পেরুতে পারবে না পুরো পথ। অক্সিজেন না পেলে মরতেই হবে। প্রিয় বন্ধুকে মিথ্যে আশ্বাস দিল না রানা, স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'সেক্ষেত্রে মরব আমরা। হ্যাঁ, এগুতে থাকব দু'জন মিলে।'

'বহুবার একসঙ্গে লড়েছি আমরা, দোস্ত,' মৃদু স্বরে বলল সোহেল। 'হয়তো একই সঙ্গে মরব। কী বলিস?'

'হতে পারে। এখন মন থেকে মৃত্যুর চিন্তা দূর করে দে। দেখিস, মরব না আমরা কোনদিন।'

খুদে ডেটোনেটর অনেক দূরে, পানির ভিতর কোনও কম্পন পাবে না ওরা। দশ মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর বলল, 'তুই তৈরি, সোহেল?'

'হ্যাঁ। চল্।'

এতক্ষণ স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিয়েছে ওরা। শেষ ক'বার প্রাণপণে শ্বাস নিল। অতিরিক্ত অক্সিজেনের কারণে ঘুরতে শুরু করেছে মাথা। একইসঙ্গে ডুব দিল দুজনে, চলেছে পাতাল-সুড়ঙ্গ লক্ষ্য করে।

খচ-খচ করছে রানার মন। জোয়ার বোধহয় আবার শুরু হলো। সুড়ঙ্গের চওড়া মুখ দেখতে বিশ্রী লাগল। পাথরের প্যাসেজ যেন গিলে নিতে চাইছে ওদের। প্রায় নিভতে চলেছে

ফ্ল্যাশলাইট। সে আলোয় বেশি দূর দেখা যায় না। বাতি নিভিয়ে দিল রানা। দূরের অস্পষ্ট আলোর দিকে সাঁতরে চলেছে দু'জন।

দেড় মিনিট পেরুলে ফ্ল্যাশলাইট আবার জ্বেলে নিল রানা। অক্সিজেনের পকেট খুঁজতে শুরু করেছে। সুড়ঙ্গের কালো ছাত বৈশিষ্ট্যহীন। বুদ্বুদ থাকলে ওটার নীচের অংশ জ্বলজ্বল করবে। মনে হবে পারদ বা রূপা ঝিকঝিক করছে। কিন্তু আলো কিছুই দেখাচ্ছে না। শুধু কালো পাথরের দেয়াল। এগুনোর গতি কমিয়ে নিয়েছে রানা, ভাবছে কোথায় গেল ওর অক্সিজেন বুদ্বুদ। আর বড়জোর দু'চার সেকেণ্ড পাবে। তার ভিতর ঠিক করতে হবে দুঃসাহস নিয়ে সামনে বাড়বে, না বোকার মত খুঁজতে চাইবে সেই ছাতি। যদি না পায় সেই বুদ্বুদ? সেক্ষেত্রে মরতে হবে ওদের।

ছাতের এদিকে ওদিকে আলো ফেলছে রানা। হঠাৎ টের পেল, অনেক ডানে সরে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বামে রওনা হলো। ওর সঙ্গে রয়েছে সোহেল। কিন্তু কোনও বুদ্বুদ চোখে পড়ল না।

তিক্ত অনুভূতি হলো রানার, ঠোঁট টিপে হাসল। তার মানে সময় শেষ? এবার মরবে ওরা? ওর অক্সিজেনের জেনারেটার কাজ করেনি। সোহেলকে সঙ্গে নিয়ে এসে মরণের হাতে তুলে দিয়েছে ও? একবার বামহাতে বন্ধুর কাঁধ ধরল রানা, নিঃশব্দে বলল, 'আমি দুঃখিত, দোস্ত। পারলাম না।'

ঠিক তখন পাল্টা খপ্ করে রানার হাত ধরল সোহেল। পরক্ষণে উপরের দিকে হাত তাক করে কী যেন দেখাতে চাইল। ওটা আরও খানিক বামে। ওদিকে আলো ফেলল রানা। মনে হলো ওখানে ঝিকমিকে আয়না। ওটার দিকে রওনা হয়ে গেল দুই বন্ধু। বুদ্বুদ ছেড়ে চলেছে। আর চাপ নেবে না ফুসফুস। খুব সাবধানে ভেসে উঠল ওরা ছাতির ভিতর।

ওদের খেয়াল রইল না কেমিকাল রিয়্যাকশনের ফলে বাতাস গরম। বদ্ধ জায়গায় কটু গন্ধ। যা পেয়েছে তাতেই খুশি হয়ে উঠেছে ওরা। বন্ধুর দিকে চেয়ে হেসে ফেলল রানা।

'বেঁচেছি রে, শালা!' হেসে উঠল সোহেলও।

তিন মিনিট চলবার মত অক্সিজেন আছে কুঠুরির ভিতর। লোভীর মত শ্বাস নিল ওরা। আড়াই মিনিট পর ঠিক হলো আবার রওনা হবে ওরা। সামনে পড়ে রয়েছে অর্ধেক পথ।

'গুহা-মুখ দিয়ে যে আগে বেরুবে, সে বিয়ার কিনবে,' বলল সোহেল।

'ঠিক আছে,' রাজি হয়ে গেল রানা।

বারকয়েক দম নিল ওরা, তারপর রওনা হয়ে গেল।

পাশে সাঁতরে চলেছে সোহেল। ওর পায়ের পাতা একটু বড়। একহাত না থাকলেও ডেস্ট্রয়ারের মত এগুতে পারে। তবে মনে হলো আলোকচ্ছটা আগের মতই অনেক দূরে। এখন ভাটা চলবার কথা, ওটা ওদের বাইরে টেনে নেবে। অথচ ওদের গতি খুবই কম।

সোহেলের মনে পড়ল বিশ বছর বয়সে চার মিনিট ডুব দিয়ে থাকতে পারত। কিন্তু সে তো প্রায় আট বছর আগের কথা। এতগুলো বছর সিগারেট টেনেছে, মদ্যপান করেছে। এখন ও ডুব দিয়ে পানির নীচে থাকতে পারবে বড় জোর আড়াই থেকে তিন মিনিট। এর বেশি পারবে না। কে জানে রানার অবস্থা কী!

আড়াই মিনিট পেরিয়ে গেছে। স্বচ্ছ নীল পানির ভিতর সাঁতরে চলেছে ওরা পাশাপাশি। গুহা-মুখের আলো অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। তবে মনে হলো, এখনও অনেক দূরে, কোনদিন পৌঁছুতে পারবে না। হঠাৎ কণ্ঠার গোড়ায় টের পেল সোহেল, ওকে শ্বাস নিতেই হবে। পনেরো সেকেণ্ড পর মনে হলো ফুসফুস

ফাটতে চলেছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল অবশিষ্ট বাতাস। গুহা-মুখ এখনও ষাট ফুট দূরে! বারবার মন চাইল শ্বাস নিতে। দাঁত-মুখ খিঁচে রইল সোহেল। কিছুতেই গিলবে না লোনা পানি।

অদ্ভুত চিন্তা আসতে শুরু করেছে। এখন শেষ অক্সিজেনটুকু খরচ করছে মগজ। সোহেল বুঝতে পারছে, এবার যে-কোনও মুহূর্তে তলিয়ে যাবে। আর চলতে চাইছে না হাত-পা। কেমন যেন অলস ভঙ্গিতে নড়ছে। মনে থাকতে চাইছে না সাঁতার কাটছে। আগেও ডুবতে গিয়ে বেঁচে গেছে সোহেল। কাজেই অনুভূতিগুলো বুঝতে পারছে। তবে এখন কিছুই করবার নেই। বিস্তৃত নীল সাগর যেন ডাকছে ওকে। কিন্তু আর কখনও ওখানে পৌঁছুনো হবে না।

থমকে গেল সোহেল। ঢকঢক করে কয়েক ঢোক পানি গিলে ফেলল। জ্বলে উঠল ফুসফুস। পেটে সামান্য গেলেও বেশিরভাগটা ফুসফুসে গিয়ে ঢুকেছে লবণাক্ত পানি। বমি আসতে চাইল, কিন্তু হলো না। এবার ডুবে মরবে, বুঝল সোহেল। 'বিদায়, দোস্ত্। কখনও ইচ্ছে করে তোর মনে দুঃখ দিইনি, যদি কোনও ভুল করে থাকি, মাফ করে দিস। তোর মতন বন্ধু পেয়েছিলাম, এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া! আমি... তোকে... সত্যি বলছি...'

ঠিক তখনই কে যেন খপ্ করে কোমর জড়িয়ে ধরল ওর, টেনে নিয়ে চলেছে সামনে।

রানা টের পেয়েছে, সোহেলের দম শেষ। কাজেই ডান হাতে জড়িয়ে ধরেছে প্রিয় বন্ধুর কোমর। ওর নিজের দমও প্রায় শেষ। তবে দু'পা ছুঁড়তে শুরু করেছে পিস্টনের মত। অন্য হাতে পানি কেটে চলেছে যন্ত্রের মত।

আগে কখনও এত অসহায় বোধ করেনি সোহেল। আবছা

ভাবে টের পেল, ওর বন্ধু ওকে বাঁচাতে চাইছে। এর ফলে হয়তো মরবে ও-ও! অথচ ওকে ছেড়ে দিলে...

রানা যেন মানতে রাজি নয় ওরা মরতে পারে।

হঠাৎ যেন ডালের পানির মত পাতলা হয়ে গেল সাগরের জল। গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা। একার শক্তিতে সারফেসে উঠে এল রানা। হড়হড় করে বমি করল সোহেল। তারই ফাঁকে দম নিতে শুরু করেছে। গুহা-মুখের পাথর ধরে ভেসে রইল দুই বন্ধু। চারপাশে কলকল করে বইছে সাগরের স্রোত। মনে হলো জীবনটা বড় মধুর!

কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল, কোনও কথা বলতে পারল না ওরা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বলবার মত কথা থাকেও না।

'সিগারেট ক'টা খাস?' কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল সোহেল। 'আমার লাগে পঁচিশটা।'

'আমার দশ।'

'আয় ছেড়ে দিই।'

'চেষ্টা করা উচিত। তবে আগে জরুরি কথায় আসি, বিয়ার খাওয়াবি তুই। তোকে আগে গুহা থেকে ঠেলে বের করেছি, পরে বেরিয়েছি আমি।'

'ঠকিয়েছিস, শালা!'

'আর তুমি শালা যে আমাদের সবাইকে চিট করে মরতে বসেছিলে?'

বিশাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল। 'দেখ্ দোস্ত, তুই জানিস আমি হয়তো বিয়ে-টিয়ে করতে পারি, সেজন্যে মেলা পয়সা লাগবে, তোরা বন্ধু হয়ে যদি এভাবে বাড়তি খরচ করিয়ে দিস...'

'অ্যাইও, চোপ্!' সোহেলকে ভয়ঙ্কর এক ধমক দিল রানা,

'ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড!'

পরবর্তী দু'ঘণ্টা টিলা বেয়ে এগুলো ওরা। আরও আড়াই ঘণ্টা লাগল জাপানিজ ইনস্টলেশন ঘুরে লুকিয়ে রাখা জিপের কাছে পৌঁছতে। ততক্ষণে সেল ফোনের ছবিগুলো বারকয়েক দেখেছে রানা। ওর মন বলছে, এগুলো কোনও ধরনের জরুরি প্রমাণ। রেসপন্সিভিস্টদের এই গোলমেলে কেস সমাধান করতে হলে এগুলোর খুবই প্রয়োজন।

ছয়

মার্ভেলের জিমনেশিয়ামে ফু-চুংকে পেল আতাসি। চিনাম্যানের পরনে মার্শাল আর্টের ব্যাগি প্যান্ট, তবে শার্ট নেই। দোহারা শরীর থেকে দরদর করে নামছে ঘাম। কারাটে স্টান্স নিয়েছে, প্রতিটি পাঞ্চ ও চপ মাপা। অপেক্ষা করছে আতাসি, খেয়াল করেছে ফু-চুং। শেষ রাউণ্ডহাউস লাথি দিয়ে দুলিয়ে দিল স্যাণ্ড ব্যাগকে।

ইউনিভার্সাল ওয়েইট মেশিনের পাশে বিন, ওটা থেকে সাদা তোয়ালে নিল ফু-চুং, বুক-পেট-ঘাড় মুছল।

'মস্ত ভুল করেছি,' কোনও ভূমিকা ছাড়াই বলল আতাসি। 'মোফিজ বিল্লাহ্ পার্লা মোনার ইণ্টারভিউ নেয়ার পর, আবারও ওই টেপ শুনেছি। কম্পিউটার নতুন করে প্রোগ্রামিং করেছি। ক্রিস ক্রিংগল পার্লা মোনার কথা বলেনি। বলেছে পার্ল অভ মুন।

ওটা গোল্ড অভ মার্সের সিস্টার শিপ। মিস্টার অনিল খুঁজে বের করেছেন রেসপন্সিভিস্টদের ওখানে সি রিট্রিট আছে। ওটা নিয়েই কথা বলেছিল ক্রিস ক্রিংগল।'

'ওটা এখন কোথায়?' জানতে চাইল ফু-চুং।

'পুব মেডিটারেনিয়ানে। শীঘ্রি ইস্তাম্বুলে ডক করবে। ধরুন বিকেলে। তারপর যাবে ক্রিটে।' ফু-চুং কিছু বলবার আগেই বলল আতাসি, 'আমি বসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছি। তবে সাড়া দেননি তিনি।'

রানা-সোহেল অন্য অ্যাসাইনমেন্টে ব্যস্ত, ব্রাঙ্কোর হাতে বন্দি উর্বশী, জাহাজের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়েছে ফু-চুঙের উপর।

'ওই জাহাজে কোনও অসুস্থতার কথা জানা গেছে?'

'এখনও না।'

'গুড।'

'স্বর্ণা, কাশেম আর জলিল ওখানে যেতে চাইছে। আপনি চাইলে পাঠাতে পারেন।'

থমথম করছে ফু-চুঙের মুখ। 'কিন্তু ওখানে যদি কেমিকাল বা বায়োলজিকাল আক্রমণ হয়, ওদের উপর রোগের হামলা হবে।'

'হতে পারে তেমন, তবে এই সুযোগ আমাদের ছাড়া উচিত না। নিজেদের লোক তুলে দিতে পারব ওখানে। ওদের কাছ থেকে তথ্য পেলে সেগুলো জরুরি হতে পারে।'

মস্ত ঝুঁকি, বদলে বড় প্রাপ্তি—এ নিয়ে ভাবতে শুরু করল ফু-চুং।

'ওরা রিজিড ইনফ্লেটেবল বোট নিয়ে তীরে নামতে পারে,' বলল আতাসি। 'নিসে অপেক্ষা করছে জেট বিমান। চাইলে ওরা ইমার্জেন্সি ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করতে পারে। বেশি সময় লাগবে

না পার্ল অভ মুনে উঠতে। যতক্ষণ বন্দর থেকে জাহাজ রওনা না হয়, নিশ্চয়ই হামলা করবে না রেসপন্সিভিস্টরা। বন্দর ছাড়ার আগেই জাহাজে উঠবে ওরা। চারপাশ ঘুরে দেখবে।'

'পরিকল্পনা মন্দ নয়,' বলল ফু-চুং। ঘুরে রওনা হয়ে গেছে আতাসি, ওকে পিছন থেকে ডাক দিল। 'তবে বন্দর ছাড়ার সময় ওরা যেন জাহাজে না থাকে। পার্ল অভ মুন রওনা হওয়ার আগেই নেমে পড়তে হবে।'

'ওদের বুঝিয়ে দেব। কোন দু'জনকে পাঠাব?'

'স্বর্ণা আর কাশেমকে। জলিল রয়ে যাক। শুনেছি কাশেম আর স্বর্ণা ওয়েপন্স-এর উপর নতুন ট্রেইনিং নিয়েছে। তার ভিতর ছিল কেমিকাল ও বায়োলজিকাল ওয়েপন্স। ওরা বুঝবে কীভাবে ডিসপার্সাল করতে হয়।'

'ঠিক আছে।'

দ্বিতীয়বারের মত বাধা দিল ফু-চুং। 'আরেক প্রসঙ্গে আসা যাক। আমাদের কান পাতার কাজ কেমন চলছে?'

ইহুদি ব্যবসায়ী ব্যালফোর জেনকিন্সের বিলাসবহুল ইয়ট মাউণ্ট অভ সিনাই সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে মণ্টি কার্লো বন্দর থেকে বেরিয়ে গেছে। ইজরায়েলি আর্মস ডিলারের সঙ্গে রয়েছে সৌদি প্রিন্স ইবনে আল-কাশিম ও তার সুদর্শন দুই কিশোর নোকর। প্রিন্সের ধারণা রূপে তারা বেহেস্তি হুরদেরকেও হারাতে পারে। প্রতিদিন একবার হলেও তাদের সঙ্গে শোয় সে। প্রচুর টাকা ঢালছে প্রিন্স মুসলিম জঙ্গি সংগঠনগুলোর পিছনে। জানা গেছে আল কায়দার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। নিজেই এখন ওই ধরনের আরেকটা সংগঠন তৈরি করতে চাইছে।

এখন পর্যন্ত ওই ইয়টে জরুরি কোনও আলাপ হয়নি। ইজরায়েলি আর্মস ডিলারের সঙ্গে বিভিন্ন ক্যাসিনোতে গিয়ে মদ-

জুয়া-সাকী নিয়ে ফুর্তি করছে প্রিন্স। কিন্তু যখন বন্দর থেকে বেরিয়ে এল ইয়ট, চলে এল উপসাগরে, তখন থেকে সত্যিকারের কাজ শুরু করল মার্ভেলের ক্রুরা। ওরা জানে মূল দরদাম চলবে বন্দর থেকে দূরে, সবার চোখের আড়ালে।

ইয়টের বাতির আলো কমিয়ে দেয়া হয়েছে। লোকগুলো জানে না দিগন্তের ওপাশে অপেক্ষা করছে মার্ভেল। ইজরায়েলি আর্মস ডিলার পুরো বিশ মাইল দূরে সরে মেগা ইয়টের ইঞ্জিন বন্ধ করেছে। তার ধারণা হয়েছে চারপাশের সাগরে কেউ নেই। পিছনের ডেকে জানালার ওপাশে হালকা ডিনারের ফাঁকে প্রিন্সের সঙ্গে দরদাম নিয়ে আলাপ শুরু করেছে ব্যালফোর জেনকিন্স।

গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম ও জাহাজের থ্রাস্টারের সুবিধা নিয়ে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করেছে গগল। ইয়টের সঙ্গে একই তালে সরছে মার্ভেল। ওটার উঁচু মাস্তুলের উপর রাখা সফিস্টিকেটেড ইলেকট্রনিকস্ মনিটর করে চলেছে ইয়টকে। স্টেট অভ আর্ট প্যারাবোলিক রিসিভার হাই-রেযোলিউশন ক্যামেরা জানিয়ে চলেছে আমর্স ডিলার ও প্রিন্সের ঠোঁট কীভাবে নড়ছে। ফোকাস করা লেজার বিম ধরছে কে কী সুরে কথা বলে চলেছে। মার্ভেলের ক্রুরা, বিশেষ করে আতাসি, পরিষ্কার বুঝতে পারছে কী বলা হচ্ছে।

'শেষ শুনেছি ইজরায়েলি আর্মস ডিলারের কাছ থেকে সিএ-সেভেন গ্রেইল মিসাইল সম্পর্কে জানতে চেয়েছে প্রিন্স।'

'গ্রেইল ফালতু,' বলল ফু-চুং। 'ও জিনিস দিয়ে কোনও যুদ্ধ-বিমান ফেলা অসম্ভব। তবে সিভিলিয়ান বিমান ফেলতে পারে।'

'প্রথম থেকে বলে চলেছে ইজরায়েলি আর্মস ডিলার, সে জানতে চায় না এসব অস্ত্র দিয়ে কী করবে প্রিন্স। এদিকে প্রিন্স জানিয়েছে নীচ থেকে বিমান ফেলবার মত অস্ত্র দরকার তার।'

'আর কিছু?' শার্ট পরতে শুরু করেছে ফু-চুং।

'আল-কাশিম নিউক্লিয়ার অস্ত্রও চেয়েছে। তবে জেন্‌কিন্স জানিয়েছে তার হাতে ওই জিনিস নেই। কখনও যদি হাতে পায়, বিক্রি করবে।'

'বাহ্!'

'আরও বলেছে, তার হাতে যদি জিব্রাইলের মুষ্টি আসত, তা হলে সেটাও বিক্রি করে দিত। ওই অস্ত্র নাকি খুব টেকনিকাল। এরপর আবদার শুরু করে প্রিন্স। তখন আর্মস ডিলার বলে ওটার কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। এরপর আবার নতুন করে আলাপ শুরু হয় গ্রেইল নিয়ে।'

'জিব্রাইলের মুষ্টি? ওটা কী?'

'জানি না। মিস্টার অনিলের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। তিনিও জানেন না।'

'হয়তো রানা জানে। হাতে আগে তথ্য আসুক, তারপর ঠিক করব কী করা যায়। ডিয়েটস কেসলার বা রানা যোগাযোগ করলে সঙ্গে সঙ্গে লাইন দেবেন আমাকে।'

'আপনার কি মনে হয়, মিস উর্বশী বেঁচে আছেন?'

'জানি না। তবে ওর কিছু হলে ডিয়েটস কেসলার শেষ। তাকে ছাড়ব না আমরা।'

কালচে-ধূসর আকাশের দিকে চেয়ে রইল ব্রাঙ্কো। দূর থেকে ছুটে আসছে হলদে কপ্টার। ওটা ছাইরঙা মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়েছে। প্রচণ্ড ক্রোধ চেপে রেখেছে ব্রাঙ্কো নিজের ভিতর। এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি ওকে কাঁচকলা দেখিয়ে কীভাবে পালিয়ে গেল ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটি। নিজেকে ভীষণ অপমানিত মনে হচ্ছে তার। কোনও ব্যাপারে কাউকে কৈফিয়ত

দেবার মত লোক নয় যে, অথচ এখন ঠিক সেই কাজেরই রিহার্সাল দিতে হচ্ছে। চারদিকে বৃষ্টির পানি, তার মাঝে হেলি-প্যাড। ওখানে নামতে শুরু করেছে কপ্টার।

পাইলট ছাড়া ডিয়েটস কেসলারের সঙ্গে রয়েছে আরেকজন লোক। ওই লোকের দিকে চাইল না ব্রাঙ্কো, সমস্ত মনোযোগ কেসলারের দিকে। এই মানুষটাকে পীরের মত মানে সে। কেসলার সবদিক থেকে তার চেয়ে অনেক উঁচু পর্যায়ের মানুষ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন লোক। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে সে এই মানুষটিকে। তার সামনে দাঁড়ালে মনে হয় সে অনেক ক্ষুদ্র। এ মুহূর্তে নিজেকে ঘৃণা করছে ব্রাঙ্কো। ডুবিয়ে দিয়েছে সে তার পীরকে।

কপ্টারের দরজা খুলল কেসলার, ঝড়ো হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে তার উইণ্ডব্রেকার। দুলছে কাঁধের দীর্ঘ চুল। কী করে যেন এই তুমুল হাওয়ার ভিতর নিজেকে সামলে রেখেছে কেসলার। প্রতি পদক্ষেপ মাপা। একটু কুঁজো হয়ে কপ্টারের পাখা এড়িয়ে এদিকে চলে এল। মিষ্টি হাসছে। ব্রাঙ্কো পাল্টা হাসতে পারল না। মন জানিয়ে চলেছে, ওই অদ্ভুত সুন্দর হাসি উপহার পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে সে! চোখ সরিয়ে নিল ব্রাঙ্কো, প্রথমবারের মত চাইল দ্বিতীয় প্যাসেঞ্জারের দিকে।

রাগ উধাও হলো তার, বদলে চোখে ফুটে উঠল দ্বিধা।

'তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম, জ্যারোন,' কপ্টারের আওয়াজের উপর দিয়ে বলল কেসলার। বুঝতে পেরেছে বিস্মিত চোখে চেয়ে রয়েছে তার সিকিউরিটি চিফ। কেসলার মৃদু হেসে ফেলল। 'তুমি নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ? ভাবছ, এই লোক কেন আমার সঙ্গে?'

কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা করল ব্রাঙ্কো, চোখ সরাল না ডক্টর

চার্চের উপর থেকে। 'জী, স্যর।'

হাতের ইশারা করে ডক্টরকে দেখাল কেসলার, 'সবই বুঝবে। সময় হয়েছে সব জানবার। ভবিষ্যতে এসব ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকবে।'

লিয়োনার্দো সামনে বাড়ল, একহাতে আলতো করে স্পর্শ করল মাথার ব্যাণ্ডেজ। রোমের হোটেলে ওই জখম তৈরি করেছে ব্রাঙ্কো। 'এ নিয়ে কোনও রাগ বা নালিশ নেই আমার। যা হওয়ার হয়েছে, মিস্টার ব্রাঙ্কো।'

দশ মিনিট পর আণ্ডারগ্রাউণ্ড বেসের ভিতর ঢুকে পড়ল তারা, চলে এল দুনিয়ার সেরা বিলাসবহুল সুইটে। সামনের গোলমেলে সময়ে এই সুইটে থাকবে ডিয়েটস কেসলার ও তার স্ত্রী। এই ফ্যাসিলিটিতে স্থান পাবে রেসপন্সিভিস্ট সংগঠনের সেরা দুশো সদস্য।

এখানে শেষবার যখন আসে কেসলার, তখন ছিল শুধু ন্যাড়া কংক্রিটের চারটে ঘর। চারপাশে চেয়ে অবাক হলো কেসলার। অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে সব। বিশেষ করে এই সুইট। দু'পাশে জানালা, তবে সেগুলো আসলে ফ্ল্যাট-প্যানেল টেলিভিশন। ওগুলোর কারণে বুঝবার উপায় নেই এই সুইট মাটির পঞ্চাশ ফুট নীচে।

'এ তো আমাদের বেভারলি হিলসের বাড়ির মতই সুন্দর,' না বলে পারল না কেসলার। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল দামেস্ক সিল্কের দেয়াল। 'বার্থা খুব পছন্দ করবে এই সুইট।'

অপেক্ষা করছে এক অ্যাটেণ্ডেন্ট, চেহারা চকচক করছে তার সর্বোচ্চ নেতার উপস্থিতিতে। তার কাছে কফি চাইল কেসলার, বসে পড়ল উইংব্যাক চেয়ারে। ফ্ল্যাট-প্যানেল মনিটর দেখিয়ে চলেছে সাগর। পাথুরে উপকূলে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। এই ছবি

আসছে এক ক্যামেরা থেকে। সেটা বসানো হয়েছে বেসের প্রবেশ-পথের কাছেই।

আরামদায়ক এক সোফায় বসে পড়ল ডক্টর চার্চ। একটু দূরে দাঁড়িয়েছে ব্রাঙ্কো, মনোযোগ পুরোপুরি কেসলারের প্রতি।

'বোসো, জ্যারোন।'

একটা চেয়ারে বসল সার্ব, তবে আড়ষ্ট বোধ করছে।

'হয়তো পুরনো একটা কথা শুনেছ, "বন্ধুদের কাছে রাখো, কিন্তু তার চেয়ে অনেক কাছে রাখো শত্রুদের?"' ভ্যালে কফি ঢেলে দিল কেসলারকে। 'আমাদের সত্যিকারের শত্রু তারা নয়, যারা আমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে কিছুই জানে না। সমালোচনা করে, না বুঝেই। কিন্তু তারাই আসলে সবচেয়ে বড় শত্রু, যারা আগে বিশ্বাস করত, পরে চলে গেছে দূরে। এরা আমাদের মস্ত ক্ষতি করতে পারে। আমরা বাইরের লোককে গোপন তথ্য দিইনি, কিন্তু যাদের দিয়েছি, যারা নিজেদের লোক ছিল, তারা আমাদের সর্বনাশ করতে পারে। আমি এ বিষয়ে বহুদিন আলাপ করেছি ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেলের সঙ্গে।'

রেসপন্সিভিজমের প্রণেতার কথা শুনে একটু মাথা দোলাল ব্রাঙ্কো, চট্ করে চাইল ডক্টর চার্চের দিকে। নীরবে যেন বলতে চাইল, যে ঘরে ওই পীরের কথা উঠল, সেখানে তুমি মানাচ্ছ না। সাইকিয়াস্ট্রিস্ট পাল্টা চাইল ব্রাঙ্কোর দিকে। ঠোঁটে প্রায় পিতৃ-সুলভ হাসি।

'সাধারণ মানুষের সব সন্দেহের বাইরে, অথচ আমাদের নিজস্ব, বিশ্বস্ত লোক, এমন একজন সাইকিয়াট্রিস্ট হচ্ছেন ডক্টর চার্চ,' বলল কেসলার। 'ইনি এমন এক সম্মানিত ব্যক্তি যাঁর কাছে সাহায্যের জন্য ছুটে যায় মানুষ। রেসপন্সিভিজমের নীতি থেকে যারা সরে গেছে, নিজ ইচ্ছায় বা পরিবারের চাপে তাদের

একমাত্র আশ্রয়স্থল হচ্ছেন এই ভদ্রলোক। বিনা দ্বিধায় এঁর কাছে চলে আসে তারা সংশোধন ও চিকিৎসার জন্য। জানে না, তাদের সব কথা পাচার হয়ে চলে আসছে আমাদের হাতে।'

শ্রদ্ধার ছাপ পড়েছে ব্রাঙ্কোর মুখে। একবার দেখে নিল ডক্টর চার্চকে। 'আমি এভাবে ভাবিনি আগে!'

'এই প্লটের মূল কথাটা তুমি এখনও জানো না,' বলল কেসলার। 'সত্যিকার ভাবে মাত্র একজনই ছিলেন যিনি এই কাজ হাতে নিতে পারতেন।'

'কে তিনি?' জানতে চাইল ব্রাঙ্কো।

'কেন, আমি, মাই-বয়,' বলল চার্চ। 'প্লাস্টিক সার্জারি করে মুখ বদলে নিলাম, ব্যবহার শুরু করলাম কন্ট্যাক্ট লেন্স-এর। এভাবে চলল গত বিশ বছর। কাজেই আমাকে চিনতে পারোনি বলে তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না।'

ডক্টরের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চাইল ব্রাঙ্কো। কিছুক্ষণ পর মিইয়ে যাওয়া কণ্ঠে বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে...'

'আমিই লিঙ্ক চ্যাপেল, মিস্টার ব্রাঙ্কো।'

'কিন্তু... আপনি তো মারা গেছেন,' না বুঝেই বলে উঠল সার্ব।

'যে পেশায় রয়েছ, তুমি ভাল করেই জানো, কেউ তখনই মরেছে বলা যায়, যখন তার লাশ পাওয়া যায়—তার আগে নয়। আমি সারাজীবন বহুবার ইয়ট বা বোট নিয়ে সাগরে বেরিয়েছি। ওই ঝড়ে আমার মরবার কথা, তাই না? কিন্তু তা হয়নি। ওই পরিবেশের চেয়ে অনেক খারাপ পরিবেশেও আমি টিকে গেছি।'

'আমি ঠিক...'

বলে উঠল কেসলার, 'তাঁর লেখা দিয়ে রেসপন্সিভিজম প্রতিষ্ঠা করেছেন লিঙ্ক, আমাদের কাজ করবার পথ দেখিয়ে

দিয়েছেন। আজ আমরা যে অবস্থায়, তার সবকিছুর মূলে এই মানুষ—লিঙ্ক চ্যাপেল। তাঁর বিশ্বাস বুকে ধারণ করেছি আমরা।'

'তবে আমি ভাল সংগঠক নই,' বলল চ্যাপেল। 'আমার চেয়ে অনেক দক্ষ সংগঠক আমার মেয়ে আর ডিয়েটস। এরা আমার সব কৃতিত্ব ম্লান করে দিয়েছে। আমি সবার সামনে সুন্দর ভাবে কথা বলতে পারি না, মিটিং-এ কথা আটকে যায়—কিন্তু ওদের সেরকম কোনও সমস্যা নেই। আমি নিজ চোখে দেখলাম তিলতিল করে বড় হয়ে উঠছে এই সংগঠন। ভিন্ন একটা চরিত্র নিলাম আমি, আমার কাজ ওদের রক্ষা করা। আমি হয়ে উঠলাম রেসপন্সিভিস্টদের সবচেয়ে বড় শত্রু। বাইরে বাইরে তাই রইলাম। খেয়াল রাখলাম কেউ ক্ষতি করতে চায় কি না এ সংগঠনের।'

'আর যে লোকগুলোকে রিপ্রোগ্রাম করে আমাদের বিরুদ্ধে নামিয়ে দিলেন, সেটা?' শ্বাস আটকে ফেলেছে ব্রাঙ্কো।

'ওরা এমনিতেই ঝরে যেত,' মৃদু হাসল ডক্টর। 'আমি শুধু ক্ষতি কমিয়ে এনেছি। আমাদের প্রতি খারাপ মনোভাবকে কমিয়ে দিয়েছি। এসব লোক চলে গেছে, তবে তাদের নতুন কোনও তথ্য দেয়া হয়নি।'

'আর রোমে যেটা হলো?'

'খুব বিশ্রী ভাবে সব ঘটল,' বলল চ্যাপেল। 'আমাদের জানা ছিল না অমল দাশার বোন রেসকিউ টিম ভাড়া করতে পারে। যখন জানলাম, সঙ্গে সঙ্গে কেসলারকে জানালাম। এরপর যখন ছেলেটাকে রোমে নিয়ে এল, জানিয়ে দিলাম আমরা কোথায় উঠছি। যাতে তোমরা তৈরি থাকতে পারো। সে ছেলের নাম, হোটেলের নাম ও রুম নম্বর দিলাম। যাতে ছেলেটাকে পাল্টা কিডন্যাপ করে নিয়ে যেতে পারো। আমরা জানি না এ ছেলে

কতখানি জানে, বা বোনকে কতখানি জানিয়েছে।'

'অন্য প্রসঙ্গে আসি এবার,' বলল কেসলার। 'কতটা জানলে, জ্যারোন?'

কার্পেটের দিকে চোখ নামিয়ে নিল ব্রাঙ্কো। এখন সব খুলে বলতে হবে, তার চেয়ে খারাপ, চোখের সামনে দুনিয়ার সেরা সেই মানুষ, পীর ডক্টর চ্যাপেল, যাঁর ফিলোযফি তার জীবন পাল্টে দিয়েছে—এঁদের কী করে বলবে সে ব্যর্থ হয়েছে?

'জ্যারোন?'

'মেয়েটা পালিয়ে গেছে, মিস্টার কেসলার। জানি না কীভাবে সম্ভব হলো, কিন্তু ও ওর সেল থেকে বেরিয়ে যায়। উঠে যায় উপরে। দুই লোককে আহত করে, এক মেকানিককে খুন করে বেরিয়ে যায় এখান থেকে।'

'এখনও দ্বীপে রয়েছে?'

'একটা এটিভি চুরি করেছে গত রাতে। তখন ভীষণ ঝড় বইছে। মাত্র কয়েক ফুট দেখতে পাওয়ার কথা। খেয়াল করেনি টিলার শেষে সামনে রাস্তা নেই। অনেক নীচে পাথরের ভিতর পাওয়া গেছে গাড়িটা। আমার সার্চ পার্টি অবশ্য লাশ পায়নি।'

'লাশ যতক্ষণ না পাওয়া যায়, নিশ্চিত হওয়া যায় না কেউ মরেছে,' নিচু স্বরে বলল চ্যাপেল।

'আপনার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, স্যর, ওই মেয়ে ঝড়ের ভিতর ভয়ঙ্কর কোনও দুর্ঘটনায় মারা পড়েছে,' বলল ব্রাঙ্কো। 'সে যখন পালানোর চেষ্টা করে, তার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। আমি মনে করি না সারারাতের ঝড়ে টিকতে পেরেছে।'

'তাই?'

শয়তান মেয়েটির কাছ থেকে পাওয়া বায়োইলেকট্রিক

ইমপ্ল্যান্টের ব্যাপারে একটি কথাও বলল না সে। ওই জিনিস সঙ্গে থাকবার কী অর্থ তা কারও না বোঝার কথা নয়। এসব বলতে গেলে তার নিজের যোগ্যতা খাটো হয়ে যায়। ইজিয়ান সাগরে রেসপন্সিভিস্টদের এই দ্বীপ জুড়ে মেয়েটিকে খুঁজে চলেছে তার সার্চ পার্টি। যদি লাশ পাওয়া যায়, বা তাকে বন্দি করা যায়, সরাসরি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবে সার্চ পার্টির লিডার। মেয়েটাকে যদি জীবিত পাওয়া যায়, এবার সমস্ত তথ্য আদায় করবে সে তার পেট থেকে। তারপর সুনাম নষ্ট হওয়ার আগেই তাকে খুন করবে। নিচু স্বরে বলল ব্রাঙ্কো, 'লাশ না পাওয়া পর্যন্ত সার্চ চলবে।'

'গুড,' আস্তে করে মাথা দোলাল চ্যাপেল।

চ্যাপেলের দিকে পুরো মনোযোগ দিল ব্রাঙ্কো, 'স্যর, গত ক' বছর ধরে আপনার হয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আপনার শেখানো পথ আমাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। জীবন সুন্দর হয়ে উঠেছে। আগে আমি জানতাম না অর্থবহ জীবন কাকে বলে। তাই আমার খুবই ইচ্ছে করছে একবার আপনার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে।'

'তোমাকে ধন্যবাদ, জ্যারোন। তবে আমার পক্ষে কারও সঙ্গেই হ্যাণ্ডশেক করা আর সম্ভব নয়। দেখতে অনেকটা কম বয়সী মনে হলেও আসলে আমার অনেক বয়স। সত্যি বলতে কী, নব্বুই পেরিয়ে এসেছি অনেক আগে। আমি যখন জেনেটিক রিসার্চ করতাম, সে-সময়ে হঠাৎ করে আমার ডিএনএর জন্য উপযোগী অ্যান্টিরিজেকশন ড্রাগ আবিষ্কার করে ফেলি। ফলে নিজের শরীরে বিভিন্ন লোকের হার্ট, লাংস, কিডনি ও চোখ ট্র্যান্সপ্লাণ্ট করা সহজ হয়ে যায়। কসমেটিক সার্জারি করে আমার বয়সটা কমিয়ে নিই। কিন্তু আমার হিপের হাড়, হাঁটু ও পিঠের

ডিস্ক সব আর্টিফিশিয়াল। প্রতিদিন ব্যালান্সড ডায়েট নিই, কালেভদ্রে কখনও অতি অল্প পরিমাণে ড্রিঙ্ক করি। জীবনে ধূমপান করিনি। কাজেই আশা করি অনায়াসে এক শ' বিশ বছর পার করে দিতে পারব।' গ্লাভস্ পরা দুই হাত তুলল সে। আঙুলগুলো বাঁকা হয়ে আঁকড়ে রয়েছে, ঠিক যেন প্রাচীন গাছের শিকড়। 'তবে আমার বংশে রয়েছে আর্থরাইটিস, চেষ্টা করেও আমি হাতদুটো অক্ষত রাখতে পারিনি। খুব খুশি হতাম তোমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে পারলে, কিন্তু তা সম্ভব নয়।'

'জী, বুঝতে পেরেছি,' চ্যাপেলের ভিতর কোনও দ্বিধা দেখল না ব্রাঙ্কো। যে-লোক পৃথিবীর জনসংখ্যা কমিয়ে আনতে চায়, সে নিজে নকল প্রত্যঙ্গ নিয়ে দীর্ঘায়িত করতে চাইছে জীবনকে।

'আর চিন্তা কোরো না,' বলল চ্যাপেল, 'অমল দাশা গ্রিসে থাকবার সময় তেমন কিছুই জানতে পারেনি। যদি ওর বোন সব জানত, কর্তৃপক্ষের কাছে যেত, তাতেও তারা এত কম সময়ে কিছুই করতে পারত না। মেয়েটিকে ইন্টারোগেট করা ছিল ছোট একটা কাজ। সেটাকে বলতে পারো, ছেঁড়া সুতো বেঁধে নেয়া। এ নিয়ে আর দুশ্চিন্তা কোরো না, জ্যারোন।'

'জী, স্যর,' বিগলিত স্বরে বলল ব্রাঙ্কো।

'এবার আসা যাক অন্য বিষয়ে,' বলল ডিয়েটস। 'আমরা আমাদের টাইম-টেবিল এগিয়ে এনেছি।'

'ওরা অমল দাশাকে তুলে নেয়ার কারণে?'

'খানিকটা তা-ই। বলতে পারো ক্রিস ক্রিংগলের আত্মহত্যার কারণেও। গ্রিক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনও ঝামেলার মধ্যে পড়িনি আমরা, তবে এথেন্সের কর্তৃপক্ষ কেন জানি হঠাৎ করে আমাদের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। লিঙ্ক আর আমি ঠিক করেছি, এখনই ট্রেইনিদের কাজে নামিয়ে দেয়া উচিত। ওরা সব

জানতে চাইছে, কাজেই দেরি করে লাভ নেই। স্বল্প নোটিসে বাড়তি টাকা দিয়ে টিকেট কিনে নিয়েছি আমরা।' মৃদু হাসল ডিয়েটস। 'টাকা নিয়ে আমাদের চিন্তা নেই, তুমি তো জানো।'

'পুরো পঞ্চাশটা টিমকে পাঠিয়ে দেবেন?'

'হ্যাঁ। ঊনপঞ্চাশটা টিমকে। পার্ল অভ মুনে ইতিমধ্যেই উঠেছে বাকি দলটি। ওরা ট্র্যান্সমিটারের ফাইনাল টেস্ট করবে। কাজেই পঞ্চাশটা দলের জন্য পঞ্চাশটা ক্রুজ শিপ। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছতে লাগবে তিন থেকে চারদিন। বেশ কিছু জাহাজ এখন সাগরে। অন্যগুলো রয়েছে দুনিয়ার উল্টো দিকে। আমাদের সদস্যরা ফিলিপিন্সে তৈরি চ্যাপেলের ভাইরাস সঙ্গে নেবে। ...এখন মূল প্রশ্ন হচ্ছে, তোমার কী ধারণা, প্রথম পরীক্ষা করতে কত সময় লাগতে পারে?'

কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে ভাবল ব্রাঙ্কো, তারপর বলল: 'ধরুন আজ বিকেল? অন্য ইঞ্জিনগুলোর ব্যাটারি চার্জ করতে হবে। পুরো পাওয়ার স্ট্যাবিলাইজ করতে হবে। নইলে রক্ষা করা যাবে না অ্যান্টেনা।'

'পার্ল অভ মুনে আমাদের যে টিমকে টেস্ট ভাইরাস দিয়েছি, ওটা খুব সহজ ধরনের, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার মত রাইনোভাইরাস। কাজেই আগামী বারো ঘণ্টার ভিতর টের পাব রিসিভার সিগনাল পেল কি না। আজ রাতে যদি তথ্য পাঠানো হয়, তাতেই চলবে। অবশ্য ওই জাহাজে অন্য একটা টিম কাজ করছে। ওরা সত্যিকারের ভাইরাস প্লান্ট করবে।'

'সত্যিই দারুণ এক সময়,' বলল লিণ্ড চ্যাপেল। 'সব কাজ সারবার পর এবার সত্যিই ঘটতে চলেছে ব্যাপারটা, আমরা গড়তে চলেছি ইতিহাস। কত বছর অপেক্ষা করেছি আমরা? কিছুদিনের মধ্যে নতুন করে জন্ম নেবে পৃথিবী। এ যেন এক

নতুন ভোর। মানবতার বিকাশ ফুলের মত সুবাস ছড়াবে। এমনই হওয়া উচিত ছিল। এক সময়ে অতিরিক্ত মানুষ থাকবে না। খাবার জোটাতে এত কষ্ট হবে না। আয়কর নিয়ে ভাবতে হবে না কাউকে। সবার থাকবে প্রচুর সম্পদ। এক শ' বছরের ভিতর পৃথিবীর মানুষের সংখ্যা নেমে আসবে দু'চার কোটির ভিতর। মানুষের চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি পাবে সবাই। দারিদ্র্য থাকবে না। হানাহানি থাকবে না। ক্ষুধা থাকবে না। এমন কী গ্লোবাল ওয়ার্মিংও থাকবে না।

'এতকাল মুখে এসব বলে এসেছে রাজনীতিকরা, তবে আসল কাজ কিছুই করেনি। মানুষ বুঝবে ওদের সব ছিল মিথ্যা আশ্বাস। খবরের কাগজ পড়লে বা টিভির দিকে তাকালেই বোঝা যায় কিছুই আসলে বদলে যায়নি। দিনে দিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। একটু জমির জন্য পাগল হয়ে উঠছে মানুষ, পানির অধিকার পাওয়ার জন্য লড়াই করছে। শেষ হয়ে আসা খনিজ তেলের জন্য কত লক্ষ মানুষ মরল?

'বিজ্ঞানীদের দিয়ে রাজনীতিকরা বলিয়েছে সব ঠিক হয়ে যাবে, শুধু যদি মানুষ তাদের অভ্যেস বদলে নেয়। কম গাড়ি চালাতে হবে, ছোট বাড়ি তৈবি করতে হবে, খেতে হবে কম, বাতি জ্বালতে হবে কম—আরও কত কী! সব যেন কৌতুক ছাড়া কিছুই নয়। কেউ নিজের সুবিধা ছাড়তে রাজি নয়। মানুষ এমনই হয়। আসলে ছোটখাটো কোনও পরিবর্তন দিয়ে কিছুই হবে না। কেউ আসল সমস্যা নিয়ে ভাবতেই চায়নি। তাই পৃথিবীও বদলে যায়নি। আরও অনেক কম সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে এখন।

'আমরা জানি পৃথিবী রক্ষা করতে হলে একমাত্র উপায় জনসংখ্যা কমিয়ে আনা। এবং এই কথা বলবার সাহস আমাদের

আছে। প্রতিমুহূর্তে আরও বড় গোলমালে জড়িয়ে পড়ছে পৃথিবী। তাই আমি লিখেছি: *নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনছি আমরা অতিরিক্ত সন্তান জন্ম দিয়ে।* মানুষের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা প্রোক্রিয়েশন, অর্থাৎ সন্তান লাভ। প্রকৃতি মানুষ কমিয়ে আনবার জন্য অনেক ব্যবস্থা রেখেছিল। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, খরা, মহামারী, জলোচ্ছ্বাস, দাবানল, হিংস্র প্রাণী—কিন্তু সবকিছুকে হার মানিয়েছে মানুষ। মানুষের মগজ অন্য প্রাণীর তুলনায় অনেক চালু, তারা খুঁজে নিয়েছে নতুন পথ। সবাই মিলে কাঁচকলা দেখিয়েছে প্রকৃতিকে। মাত্র কয়েকটি হিংস্র প্রাণী রয়ে গেল, তাদের আমরা পুরে দিলাম চিড়িয়াখানার খাঁচায়। তখন রইল নির্বোধ মাইক্রোব। সেগুলোর জন্য ভ্যাকসিন ও ইমিউনাইযেশন আবিষ্কার করল মানুষ।

'মাত্র একটি দেশ স্বীকার করেছে তাদের জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। চিন। তবে সে দেশও জনসংখ্যার বেড়ে যাওয়া থামাতে পারেনি। আইন করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে তারা, বলেছে একটার বেশি সন্তান নেয়া চলবে না। তাতেও কাজ হয়নি। গত পঁচিশ বছরে তাদের মানুষ দ্রুত বেড়েছে। দুনিয়ার সবচেয়ে কঠোর রেজিমেন্টেশন যেখানে, তারাই যদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তা হলে অন্য দেশ পারবে কেন!

'মানুষ বদলে যেতে পারে না। মানুষের প্রকৃতিই এমন। কাজেই আমরা ঠিক করেছি নিজেরা দায়িত্ব নেব। আমরা উন্মাদ নই। আমি চাইলে এমন ভাইরাস তৈরি করতে পারতাম যা দিয়ে পুরো মানব-জাতিকে শেষ করে দেয়া সম্ভব ছিল। তা আমি চাইনি। এখনও আমরা ভাবছি কয়েক বিলিয়ন মানুষকে খুন করা উচিত হবে না। আমরা ভেবে বের করেছি জনসংখ্যা কমিয়ে

আনবার উপায়। আমি প্রথম যে হেমোরেজিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস তৈরি করি, সেটা মানুষকে বন্ধ্যা করে দিতে পারে। এতে এক শ' জনের ভিতর পঁচিশজন মারা পড়ত। তবে পরে অনেক রিসার্চ করে তৈরি করি অন্য ভাইরাস। ওটা একজন মানুষ থেকে ছড়িয়ে গিয়ে বন্ধ্যা করতে পারে লক্ষ লোককে। আর ঠিক তাই দরকার এই পৃথিবীর। আমরা যখন পঞ্চাশটা জাহাজে ছড়িয়ে দেব ভাইরাস, সেই মানুষগুলো সংক্রমিত করবে কোটি কোটি মানুষকে। এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে পুব ইউরোপ, চিন, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, ভারত আর বাংলাদেশে।

'তাদের সিম্পটম রয়ে যাবে কয়েক মাস ধরে। আশপাশে যে থাকবে, সে-ই বন্ধ্যা হবে। হালকা ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে, জ্বর হবে, তবে মরবে না কেউ। এতে বড়জোর নব্বুইজন বন্ধ্যা হবে। বাকি সবাই অবাক হয়ে ভাববে কেন তারা সন্তান নিতে পারে না। ততদিনে পৃথিবীর নব্বুই ভাগ মানুষের প্রজনন ক্ষমতা নেই।

'এরপর শুরু হবে ভয়ঙ্কর গোলমাল। রায়ট শুরু হবে, মানুষ তাদের নেতাদের কাছে জানতে চাইবে কেন তারা বন্ধ্যা হলো। কোনও জবাব মিলবে না কারও কাছ থেকে। তবে এসব চলবে বড়জোর ছয়মাস। ততদিনে অর্থনীতির চাকা থমকে যেতে চলেছে। কিন্তু মানুষ ঠিকই বুঝবে তাদের কাজ করতে হবে পেটের তাগিদে। গোলমাল কমে আসবে। এরপর পঞ্চাশ বছরের ভিতর এমন সময় আসবে যখন সম্পদ নিয়ে হানাহানি আর থাকবে না। সবার থাকবে যথেষ্ট। সেটা হবে এমন এক পৃথিবী, যার স্বপ্ন দেখি আমরা।'

'আর শুরুর দিকের গোলমাল যদি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে,

আমাদের উপর যদি হামলা আসে, তা হলে আমরা আমাদের মোক্ষম ভাইরাস ছেড়ে দেব,' বলল ডিয়েটস কেসলার। 'দু'মাসের ভিতরে সাফ হয়ে যাবে শতকরা নব্বই জন, শুধু দশ ভাগ মানুষ থাকবে পৃথিবীতে। আমাদের হাতে রয়েছে ওই ভাইরাসের টিকা, কাজেই থাকছি আমরাও।'

জ্যারোন ব্রাঙ্কোর দুই চোখ থেকে দরদর করে নামছে অশ্রু। চোখ মুছল না সে, মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল লিঙ্ক চ্যাপেলের মুখের দিকে। ডিয়েটস কেসলার গত পঁচিশ বছর ধরে লিঙ্ক চ্যাপেলের বক্তৃতা শুনছে, কিন্তু আজ যেন নতুন করে শপথ নিল আবার। অন্তর থেকে চাইল তাদের এই মহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হোক।

সাত

জাহাজের গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের দিকে চেয়ে রয়েছে কাশেম, একটু উদাস। মার্ভেল ছেড়ে যাবার সময় ওর কাঁধে হাত রেখেছিল প্রাণের বন্ধু জলিল, বড় করে শ্বাস ফেলে বলেছিল, 'দেখ্, দোস্তো, আমরা তো বহুদিনের বন্ধু, আমাদের কি উচিত অজানা, অচেনা, বিদেশি কোনও মেয়ের জন্য বন্ধুত্ব নষ্ট করা?'

'একই কথা ভাবছি আমি,' বলেছে কাশেম। 'আমি ওই বিশ্রী

প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। তোর ইচ্ছা হলে হেলেনের সঙ্গে...'

মাথা নেড়েছে জলিল। 'না রে, দোস্তো, আমিও নেই।'

'তা হলে আয়, শপথ করি, আর কখনও কারও কথায় নাচব না। খেয়াল করেছিস, আমাদের দুজনের কারও ব্যাপারেই বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি হেলেন জিল।'

ভুরু কুঁচকেছে জলিল। 'আসলে আমাদের দু'জনকে উস্কে দিয়েছিল ওই বাবুর্চি ব্যাটা মোস্তফা আবুল।'

'দু'জন মিলে তাকে শায়েস্তা করতে পারি কি না সেটা এবার ভাবতে হবে।'

মাথা দুলিয়েছে জলিল। 'হ্যাঁ, এই তো ভাল একটা কাজ পাওয়া গেল। হেলেন জিলের জন্য যা ঘটতে যাচ্ছিল, তাতে তো কেউ আমরা হেরে গিয়ে আত্মহত্যাও করতে পারতাম। তাই না? ওর শাস্তি হওয়া উচিত। ভয়ঙ্কর কিছু।'

এরপর ওরা দুই বন্ধু বিদায়ের সময় কোলাকুলি করেছে।

পাশ থেকে এক দম্পতির দিকে ইশারা করল সানজিদা স্বর্ণা। 'ওই পরিবার।'

ক'সেকেণ্ড চেয়ে রইল কাশেম, লক্ষ করছে কপোত-কপোতিকে। পার্ল অভ মুন থেকে নেমে আসছে বহু প্যাসেঞ্জার। তাদের বেশিরভাগই বয়স্ক। মাঝবয়সী রয়েছে কিছু। তবে যাদের লক্ষ করছে স্বর্ণা, তাদের বয়স বড়জোর তিরিশ। দু'জনের মাঝখানে টুকটুক করে হাঁটছে তিনবছরের এক মেয়ে। পরনে গোলাপি পোশাক।

'এ তো শিশুর কাছ থেকে ললিপপ কেড়ে নেয়া, কি বলেন?' বলল কাশেম।

মেয়েটির মা ক্রেডিট কার্ড আকৃতির শিপ আইডি বাড়িয়ে দিল স্বামীর দিকে। জিনিসটা ওয়ালেটে পুরল লোকটা, রেখে দিল সামনের পকেটে।

জাহাজ থেকে নামতে গিয়ে হুড়োহুড়ি করছে সবাই, ঘুরে দেখবে ইস্তাম্বুল শহরটা স্বল্প সময়ে যতটা পারা যায় আর কী। হাগিয়া সোফিয়া, নীল মসজিদ, টপকাপি প্রাসাদ, তারপর কেনাকাটার জন্য বাজার ঘুরে ঠগবাজের পাল্লায় পড়ে একগাদা টাকা নষ্ট করতে হবে না?

পার্ল অভ মুন ঠিক তার সিস্টার শিপের মতই। যতবার ওদিকে চাইছে কাশেম, মেরুদণ্ড বেয়ে নামছে শীতল অনুভূতি। প্রথম যখন এ মিশন ঠিক হলো, তখন কিছুই মনে হয়নি। কিন্তু এখন জাহাজে উঠবে ভেবে শিরশির করছে ঘাড়ের পিছনটা।

'চলেছে বাসের দিকে,' যেন মনে করিয়ে দিল স্বর্ণা। দূরে দশ-বারোটা বাস, মেয়েকে নিয়ে সেদিকে চলেছে দম্পতি। ওদিকে এক যাত্রী পাস তুলে দিল অ্যাটেণ্ডেন্টের হাতে।

'এখানেই, না শহরে ঢোকার পর?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'এখানেই। আসুন।'

ওই দম্পতির দিকে দ্রুতপায়ে এগোল ওরা। ঠিক পিছনে পৌঁছুতে হবে। তাড়া আছে, এমন ভাব করে ভিড়ের সঙ্গে চলেছে। তারপর গিয়ে হাজির হলো শিকারের পিছনে। বেচারা জানে না তাকে টার্গেট করা হয়েছে।

'জলদি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল স্বর্ণা। 'মনে হচ্ছে ছেড়ে দেবে আমাদের বাস!'

হাঁটবার গতি আরও বাড়িয়ে দিল কাশেম, লোকটার গায়ে হালকা ঘষা দিয়ে ছুটল সামনে। সন্দেহ হয়েছে স্বামী বেচারার, চট্ করে হাত দিয়ে দেখল ওয়ালেট ঠিক আছে কি না। ভদ্রলোক

ঝানু ট্র্যাভেলার, তার প্রথম প্রতিক্রিয়াঃ পকেট সামলাও। ঠিক তখনই পাশ থেকে তাড়াহুড়ো করে এগোতে গিয়ে লোকটার গায়ে ধাক্কা খেল স্বর্ণা। এইবার আর ওয়ালেট সামলে রাখতে পারল না ভদ্রলোক। প্ল্যান করে তাকে বোকা বানানো হয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে যখন সে দেখল এক মেয়ে ছুটতে শুরু করেছে, তাকে সন্দেহ করবার কথা মনেও আসেনি তার। দ্বিতীয়বারের মত পরীক্ষা ক'রেনি পকেট। টেরও পেল না স্বর্ণার পেলব হাত কখন তার বুক পকেট থেকে তুলে নিয়েছে ওয়ালেট।

কাজ সারার সঙ্গে সঙ্গে ওই লোকের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যেতে চাইত অপেশাদার চোর, কিন্তু ব্যস্ত ভঙ্গিতে এগোতেই থাকল কাশেম-স্বর্ণা। আরেকটু হলে একটা বাসে উঠেই পড়েছিল প্রায়, তবে তা করতে হলো না। আড়চোখে দেখল, কাছেই আরেকটা বাসে উঠে পড়ল দম্পতি। এবার ভিড় থেকে সরতে লাগল স্বর্ণা-কাশেম। হাঁটছে একটু দূরে পার্ক করে রাখা ভাড়া করা গাড়ির দিকে।

ড্রাইভিং সিটে উঠে পড়ল কাশেম। দরজা না খুলে প্যাসেঞ্জার সিটের দরজায় দাঁড়িয়ে রইল স্বর্ণা। ওর কারণে ভাল করে গাড়ির ভিতরটা দেখতে পাবে না কেউ। কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাশেম। মার্ভেল থেকে বিশেষ কিট-বক্স নিয়ে এসেছে। ওটা দিয়ে তৈরি করছে ল্যামিনেটেড আইডেণ্টিফিকেশন কার্ড। স্ক্যালপেল দিয়ে তুলে ফেলল কার্ডের উপরের পাতলা স্বচ্ছ প্লাস্টিক, কেটে সরিয়ে নিল ফটো। এবার ওটার বদলে স্বর্ণার সঠিক মাপের একটা ফটো বসিয়ে দিল জায়গামত। কার্ডের উপর চালু করল ব্যাটারিচালিত ল্যামিনেটর। কাজ শেষে দু'হাতে মসৃণ করল কার্ড। ছেঁটে ফেলল বাড়তি প্লাস্টিক।

'এই নিন, মিসেস ক্যাথারিন ওয়াকার,' কার্ডটা বাড়িয়ে দিল

কাশেম।

ওটা নিল স্বর্ণা। 'মাত্র এক ঘণ্টার বিদ্যেয় ভালই দেখালেন।'

'সাতবার কার্ড তৈরি করে তবে পাশ করেছি পরীক্ষায়। তাতেও কত কষ্ট মোফিজ বিল্লাহ্‌র মনে, ভাল করে শেখাতে পারেনি।' কথা বলতে বলতে নিজের কার্ড তৈরিতে মন দিল কাসেম।

'জাহাজে উঠে আপনাকে কোক খাওয়াব। ডিনারও।'

একটু কুঁচকে গেল কাশেমের ভুরু। 'আপনি পার্ল অভ মুন থেকে নামতে চাইছেন না?'

'ঠিক ধরেছেন। যতক্ষণ না ভাইরাস বা ওই ধরনের কিছুর খোঁজ না পাচ্ছি।'

'মিস্টার ফু-চুং কিন্তু বিরক্ত হবেন।'

'হয়তো। আপনি কী বলেন? আমি মিস্টার ফু-চুঙের কোনও নির্দেশ সরাসরি অমান্য করছি?'

আস্তে করে মাথা দোলাল কাশেম। 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'ওরকম মনে হতেই পারে। ...অবাক লাগছে? ইচ্ছে করলে জাহাজ থেকে নেমে যেতে পারেন আপনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাশেম। 'তা ঠিক চাইছি না।'

'তার মানে আমার সঙ্গে আছেন?'

'হ্যাঁ। আপনাকে একা ছেড়ে নেমে গেলে মারবে মাসুদ ভাই।' দ্বিতীয় আইডির কাজ শেষ করে পরীক্ষার জন্য স্বর্ণার হাতে দিল কাশেম।

'গুড!'

এবার কার্ড দুটো ফিরিয়ে নিল কাশেম, রাখল ইলেকট্রনিক একটা ডিভাইসের ভিতর। ওটার সঙ্গে সংযুক্ত করল ল্যাপটপ কম্পিউটার। নতুন করে রিকোড করল ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ। দশ

মিনিট পর পার্ল অভ মুনের গ্যাংপ্ল্যাঙ্কে এসে দাঁড়াল ওরা। একটু দূরে জাহাজে ভঙ্গুর সিরামিকের বাক্স তুলছে এক ফর্কলিফট। নামিয়ে দেয়া হচ্ছে বড়সড় খোলা হ্যাচ দিয়ে। ওটার উপর ঘুরে চলেছে সাদা এক সি গাল। হঠাৎ কী মনে করে ঝাঁপিয়ে নেমে এল অনেক নীচে। ঠিক যেন যুদ্ধ-বিমান।

গ্যাংপ্ল্যাঙ্কে এসে দাঁড়িয়েছে পার্সার। স্বর্ণা ও কাশেম জাহাজে ফিরবে শুনে জানতে চাইল, 'কোনও সমস্যা, মিস্টার ওয়াকার?'

'সমস্যা আমার বাম হাঁটু,' বলল কাশেম। 'ক'দিন আগে ফুটবল খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিলাম। মাঝে মাঝে ব্যথা বাড়ে।'

'আপনি চাইলে ডাক্তার দেখাতে পারেন, আমাদের জাহাজে সর্বক্ষণ একজন থাকেন।' কার্ডদুটো নিল পার্সার, ইলেকট্রনিক মনিটর দেখে নিল। 'অদ্ভুত তো!'

'কোনও ঝামেলা?'

'না, মানে... হ্যাঁ। আপনাদের কার্ড ভিতরে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে ক্র্যাশ করল কম্পিউটার।'

সিকিউরিটির জন্য সমস্ত ক্রুজ লাইন্সে ইলেকট্রনিক আইডি চালু হয়েছে বেশ অনেক দিন ধরে। ওই কার্ড থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নেয় কম্পিউটার, পরীক্ষা করে দেখে জেনুইন কি না। কোনও গোলমাল না থাকলে জানিয়ে দেয় পার্সারকে। চোরাই কার্ড রিকোড করেছে কাশেম, ফলে কিছুই ফুটে ওঠেনি স্ক্রিনে। হয় ওদেরকে বিশ্বাস করতে হবে পার্সারের, নইলে ওদের অপেক্ষা করাতে হবে। এমন কাউকে ডেকে আনতে হবে যে কম্পিউটার ঠিক করবে। তবে আজকাল ক্রুজ শিপগুলোর জন্য কাস্টোমার সার্ভিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কেউ চায় না

ক্লায়েন্ট অসন্তুষ্ট হোক। বাড়াবাড়ি করলে শেষে মিলবে না যাত্রী। জাহাজ কর্তৃপক্ষের যন্ত্রের ত্রুটির কারণে দেরি করিয়ে দেয়া যায় না যাত্রীকে।

নিজের এমপ্লয়ী আইডেনটিফিকেশন কার্ড স্ক্যানারের ভিতর দিল পার্সার, সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনে ফুটে উঠল ছবি। কাশেম ও স্বর্ণার কার্ডদুটো ফিরিয়ে দিল সে। 'মনে হয় কোন কারণে আপনাদের কার্ড কাজ করছে না। আপনারা কেবিনে ফিরে পার্সারের অফিসে যোগাযোগ করুন। তারা অন্য কার্ড দেবে।'

'বেশ। থ্যাঙ্ক ইউ।' কার্ডদুটো পকেটে রেখে দিল কাশেম, স্বর্ণার কনুই ধরে রওনা হয়ে গেল। র‍্যাম্প বেয়ে উঠছে, একটু খুঁড়িয়ে চলেছে কাশেম।

জাহাজে উঠে যাওয়ার পর নিচু স্বরে জানতে চাইল স্বর্ণা, 'একটু আগে বাম পায়ে ব্যথা ছিল না? এখন তো দেখছি ডান পা টেনে চলেছেন!'

'এখন আমার দুই পায়েই ব্যথা।'

'সতর্ক হয়ে যান, নইলে ধরা পড়ব।'

পাথরের মত চেহারা করল কাশেম। এ মেয়ে কড়া কথা বলবার ওস্তাদ!

মেইন এইট্রিয়ামে চলে এল ওরা। চারতলা উপরে ছাত। ঘসা কাঁচের তৈরি বিরাট গম্বুজ। দুটো কাঁচ ঘেরা এলিভেটর যাত্রীদের উপর-নীচ করিয়ে চলেছে। প্রতিটি ডেকের কিনারে সেফটি গ্লাসের প্যানেল ঝকঝকে পিতলের ফ্রেমে বাঁধানো, সিঁড়ির রেইলিঙের নীচে ঝিকমিক করছে ব্রাস-ব্যানিস্টারগুলো। প্রথমতলার মাঝখানে এলিভেটরের সামনে ফোয়ারার মত ছিটকে উপরে উঠছে জলকণা, মার্বেলের দেয়ালে লেগে গড়িয়ে নেমে আসছে আবার। চারপাশে চাইল ওরা। নানান দোকানে বিক্রি

চলছে হরেক রকম বিলাস-পণ্য। দ্বিতীয়তলার নিয়ন সাইন বলছে, সামনে ক্যাসিনো। এখানে সবকিছুতেই সমৃদ্ধির ছাপ, ডলারের গন্ধ।

মার্ভেলে থাকতেই পরিকল্পনা ঠিক করেছে স্বর্ণা-কাশেম, ঘেঁটে দেখেছে ক্রুজ লাইন্সের ওয়েবসাইট। এই ক্রুজ শিপের লেআউট ভাল ভাবে দেখে নিয়েছে। বাড়তি কথা খরচ করতে হলো না ওদের। ঝর্নার পিছনে রেস্টরুমে চলে এল দুজন। কাঁধের ইউটিলিটারিয়ান ব্যাগ থেকে পোশাক বের করল স্বর্ণা। পাঁচ মিনিট পর ওরা হয়ে গেল জাহাজের কর্মী। বুকের উপর সোনালী রঙে ক্রুজ লাইন্সের লোগো। মোফিজ বিল্লাহ্‌র ম্যাজিক শপ থেকে এগুলো পেয়েছে ওরা। ইতিমধ্যে মুখ থেকে মেকআপ তুলে ফেলেছে স্বর্ণা। কাশেমের মাথার উপর বিরাজ করছে বেসবল ক্যাপ। মেইনটেন্যান্স-ক্রুর এই ইউনিফর্মের বদৌলতে পুরো জাহাজ ঘুরতে পারবে কারও সন্দেহ উদ্রেক না করেই।

'আমরা আলাদা হয়ে গেলে কোথায় দেখা করব?' জানতে চাইল স্বর্ণা। পাশে হেঁটে চলেছে।

'ক্র্যাপ টেবিল?' মুচকি হাসল কাশেম। 'দুনিয়ার সবই তো জুয়া।'

'ঠাট্টা বাদ দিন।'

'লাইব্রেরি?'

'হুম্, লাইব্রেরি,' বলল স্বর্ণা। 'ঠিক আছে। এবার কাজে নামা যাক।'

সবসময় জাহাজের গ্যালি দিয়ে পাবলিক অ্যাকমোডেশন এরিয়ায় যাওয়া সহজ। কাজেই ওরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ডাইনিং রুমে। এখানে অন্তত তিন শ' মানুষ খেতে বসতে পারে। এ মুহূর্তে কোনও প্যাসেঞ্জার নেই। ভ্যাকিউম ক্লিনার

দিয়ে কার্পেট পরিষ্কার করছে হাউসক্লিনিং ক্রু।

টেবিল পরিষ্কার করবার ভঙ্গি নিল ওরা, তারপর ঢুকে পড়ল কিচেনের ভিতর। রান্না থেকে চোখ তুলে ওদের দিকে চাইল এক শেফ, তবে বলল না কিছু। হনহন করে তাকে পাশ কাটাল ওরা। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে স্বর্ণা। ডাইনিং রুম খালি, কিন্তু কিচেনে ব্যস্ত অনেক স্টাফ। পরবর্তী রান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বড়বড় পটে বলকে উঠছে খাবার, সুগন্ধে চারপাশ ম-ম করছে। অ্যাসিন্ট্যান্ট শেফরা দ্রুত হাতে কাটছে তরকারী ও মাছ-মাংস। চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলছে এখানে তিন শিফটে।

কিচেন পেরিয়ে যে দরজা, সেখান দিয়ে যাওয়া যায় জ্বলজ্বলে আলোকিত এক হলওয়েতে। একটা স্টেয়ারকেস পেল ওরা, দেরি না করে নামতে লাগল। শুরু হয়েছে নতুন শিফট। ওদের পাশ কাটিয়ে গেল ক'জন ওয়েট্রেস। ওদের দিকে মনোযোগ দেয়নি কেউ। জ্যানিটরের কাজ এমনই, দ্বিতীয়বার চেয়ে দেখে না কেউ। ওরা যেন অদৃশ্য মানব-মানবী।

কাশেম এক বাল্কহেডের পাশে পেল ভাঁজ করা মই। ওটা নিল, ভাব দেখে মনে হবে জরুরি ডাক পেয়ে চলেছে।

পার্ল অভ মুন বন্দরে ডক করায় বেশিরভাগ প্যাসেঞ্জার তীরে নেমেছে, এ মুহূর্তে সবচেয়ে কম খরচ হচ্ছে বিদ্যুৎ। সেই কারণে এখন ফাঁকা ইঞ্জিনিয়ারিং এরিয়া। পরবর্তী দু'ঘণ্টা ওখানে রইল ওরা। প্রতিটি পাইপ, কণ্ডুইট বা ডাক্ট পরীক্ষা করল। এমন কিছু খুঁজল যা অস্বাভাবিক। গোল্ড অভ মার্স জাহাজে চারপাশ দেখবার সময় পায়নি মাসুদ ভাই, তবে ওদের সময়ের অভাব নেই। নিয়ম ধরে চারপাশ তল্লাসী করল স্বর্ণা ও কাশেম। তবে কোনও ফল হলো না। এখানে রাখা হয়নি ভাইরাস।

'কিছুই নেই,' শেষে তিক্ত স্বরে বলল কাশেম। হতাশ হয়ে

একটু রেগে উঠেছে। 'এমন কিছু নেই যা থাকবার কথা নয়। ভেন্টিলেশন সিস্টেমে অন্য কিছু নেই, পানির সাপ্লাই স্বাভাবিক।'

'ভাইরাস ছড়াতে হলে ওগুলো সেরা জায়গা,' স্বীকার করল স্বর্ণা। ন্যাকড়া নিয়ে হাত থেকে তুলছে গ্রিজ। 'এখানে আর কিছু থাকতে পারে?'

'জাহাজের সবখানে স্প্রে-গান দিয়ে অ্যান্টি ভাইরাল এজেন্ট ছড়ানো যায়, আর কী করতে পারি আমরা,' বলল কাশেম। 'আমাদের আর কিছু করার নেই। এখানে যে সময় ব্যয় করেছি, তার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেছে রেসপন্সিভিস্টরা।' ছাতের সঙ্গে ওভারহেড দেখাল। ওখানে ব্যারেলের মত ডাক্ট। 'আরও দুই ঘণ্টা পেলে ওগুলো পরীক্ষা করা যায়। ভিতরে রাখতে পারে ডিসপার্সাল সিস্টেম।'

মাথা নাড়ল স্বর্ণা। 'ধরা পড়ে যাব। অনেক বড় ঝুঁকি হয়ে যায়। অন্য কিছু করেছে ওরা। দ্রুত ছড়াতে পারে এমন কোনও জায়গায় ভাইরাস রেখেছে।'

'জানি, কিন্তু সে জায়গাটা তো খুঁজে পাচ্ছি না?' খসখস করে মাথার তালু চুলকে নিল কাশেম। বেশি ভাবতে গিয়ে ব্যথা শুরু হয়েছে কপালে। 'মাসুদ ভাই বলেছিলেন উনি গোল্ড অভ মার্সের এয়ার-কণ্ডিশনিং সিস্টেমের মেইন ইনটেক পরীক্ষা করেন। ওখানে হয়তো খুঁজে দেখা যেতে পারে।'

'সেটা কোথায়?'

'উপরের ডেকে। চিমনির আগে। সম্ভবত।'

'খোলা জায়গা,' বিড়বিড় করে বলল স্বর্ণা।

'রাত নামার পর হয়তো পারা যায়।'

মাথা দোলাল স্বর্ণা। 'পাবলিক এরিয়া পেরুতে হবে। পাল্টে নিতে হবে পোশাক।'

বিশাল ইঞ্জিন-রুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা, এগিয়ে চলেছে করিডোর ধরে। আসা-যাওয়া করছে বহু লোক। গেস্ট সার্ভিস ওয়ার্কাররা নানান ইউনিফর্ম পরনে চলেছে নিজেদের গন্তব্যে। ফিরতে শুরু করেছে যাত্রীরা। ইঞ্জিন-রুমের দিকে চলেছে ইঞ্জিনিয়াররা। আর কিছুক্ষণের মধ্যে ইস্তাম্বুল ছাড়বে জাহাজ।

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে গেল স্বর্ণা। সামনের ওই দরজা দিয়ে বোধহয় যাওয়া যায় লণ্ড্রি রুমে। বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক লোক। বয়স হবে পঁচিশের মত। পোশাক তার স্বর্ণার ইউনিফর্মের মতই। এই লোক, বা তার দাঁড়াবার ভঙ্গি নয়, তার চাহনি লক্ষ করেছে স্বর্ণা। যুবক চট্ করে সরিয়ে নিয়েছে চোখ। শেফকে দেখে গ্যালিতে ঠিক ওভাবেই অন্যদিকে তাকিয়েছিল স্বর্ণা—ভাব ছিল চোর-চোর। এই লোকের ভিতর কী যেন অস্বাভাবিক! ভঙ্গি দেখে মনে হয় তার এখানে থাকবার কথা নয়, অথচ হাজির হয়েছে!

একটু ঘুরে দাঁড়াল যুবক, কয়েক সেকেণ্ড পর কাঁধের উপর দিয়ে চাইল। কিন্তু যে মুহূর্তে দেখল স্বর্ণা এখনও চেয়ে, ঘুরে গেল সে, পরক্ষণে আচমকা শুরু করল দৌড়!

'অ্যাই!' চেঁচিয়ে উঠল স্বর্ণা। 'থামো বলছি!' ছুটতে শুরু করেছে। তিন ফুট পিছনে কাশেম।

'না,' তীক্ষ্ণ স্বরে মানা করল স্বর্ণা। 'ওখানে আরও কেউ আছে কি না দেখুন।'

থমকে গেল কাশেম, ঘুরে দৌড়াতে শুরু করল।

সেদিকে খেয়াল নেই, স্বর্ণা জেদ নিয়ে ধাওয়া করে চলেছে। ওই যুবক বিশ ফুট দূরত্বের সুবিধা পেয়েছে। তা ছাড়া পা-ও তার স্বর্ণার চেয়ে ছয় ইঞ্চি লম্বা। তবে বাড়তি সুযোগ ধরে রাখতে পারল না। হালকা শরীর নিয়ে উড়ে চলেছে স্বর্ণা। দুই

মিনিট পেরুনোর আগেই দূরত্ব কমিয়ে আনল দশ ফুটে। করিডোরের বাঁক ঘুরবার সময় গতি কমাল না। হরিণীর মত ছুটে চলেছে। যেন শিকারি চিতা।

তবে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠবার সময় সুবিধা পেল যুবক। একেক বারে তিন ধাপ করে উঠতে লাগল। স্বর্ণা উঠছে মাত্র দুই ধাপ করে। দু'জনেব দৌড় প্রতিযোগিতা দেখে বিস্মিত হয়েছে কর্মীরা। মনে মনে আফসোস করল স্বর্ণা, এদের কাছ থেকে যদি সাহায্য চাওয়া যেত! তা সম্ভব নয়, নিজেই তো ও বেআইনী ভাবে উঠেছে জাহাজে!

একটা দরজা দিয়ে তীরের মত ঢুকল যুবক। দরজার স্বয়ংক্রিয় দুই কবাট বন্ধ হতে চলেছে, এমন সময়ে ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল স্বর্ণা। দুই কনুই ঘসা লাগল ধাতব কবাটে। বুঝতেই পারল না কোথা থেকে এল ঘুসিটা। আঘাত লাগল চিবুকের মাঝখানে। ওই যুবক ট্রেইণ্ড ফাইটার নয়, তবে মারে জোর আছে। কট্টাস্ করে ঘাড়ের হাড় ফুটল, মাথা ঝাঁকি খেল স্বর্ণার। ধড়াস্ করে বাড়ি খেল দেয়ালে। ওখান থেকে মেঝেতে। ওর পাশে এক সেকেণ্ড থামল যুবক, তারপর ঘুরেই দৌড় শুরু করল আবার।

লড়াই করবার সাধ্য আছে কি না বুঝবার আগেই ধড়মড় করে উঠে বসল স্বর্ণা। এক সেকেণ্ড চেয়ে রইল ছুটন্ত যুবকের দিকে। তারপর লাফ দিয়ে উঠেই ধেয়ে গেল। বনবন করে ঘুরছে মাথা। বিড়বিড় করে বলল, 'যাবি কই, শালা!'

শুরু হয়েছে সুদীর্ঘ প্রধান করিডোর। জাহাজ জুড়ে পথ। কেবিন থেকে শুরু করে প্রতিটি ডিউটি এরিয়া কাভার করেছে। সামনে একটু পর পর একের পর এক হলওয়ে। পাশে প্লেটবোর্ডে একটি করে বিখ্যাত নাম—নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন

থিয়েটারের। দূর থেকে হেঁটে আসছে বেশ কয়েকজন নাট্য-কর্মী।

চেঁচিয়ে উঠল স্বর্ণার সামনের পলায়নরত যুবক, 'সরে যান! ইমার্জেন্সি!' ছুটতে শুরু করেছে থিয়েটার কর্মীদের ভিতর দিয়ে। কারও দিকে চাইবার সময় নেই। সাপের মত পিছলে বেরুতে চাইছে। পিছনের মেয়েটার কাছ থেকে পালাতে হবে।

রাগে ফুঁসছে স্বর্ণা, ভারী লাগছে ওর মাথা। ভিড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে। বামের এক দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল যুবক। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামছে। দরজার কাছে পৌঁছতে কয়েক মুহূর্ত লাগল স্বর্ণার। পাঁচ সেকেণ্ড লাগল দরজা আবার খুলে যেতে। নতুন করে শুরু করল ধাওয়া। সিঁড়ি বেয়ে নামতে চাইল না, চড়ে বসল রেলিঙে। তীব্র গতিতে নেমে গেল অর্ধেক তলা। এরপর বাকি রেলিং বেয়ে নামতেই বুঝল, সামনে যাত্রীদের কেবিন। ওই যুবক বুদ্ধিমান হলে, বা জাহাজ আগে থেকেই চেনা থাকলে, চট্ করে ঢুকে পড়বে একটা কেবিনে। সেক্ষেত্রে আর তাকে খুঁজে পাবে না স্বর্ণা।

এদিক ওদিক চাইতেই চোখে পড়ল, একটা হলওয়ে পেরিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠছে যুবক। উপরের ধাপে পৌঁছে গেল। প্রাণপণে দৌড়ে চলেছে। সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন এক বয়স্কা মহিলা। তাঁকে সরিয়ে দিতে চাইল সে, কনুই মেরে বসল পাঁজরে। পাশেই হুইলচেয়ারে তাঁর অসুস্থ স্বামী। আপত্তি তুললেন তিনি, নড়ে উঠল হুইলচেয়ার। ওটার চাকার সঙ্গে বেধে হুমড়ি খেতে গেল যুবক। কয়েক সেকেণ্ড লাগল সামলে নিতে। ততক্ষণে কাজ শুরু করেছে অটোমেটিক দরজার মেকানিযম। মাঝখানের তিনফুট উড়ে গেল স্বর্ণা, একবার ডিগবাজি দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কড়া চোখে চাইল যুবকের দিকে। ওরা প্রায় চলে

গেছে এইট্রিয়ামের উপরতলায়।

ছুটতে শুরু করেছে যুবক, একবার কাঁধের উপর দিয়ে চাইল পিছনে। আরও বাড়িয়ে দিয়েছে দৌড়ের গতি। টুইন গ্লাস এলিভেটরের মাঝখানের সিঁড়ির দিকে চলেছে। এইট্রিয়ামের উপরতলায় কেউ নেই বললেই চলে। একতলা নীচে দোকানের সারি। ওখানে ভিড়। স্বর্ণা আগেই দেখেছে জাহাজের গার্ডরা রয়েছে এক্সক্লুসিভ জুয়েলারি স্টোরের বাইরে। তারা থামাতে পারে। তবে ওই ঝামেলায় জড়ানো চলবে না এখন।

সিঁড়ির উপর ধাপে পৌঁছে গেছে যুবক। দ্বিতীয়বারের মত ঝাঁপ দিল স্বর্ণা। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে যুবকের কোমর জড়িয়ে ধরতে। ওর আঙুলগুলো খামচে ধরল তার জাম্পসুটের কব্জি। উপরের ফ্লোরে পৌঁছে গেল লোকটা, তবে ধাক্কা খেয়ে পিছলে গেল পা। মসৃণ মেঝেতে লম্বালম্বি রওনা হয়ে গেল দেহ। সরসর করে চলেছে, মাথা দিয়ে জোর গুঁতো দিল গ্লাস-প্যানেল রেলিঙে। এমন বিপদ হতে পারে ভেবেই তৈরি করা হয়েছে প্যানেল, কিন্তু মট্ করে ভেঙে গেল একটা ব্র্যাকেট। খসে পড়ল পুরো প্যানেল। চারতলা নীচে মেঝের উপর প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে পড়ল কাঁচের প্যানেল, মুহূর্তে হাজারো টুকরো হলো। চারপাশ কেঁপে উঠল বিস্ফোরণের আওয়াজে। এইট্রিয়াম জুড়ে শুরু হলো মহিলাদের ভীত চিৎকার।

হাত ফস্কে যাওয়ায় যুবকের কোমর ধরতে পারেনি স্বর্ণা। শেষ সিঁড়ির উপর ধপ্ করে পড়েছে নিজেও। একটু দূরে হড়কে গেছে রেসপন্সিভিস্ট। তার দেহের তলা থেকে উধাও হলো মেঝে। তবে খপ্ করে পিতলের এক ব্যানিস্টার ধরল। চারতলার কিনারা থেকে ঝুলছে। একবার চাইল মেয়েটির দিকে। উঠে দাঁড়িয়েছে স্বর্ণা। চোখদুটো দেখল—আত্মঘাতী

হামলাকারীদের মত। চোখে হতাশা, ব্যর্থতা, গর্ব, সবচেয়ে বড়—প্রচণ্ড ক্রোধ।

কব্জি চেপে ধরবার আগেই ছেড়ে দিল সে হাতদুটো।

চেয়ে রইল বাংলাদেশ নেভির লেফটেন্যান্ট।

সাঁই-সাঁই করে নেমে চলেছে যুবক, মুহূর্তে চল্লিশ ফুট দূরত্ব পেরুল। আগেই চিত করে নিয়েছে দেহ। টাইলস করা মেঝের উপর নামল পিঠ দিয়ে। মাত্র এক সেকেণ্ড আগে উপরে চেয়েছে। দেহটা মেঝের উপর ঠাস্ করে নেমে আসতেই ভেজা একটা আওয়াজ উঠল। মড়মড় করে ভাঙল হাড়গুলো, ওগুলো নিয়ে ছিঁড়ে বেরিয়ে এল পেশি। পোশাকের উপর ভেসে উঠল রক্তের ছোপ। এত উপর থেকেও দেখতে পেল স্বর্ণা, ছোট হয়ে এসেছে যুবকের খুলিটা পিছনের অংশ চ্যাপটা হয়ে যাওয়ায়।

দ্বিতীয়বার ভাববার সময় নিল না স্বর্ণা, ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হলো ফিরতি পথে। দুই বুড়োবুড়ি তখনও কিছু বুঝে ওঠেননি। স্বামীকে সোজা করে হুইলচেয়ারে বসাতে চাইছেন মহিলা। পটে রাখা ঝাঁকড়া এক এরিকা পাম গাছের আড়াল নিল স্বর্ণা, খুলে ফেলল ওভারঅল, ওগুলো গুঁজে নিল ব্যাগের ভিতর। ওর নিজের পোশাক ঘামে ভেজা, কিন্তু কিছু করার নেই এখন।

জাহাজের অনেক সামনের দিকে লাইব্রেরি, মুভি থিয়েটারের পাশে। জাহাজের পিছন দিকে রওনা হয়ে গেল স্বর্ণা। ওখানে সুইমিং পুলের পাশে বার ও সফট ড্রিঙ্কের দোকান। এখন দু' মিনিটের ভিতর ওখানে পৌঁছুতে হবে। সামান্য লবণ মিশিয়ে সেভেন-আপ ঢালতে হবে গলায়, নইলে দুপুরের খাবার হড়হড় করে বমি হয়ে বেরিয়ে আসবে।

একঘণ্টা পরও ওই দোকানে বসে রইল স্বর্ণা। জাহাজের

পাশে থেমেছে এক অ্যাম্বুলেন্স। ওটার মাথায় আলো জ্বলছে-নিভছে, তবে বন্ধ হয়েছে সাইরেন। একটু পর বিকট আওয়াজে বেজে উঠল জাহাজের ভেঁপু। এবার বন্দর ছেড়ে রওনা হবে পার্ল অভ মুন।

আট

প্রতিবার পলক ফেলতে গিয়ে রানার মন বলছে, শিরিষ-কাগজ দিয়ে কেউ ঘষছে ওর চোখদুটো। অতিরিক্ত কফি খেয়ে পুড়ে গেছে পাকস্থলীর দেয়াল। সঙ্গে শুরু হয়েছে তীব্র মাথা-ব্যথা। ওটা দূর করতে চাইলে লাগবে পেইন-কিলার। তাতে কাজ হবে এমনও নিশ্চয়তা নেই। একবারও আয়না দেখেনি, তবে বুঝতে পারছে ওকে লাগছে ঠিক কাউন্ট ড্রাকুলার মত—রক্তশূন্য এক পিশাচ! একবার ডানহাতে আঁচড়ে নিতে চাইল চুল। ভাবল, এবার একটু ঘুমাতে হবে।

সবসময় মনে প্রশান্তি আনে হাওয়া, তবে এ মুহূর্তে তিক্ত লাগছে ওর। হাওয়াকে বাধা দিচ্ছে ওয়াটার ট্যাক্সির উইণ্ডস্ক্রিন, তবু শিউরে শিউরে উঠছে। পরিবেশ ভেজা-ভেজা, স্নিগ্ধ, বাতাসে গাছের পাতা ও ফুলের সুবাস। পিছন-বেঞ্চে ওর পাশে আয়েস করে বসেছে সোহেল। মুখ একটু হাঁ করা। ঘুমাচ্ছে বেঘোরে। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে যে সুন্দরী মেয়ে মার্ভেল থেকে ওদের তীরে পৌঁছে দেয়, সে ছুটি নিয়েছে। তার বদলে জাহাজে

পৌঁছে দিতে এসেছে কুস্তিগীরের মত প্রকাণ্ড দামড়া এক লোক। একবার তার দিকে চেয়েছে সোহেল, তারপর মন থেকে তাকে দূর করে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এদিকে রানা জেগে রয়েছে শুধু গনগনে রাগের কারণে। ফু-চুঙের নির্দেশ অমান্য করেছে স্বর্ণা-কাশেম। ওদের পইপই করে বলে দেয়া হয় পার্ল অভ মুন রওনা হওয়ার আগেই নেমে পড়তে হবে। তা না করে লুকিয়ে পড়েছে ওরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা খুঁজেছে রেসপন্সিভিস্টদের ভাইরাস বা টক্সিন।

একবার ওদের সামনে পেলে বাছাই করা কঠোর কিছু বাক্য বলবে, ভেবে রেখেছে রানা। তবে মনে মনে প্রশংসা না করে পারেনি। ওদের কর্তব্যজ্ঞান নিয়ে কথা উঠতে পারে না। তবে ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে অতিরিক্ত। সে-কারণে বকা ওদের প্রাপ্য।

ওর চিন্তা-স্রোতে আবার ফিরে এল উর্বশী। আরও তিক্ত হয়ে গেল মন। একবারও যোগাযোগ করেনি ডিয়েটস কেসলার। এক এক করে মুহূর্ত পেরিয়ে চলেছে। ওই লোক ভাবছে তাকে ছোঁয়ার সাধ্য নেই কারও। হয়তো এতক্ষণে মেরেই ফেলেছে উর্বশীকে। লোকটা নিশ্চয়ই জানে না, ওর কিছু হলে তাকেও মরতে হবে। ওর অন্তর বলে চলেছে, আর নেই উর্বশী!

ইনার হার্বারে আবার ফিরেছে আর্মস ডিলার ব্যালফোর জেনকিন্সের মেগা ইয়ট মাউন্ট সিনাই। নোঙর ফেলেছে তীর থেকে এক মাইল দূরে। মার্ভেলের দিকে চাইল রানা। জাহাজটা ছিল অদ্ভুত সুন্দর। তবে এখন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার হয়। বো ও স্টার্ন স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ, ডেরিকগুলো জানিয়ে চলেছে ওটা কার্গো শিপ। তবে ঠিক ভাবে রং করালে, ডেক থেকে জঞ্জাল সরিয়ে নিলে, ওটা হয়ে উঠবে দুনিয়ার সেরা

একটা জাহাজ।

কাছাকাছি চলে আসতেই চোখে পড়ল হালের মরিচার দাগ। এখানে ওখানে রঙের ছোপ। ক্রেনগুলো থেকে সাপের মত ঝুলছে কেব্ল্। বাইরে থেকে মনে হয় ওই জাহাজের ভিতরটা মাকড়সার জালে ভরা। অতি পুরনো এক জাহাজ, কিছু চকচক করে না। এমন কী অ্যামিডশিপে ডেভিট থেকে যে লাইফবোট ঝুলছে, সেগুলোর প্রপেলার পর্যন্ত জং ধরা।

ঝলমলে ট্যাক্সি নাক গুঁজল মইয়ের নীচে। সাগর এত শান্ত যে দক্ষতা লাগল না কুস্তিগীরের। বোটের পাশে ফেলল না রাবারের ফেণ্ডার।

সোহেলের কাঁধে আলতো চাপড় দিল রানা।

ধীরে ধীরে চোখ মেলল বিসিআই চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার। মুখ কুঁচকে ফেলল। তুলল মস্ত হাই। চাপা স্বরে বলল, 'ব্যাটা বদমাইশ! স্বপ্নের যেখানটায় ছিলাম, আজ রাতে সেখানে যদি না ফিরতে পারি, বক্সিং মেরে ভেঙে দেব তোর নাক!'

'কী দেখছিলি?'

'জুলিয়া রবার্টস আগ্রহী হয়ে উঠল, মিষ্টি একটা হাসি দিল—তার মাঝখানে তুই কোথাকার কে এসে...'

খপ্ করে সোহেলের হাত ধরল রানা, এক টানে দাঁড় করিয়ে দিল। 'চল্। ওঠ্!'

যার যার ব্যাগ তুলে নিল ওরা, কুস্তিগীরকে ধন্যবাদ জানিয়ে মই বেয়ে উঠতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর রেলিং টপকে রানার মনে হলো, জয় করেছে এভারেস্ট।

ওদের জন্য অপেক্ষা করছে ডক্টর ফারা। পাশেই ফু-চুং ও অনিল। হল্যাণ্ডের সুন্দরী এক লাখ ওয়াটের হাসি দিল রানা ও সোহেলকে আস্ত দেখে। মৃদু হাসল ফু-চুং ও অনিল। পলকের

জন্য রানার মনে হলো, ওরা উর্বশীর খবর পেয়েছে। কিন্তু তা নয়। সেক্ষেত্রে ফোন করে ম্যানিলা এয়ারপোর্টে ওদের জানিয়ে দিত ওরা।

'তুমি কি জানো তুমি কত বড় একটা জিনিয়াস, মাসুদ রানা?' ভুরু উঁচু করে বলল ফারা।

'তোমার কোথাও মস্ত ভুল হয়েছে,' ক্লান্ত হাসল রানা।

'ইংল্যাণ্ডের এক ইউনিভার্সিটির অনলাইন ডেটাবেস পেয়েছেন অনিল। সব কিউনিফর্মের উপর। মোবাইল ফোনের ই-মেইলে যে ছবিগুলো পাঠিয়েছ, সব অনুবাদ করেছেন উনি।'

ম্যানিলা এয়ারপোর্টে পৌঁছেই ছবিগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিল রানা।

'অনুবাদ করেছে কম্পিউটার,' লাজুক স্বরে বলল অনিল। 'আমি তো আর প্রাচীন লেখা পড়তে পারি না।'

'বিষয়টা একটা ভাইরাস নিয়ে,' বলল ফারা। 'যতটা বুঝেছি, ওটা ছিল এক ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা। তবে এ জিনিস আগে দেখেনি সায়েন্স। ওটার ছিল হেমোরেজিক কমপোনেন্ট। ইবোলা বা মারবার্গের মত। বড় কথা, ওটার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাপদ হেলেন জিল। ওই জাহাজ যখন প্রথম তীরে ভেড়ে, সে জায়গাটা ছিল ওর গ্রামের কাছেই। ওখানে বড় হয়েছে জিল। আমার ধারণা, হেলেন প্রাচীন ওই জাহাজের নাবিকদের কারও বংশধর।'

কী নিয়ে কথা বলছে ফারা, কিছুই বুঝতে পারেনি রানা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কিন্তু কী নিয়ে আলাপ? জাহাজ? কীসের জাহাজ?'

'নূহ নবীর জাহাজ, আর কী?'

ফারার দিকে ক' মুহূর্ত চেয়ে রইল রানা, তারপর একইসঙ্গে

দু'হাত তুলল মাথার উপর। ভাব দেখে মনে হলো নিঃশর্ত সারেণ্ডার করছে। 'তোমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লে তো চলে না! শুরু থেকে না বললে... তবে তার আগে আমাকে গোসল করতে দিতে হবে। তারপর দু'পেগ উইস্কি আর খাবার না পেলে কিচ্ছু ঢুকবে না মাথায়। খাবারের অর্ডার দাও, আমি দশ মিনিটে আসছি।'

'মোস্তাফা আবুল তোমাদের জন্য কমলার জুস, দু'বাটি আঙুর, চারটে করে ডিম, শিক-কাবাব আর নান রুটির ব্যবস্থা রেখেছে,' বলল ফারা।

ডিনারের সময় হয়ে এল। রানা ও সোহেল পরস্পরের দিকে চাইল। সত্যি, এখন পেট ভরে খেতে পেলে আর কিছুই চাইবে না ওরা।

'চল্-চল্,' তাড়া দিল সোহেল।

'আগে শাওয়ার,' কেবিনের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। কাঁধের উপর দিয়ে চাইল। 'ফারা, ওটা নূহ্ নবীর নৌকা?'

ঘনঘন মাথা দোলাল ফারা। যেন ছোট কোনও মেয়ে, সব বলতে না পেরে পেট ফেটে মরছে।

'এই আসছি বলে।' দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করল রানা।

আধঘণ্টা পর খাওয়া শেষ করে সবার উপর চোখ বোলাল রানা। চোখ স্থির হলো অনিলের উপর। অনুবাদ করেছে সে। 'এবার বল্ তো শুনি।'

'কীভাবে অনলাইন আর্কাইভে পাওয়া গেল কিউনিফর্ম, সেসব বলে বিরক্ত করব না।' নড়েচড়ে বসল অনিল। পছন্দের বিষয় পেয়েছে। 'তোরা যে লেখা পাঠালি, সেগুলো অনেক প্রাচীন। ধর্, সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগের। তবে আসল কথা, আমরা ওগুলো থেকে বহু তথ্য পেয়েছি।'

একই কথা ভেবেছে রানা। হাতের ইশারা করল, চালিয়ে যা।

'কম্পিউটারের হাতে তুলে দিলাম সমস্যা। পাঁচ ঘণ্টা লাগল প্রোগ্রামটার, তারপর শুরু করল কাজ। একের পর এক যুক্তি বাতিল করল। কিছু যুক্তি এড়িয়ে যেতে বাধ্য করায় বাড়ল গতি। কম্পিউটার যখন একটা থেকে আরেকটার তফাৎ বুঝল, একটু সহজ হলো কাজ। ক'বার প্রোগ্রাম চালানোর পর কিছু অদল-বদল করতেই জানাতে লাগল পুরো কাহিনি।'

'আর সেই কাহিনি নূহ নবীর নৌকার?'

'তুই বোধহয় জানিস না কিউনিফর্ম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে গিলগামেশের ধারাবাহিক কাহিনি। কাজটা করেন উনিশ শ' শতাব্দীতে এক ইংলিশ অ্যামেচার। তাঁর পাওয়া সেই মহা-বন্যার কাহিনি হাজার বছর পর এসেছে মুসা নবীর তাওরাতে। বহু জাতির ভিতর প্রচলিত রয়েছে: হাজার হাজার বছর আগে একবার পৃথিবী জুড়ে ভয়ঙ্কর এক বন্যা হয়। অ্যানথ্রোপলোজিস্টরা ধারণা করেন, মানব-সভ্যতা গড়ে ওঠে সমুদ্র উপকূল ও নদীর তীরে। আর সেই কারণেই বারবার প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগ এসেছে। আর সেই কাহিনি ব্যবহার করেছে যাজক ও রাজারা। সাধারণ মানুষকে সাবধান করে দিয়েছে: *ঠিক পথে চলো, নইলে কিন্তু...'* শ্বাস ফেলল অনিল, গ্লাস তুলে এক চুমুক পানি খেল। 'এসব কাহিনির শুরুতে রয়েছে বন্যা বা সুনামি। এদের লিখিত ভাষা না থাকায়, কাহিনিগুলো মুখে মুখে এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে পৌঁচেছে। মানুষ যা করে, একটু করে যোগ করেছে, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে। হয়তো কয়েক জেনারেশন পর রইল না শুধু গ্রাম ভাসিয়ে দেয়া বিশাল ঢেউয়ের কথা, কাহিনি ডালপালা মেলে তৈরি হলো অন্য

কিছু: সেবার গোটা পৃথিবী ডুবিয়ে দিয়েছিল মহা প্লাবন।'

মাথা দোলাল সোহেল, 'এমনই হয়।'

'তো এই কাহিনি শুরু হয়েছে বন্যা দিয়ে। তবে হঠাৎ করে প্লাবন আসেনি। আশপাশে ভারী বৃষ্টি হয়নি। এসব ট্যাবলেট যারা লিখেছে তারা বর্ণনা দিয়েছে: প্রতিদিন বাড়তে লাগল সাগরের পানি। অর্থাৎ একদিনে এক ফুট করে বাড়ল বন্যা। উপকূলের গ্রামবাসীরা সরে গেল উঁচু জমিতে। তবে এই লোকগুলো ধারণা করল শেষ হবে না এই বন্যা। কাজেই বাঁচতে হলে একমাত্র উপায় মস্তবড় নৌকো তৈরি করা। বাইবেলে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে অত বড় জাহাজ তৈরি করা তখন ছিল অসম্ভব। তা ছাড়া, সে ধরনের প্রযুক্তি মানুষের হাতে ছিল না।'

'তার মানে ওটা নূহ নবীর নৌকা নয়?' একটু হতাশ হয়ে জানতে চাইল ফারা।

এতক্ষণ এ তথ্য চেপে রেখেছে অনিল। এবার মাথা নাড়ল। 'না, ওটা সাধারণ একটা নৌকা। তবে বর্ণনার বহু কিছু মেলে। সে সময়ে যেসব লোক বেঁচে গেল, তারা বর্ণনা করেছে কী ঘটেছে। আর এরাই গোড়াপত্তন করেছে গিলগামেশ ও বাইবেলের ওই অত্যাশ্চর্য কাহিনির।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফারা। 'আন্দাজ কত বছর আগে বন্যা শুরু হয়?'

'যিশু আসার সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে।'

'যেভাবে বলছেন মনে হয় আপনি দেখেছেন পুরো ঘটনা, দিন-তারিখও মনে আছে!'

'তার কারণ সেই বন্যার ছাপ এখনও রয়ে গেছে দুনিয়া জুড়ে, সেসব বাদ দিলেও লেখা হয়েছে এসব ট্যাবলেট। বন্যা

শুরু হয় প্রথম পৃথিবীর গহ্বরে। ওটা ছিল আসলে বসফরাসের খোঁড়ল। গভীরতা ছিল এত বেশি যে চিন্তা করা যায় না। ওটা ভরে যায় পানিতে। এরপরও বাড়তে থাকে পানি। মেডিটারেনিয়ান সাগরের পাঁচ শ' ফুট নীচে ওখানে তৈরি হয় আর এক সাগর। আমরা এখন ওটাকে বলি কৃষ্ণ সাগর। আর্কিয়োলজিস্টরা আণ্ডারওয়াটার রোভ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন, ওই উপকূলে ছিল মানবসভ্যতা। পুরো একবছর লাগে ওই বেসিন ভরে যেতে। অর্থাৎ বোঝা যায় নায়াগ্রা জলপ্রপাতের তুলনায় বসফরাসে পানি পড়বার ধারা ছিল হাজার গুণ বেশি।'

'ভাবতে গেলে তাক লেগে যায়,' বলল সোহেল।

'মাত্র গত কয়েক বছর হলো এসব জানতে পেরেছি আমরা। সে-সময় মানুষ বলতে শুরু করে, ওই ঐতিহাসিক বিপর্যয় ছিল বাইবেলে লেখা সেই বন্যা। তবে সায়েন্টিস্ট ও থিয়োলোজিয়ানরা জোর গলায় বলছেন, তা হতে পারে না।'

'কার কথা ঠিক তা এখনই কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না,' বলল রানা। 'তর্ক চলতে থাকুক, অন্য একটা প্রসঙ্গে আসি। এসব ট্যাবলেট তো কিউনিফর্মে লেখা। ওই লেখার জন্ম হয়েছে মেসোপটেমিয়া আর সামারিয়া এলাকায়। কৃষ্ণ সাগর এলাকায় নয়।'

'আগেই বলেছি ওই লেখার ভঙ্গি খুব প্রাচীন। সম্ভবত কৃষ্ণ সাগর এলাকা থেকে সরে যেতে থাকে মানুষ। চলে যেতে থাকে দক্ষিণে। তারা মিশে যায় অন্যান্য জাতির সঙ্গে। মূল কথা: তুই যে ট্যাবলেট পেলি সেগুলোর কারণে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস বদলে যেতে পারে।'

'আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করি, বাপ,' হাই তুলল

সোহেল। 'খুব ভাল লাগছে! বলে যাও, শুনতে শুনতে ঘুমাই।'

'কৃষ্ণ সাগরের তীরে এক গ্রামের মানুষ ভাবল, পানি বাড়তে থাকবে। ...আগেই বলেছি এক বছর ধরে বেড়ে তীরের সমান হয়েছে পানি। লোকগুলো সহজ হিসাব কষল। তাদের লেখায় আমরা পেয়েছি তারা নৌকো তৈরি করল। ট্যাবলেটে লিখেছে, এরপর নৌকো নিয়ে রওনা হলো তারা। কিন্তু এত মানুষ ঠাসাঠাসির কারণে শুরু হলো ভয়ঙ্কর সব অসুখ-বিসুখ।'

মাথা দোলাল ফারা। 'আজ পৃথিবী জুড়ে যে রিফিউজি পপুলেশন, এর ফলে একই পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রতিবার শুরু হয় ডিসেণ্ট্রি, টাইফাস, কলেরা—ইত্যাদি।'

কাহিনির সুতো আবার বুনতে শুরু করল অনিল: 'বাইবেলের কাহিনির মত ঘটল না, মানুষগুলো তাদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলল, সেগুলো দিয়ে তৈরি করল বড় এক নৌকো। তা এমন আকৃতির হলো যে তাতে চার শ' মানুষ এঁটে গেল। সেই নৌকোর আকৃতি কেমন ছিল তা তারা লেখেনি। তবে বর্ণনা দিয়েছে: ওটার কাঠের খোল ঢেকে দেয়া হয় বিটুমেনে। এরপর মুড়িয়ে দেয়া হয় তামা দিয়ে।

'তখন মাত্র শুরু হয়েছে তাম্র যুগ। ওরা যে এলাকায় থাকত সেখানে প্রচুর তামা পাওয়া যেত। কাজেই ওই ধাতু দিয়ে মুড়িয়ে দেয়া হলো নৌকোর খোল। সঙ্গে থাকল গরু-ছাগল-ভেড়া-শুয়োর ও অসংখ্য মুরগি। সেই সঙ্গে তাদের জন্য প্রচুর খাবার। কয়েক মাস চলবার উপযোগী।'

'অন্তত তিন শ' ফুট লম্বা হতে হবে ওই নৌকা, নইলে সব আঁটবে না,' প্রথমবারের মত মুখ খুলল গগল।

'কম্পিউটার তাই জানিয়েছে। ওটার হিসাব অনুযায়ী, তিন শ' আঠারো ফুট। বিম ছিল তেতাল্লিশ ফুট। নীচের ডেকে রাখা

হয় পশুগুলো। মাঝের ডেকে খাবার। উপরের ডেকে গ্রামবাসীরা।'

'প্রপালশান কী ছিল?'

'পাল।'

মাথা নাড়ল রানা। 'পাল তখনও আসেনি। আরও দুই হাজার বছর পর আসবে পাল।'

টেবিলে রাখা ল্যাপটপের উপর ঝুঁকে পড়ল অনিল। 'মূল অনুবাদে ফিরছি: *ডেকের দুই মোটা দণ্ড থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হলো পশুর চামড়া। ওটাই ধরল বাতাস।'* রানার দিকেই চাইল অনিল। 'আমি তো বলব ওটাই পাল।'

'তাই তো দেখছি। বলে যা।'

'এরপর এক সময়ে পানি ভাসিয়ে নিল ওদের নৌকাকে। ওরা তো রওনা হয়ে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওদের, রওনা হওয়ার কিছুদিন পর থেমে গেল পানির বৃদ্ধি। ওরা জানত না বলেই ব্ল্যাক সি এলাকা ছেড়ে সরে যেতে চাইল। যাই হোক, ওরা এক মাস নয়, বরং কয়েক মাস ভাসতে লাগল খোলা সাগরে। নানান উপকূলে নামতে চাইল। কিন্তু হয় সুপেয় পানি পেল না, নইলে ওখানকার স্থানীয় লোক আক্রমণ করতে উদ্যত হলো।

'পাঁচ চন্দ্র মাস ও বহু ঝড় পেরিয়ে চব্বিশজন সহযাত্রী হারিয়ে শেষ পর্যন্ত তীরে ভিড়ল নৌকা। শত চেষ্টাতেও আর ভাসানো গেল না নৌযান।'

'কোথায় গিয়ে থামল?' জানতে চাইল আতাসি।

'সেই এলাকাকে বলা হয়: "পাথর ও বরফের দুনিয়া"।'

রানার চোখে চাইল ফারা। 'হেলেনের গ্রামের কাছে।'

'কিছু ডিডাকশনাল যুক্তি খাটিয়ে কম্পিউটার জায়গার লোকেশন জানাচ্ছে,' বলল অনিল।

'বল্?'

'উত্তর নরওয়ে।'

'নরওয়ে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল অনিল। 'ইম্পিরিয়াল জাপানের ফ্যাসিলিটি থেকে যেসব ট্যাবলেট পেলি, সেগুলো কাজে লাগিয়েছে তাদের ইউনিট সেভেন টোয়েন্টি টু। কেন, সেটা তুই জানিস। ওরা বায়োলজিকাল ওয়েপন্স তৈরি করেছে। জার্মানির মত ম্যাস কিলিং করতে কেমিকাল এজেন্ট ব্যবহার করেনি জাপানিজ আর্মি। জাপানিরা সবসময়ই এ ধরনের রিসার্চ করতে অভ্যস্ত।'

'তার মানে ইউনিট সেভেন টোয়েন্টি টু-র হাতে ভাইরাস তুলে দেয় নাজিরা।' চোখের কোণ চুলকে নিল রানা।

'কিন্তু একটা জিনিস মিলছে কই?' বলল সোহেল। 'ইউনিট সেভেন টোয়েন্টি টু-র দরকার পড়ল কেন প্রাচীন লেখার? একটা নৌকা নিয়ে পড়ল কেন?'

সোহেলের দিকে চাইল ফারা। 'নৌকাটা দরকার ছিল। আসলে দরকার ছিল ওটার ভিতরে রয়ে যাওয়া রোগ।'

অনিল একবার মাথা দোলাল। 'আগেই বলেছি, নৌকো থামবার পর শুরু হলো ভয়ঙ্কর সব রোগ। যে বা যারা ট্যাবলেট লিখেছে, তারা বিস্তারিত ভাবে লিখেছে কী রোগে মরছে মানুষ।'

'সেগুলোর ভিতর ছিল এয়ারবোর্ন হেমোরেজিক ফিভার,' বলল ফারা। 'বড় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা। তাদের অর্ধেক মানুষ মরল ক'দিনের ভিতর। এরপর ভাইরাসের আক্রমণ শেষ হলো। এর পরের ঘটনা করুণ। যারা বেঁচে রইল তাদের বেশির ভাগ হয়ে গেল বন্ধ্যা। অল্প কিছু লোক মিশতে

লাগল নিচু জাতির স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে। এদের কেউ কেউ পেল সন্তান। অর্থাৎ ওই ভাইরাস বেশিরভাগ মানুষকে স্টেরাইল করে দেয়।'

'তৎকালীন জাপান চেয়েছে মেইনল্যাণ্ড চিনকে দমন করতে,' বলল অনিল। 'এ ধরনের রোগ হাতে পেলে ব্যবহার করত জাপানীরা। ফারা ও আমি ধারণা করি, ওই ট্যাবলেট ছাড়াও, জাপানের হাতে মামিফায়েড লাশ তুলে দেয় জার্মানরা। তারাই আবিষ্কার করেছিল কোথায় রয়েছে ওই নৌকো।'

'একটা জট খুলল,' বলল সোহেল। 'জাপানিরা এসব ট্যাবলেট পেয়েছে জার্মানদের কাছ থেকে। হতেই পারে। নৌকা থেকে পেয়েছে জার্মানরা। ওরা তখন দখল করে নিয়েছিল নরওয়ে। সময়টা ছিল বোধহয় উনিশ শ' চল্লিশ।'

'"পাথর ও বরফের দুনিয়া" বলা হয় আইসল্যাণ্ড বা গ্রিনল্যাণ্ডের কিছু অংশকে,' বলল অনিল। 'তবে ওই দেশগুলো কখনও দখল করেনি জার্মানি। রাশানদের হাতে পড়ে ফিনল্যাণ্ড। নিরপেক্ষ রইল সুইডেন। বাকি রইল নরওয়ে। ওই দেশের উত্তর উপকূলে রয়েছে ফিয়োর্ড। ওখানে লোকবসতি নেই বললেই চলে। বেশির ভাগ এলাকায় মানুষের পা পড়েনি।'

'ফারা, একটু আগে ডেকে তুমি বলেছ ওই রোগে ইমিউন হেলেন,' বলল রানা।

'যত ভেবেছি, কোনও শক্ত যুক্তি পাইনি। গোল্ড অভ মার্সে আর সবাই ওই ভাইরাসে মরল, কিন্তু কিছুই হলো না হেলেনের। কেন? তারপর বুঝতে পারলাম। ট্যাবলেটে লেখা রোগ কিন্তু বাতাসবাহী। রেসপন্সিভিস্টরা যে ধরনের ভাইরাস তৈরি করে, সেটার বিরুদ্ধে লড়েছে হেলেনের ইমিউন সিস্টেম। যতই সাপ্লিমেণ্টাল অক্সিজেন থাকুক, একটু হলেও শরীরে ঢুকেছে

ভাইরাস। কিন্তু কিছুই হয়নি ওর।

'আসলে ওর কোনও এক পূর্বপুরুষ ওই রোগে পড়ে, এবং সুস্থ হয়ে ওঠে। আমার ধারণা ওর ডিএনের ভিতর অ্যান্টিবডি কোডে লেখা আছে এই রোগকে কীভাবে পাল্টা আক্রমণ করে ঘায়েল করতে হবে। হেলেন বলেছে ও এসেছে উত্তর নরওয়ের এক ছোট শহর থেকে। তা থেকে ধারণা করছি, ওই নৌকা ওদিকেই কোথাও ভিড়েছিল।'

'ওকে টেস্ট করা যায়?' জানতে চাইল রানা।

'নিশ্চয়ই। যদি পাই ওই ভাইরাসের স্যাম্পল, তবে।'

ঘুমে জড়িয়ে আসছে রানার চোখ। আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'সরি। আমার এবার উঠতে হবে। ঘুমাব। পাযলের আরেকটা অংশ কিন্তু মিলছে না। ধরে নিলাম ওই নৌকা আবিষ্কার করেছে জার্মানরা, অনুবাদও করেছে ট্যাবলেট, জানতে পেরেছে ওই ভয়ঙ্কর রোগের কথা—ওটা ওদের দরকার নেই, কাজেই দিয়ে দিয়েছে বন্ধু জাপানকে। ইউনিট সেভেন টোয়েণ্টি টু সেই ভাইরাস নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করেছে। কিন্তু সত্যিই কি ওই ভাইরাসকে সক্ষম করে তুলেছিল? ধারণা করতে পারি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কোথাও এর প্রয়োগ নেই। আমরা এ ধরনের রোগের ইতিহাস পাই না।'

ফারা ও অনিল চেয়ে রইল।

হাই চাপল রানা। 'তা হলে আমরা কেন ভাবছি ওই ভাইরাস পড়েছে রেসপন্সিভিস্টদের হাতে? ষাট বছর আগে যদি জাপানিরা ব্যর্থ হয়, তো ডিয়েটস কেসলার বা তার স্যাঙাৎরা সফল হয় কী করে?'

'এ নিয়ে আরও ভাবতে হবে,' বলল অনিল। 'তবে অন্য কোনও সূত্র বাদ দিই, রেসপন্সিভিস্টদের ওই সংগঠনের নেতা

ছিল লিঙ্ক চ্যাপেল। যে কিনা ছিল দুনিয়া-সেরা এক ডিযিয রিসার্চার। জাপানের ওই ফিলিপিনি ফ্যাসিলিটি নিজেরাও ব্যবহার করেছে রেসপন্সিভিস্টরা। কীভাবে জানল ওটা ওখানে রয়েছে? যেভাবেই হোক, ওরা জানত ওখানে ভাইরাস নিয়ে কাজ হয়েছে। এই সূত্রগুলো খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

'পরের প্রশ্ন, কেন ভাইরাস দিয়ে খুন করল গোল্ড অভ মার্সের সবাইকে?' বলল রানা। 'ভবিষ্যতে ওটা দিয়ে কী করতে চায়?' কোনও কথা বলছে না কেউ। 'ওরা যদি জনসংখ্যার আধিক্যকে মস্ত সমস্যা মনে করে, ওই ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়, তাতে মরবে কোটি কোটি মানুষ। এর ফলে শুরু হবে পৃথিবী জুড়ে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। সামলে নেবে না সভ্যতাগুলো। সোজা কথায়, ওদের হাতে রয়েছে কেয়ামত টেনে আনার অস্ত্র।'

'ওরা যদি ব্যবহার করে?' বলল আতাসি। 'যদি ধরে নেয় সভ্যতা ধ্বংস হোক, তাতে ওদের কী?'

'করতে পারে,' বলল অনিল। 'তবে রেসপন্সিভিস্টদের বিষয়ে কিছু লেখাপড়া করেছি। ওদের বই পড়ে মনে হয় না ওরা অযৌক্তিক মানুষ। ওরা লিখেছে, মানুষ আবার আদিম যুগে ফিরতে পারে। হয়তো ঠিক তা-ই চাইছে, থেমে যাক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইযেশন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি।'

'ক্রুজ শিপে আক্রমণ কেন?' বলল রানা। 'প্রতিটি বড় শহরে ভাইরাস ছড়িয়ে দিলে অসুবিধা কী?'

চুপ করে রইল সবাই।

ধীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল রানা। 'সবাইকে আরও ভাবতে হবে। তবে শেষ পর্যন্ত আমরা খুঁজে বের করব কেন-কী করতে চাইছে রেসপন্সিভিস্টরা। আপাতত আমি চললাম, নইলে

এখানেই ঘুমিয়ে পড়ব। কেবিনে ফিরে একবার যোগাযোগ করব আমার বস্ ও অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে। তাঁদের সব জানা দরকার। শুনি কী বলেন তাঁরা।' অনিল ও ফু-চুঙের দিকে চাইল রানা। 'তোদের বসের মাধ্যমে তোরাও জানিয়ে রাখ্ চিন ও ভারত সরকারকে। স্বর্ণা বা কাশেম যোগাযোগ করলে আমাকে জানাবি।'

'ওরা সঙ্গে স্যাটালাইট ফোন রাখেনি,' বলল ফু-চুং। 'পার্ল অভ মুনের শিপ-টু-শোর টেলিফোন ব্যবহার করবে। যোগাযোগ করার কথা...' ঘড়ি দেখে নিল চৈনিক গুপ্তচর। 'আর তিন ঘণ্টা পর।'

'ওদের বলবি আমিও বলেছি, জাহাজ থেকে নেমে পড়তে। দরকার হলে লাইফবোট চুরি করে নেমে পড়ুক।'

রানার মনে হলো এক পলক আগে চোখ বুজেছে। এরইমধ্যে বাজতে শুরু করল ফোন?

'রানা,' খসখসে জিভে জড়িয়ে গেল কথা। পর্দা ভেদ করে সূর্যালোক এসে পড়ছে কপালে। মাথা সরিয়ে নিল রানা।

'বস্, আমি আতাসি। আপনার এখুনি অপারেশন্স সেণ্টারে আসা দরকার।'

'কী হয়েছে?' পা ঘুরিয়ে কট্ থেকে নেমে পড়ল রানা।

'আমার মনে হয় একটা ইএলএফ ব্যাণ্ডে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে কেউ।'

'ওটা দিয়ে তো সাবমেরিনের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেভি।'

'তবে এরা নেভি নয়, বস্। আপনি বলেছিলেন আমেরিকা তাদের শেষদুটো ট্র্যান্সমিটার খুলে ফেলেছে দু'বছর আগে। তা ছাড়া এরা ট্র্যান্সমিট করছে সেভেনটি-সিক্স হার্টয-এ। তথ্য

আসছে হাণ্ড্রেড থার্টিন-এ।'

'সোর্স কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'যে-টুকু রিসিভ করেছি, তাতে লোকেশন পিন-পয়েন্ট করা যায়নি। তা ছাড়া ট্র্যান্সমিশন খুব লো ফ্রিকোয়েন্সির।'

'ঠিক আছে। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।' শার্ট-প্যান্ট পরে নিল রানা, জুতো পরতে আধ মিনিট, এক মিনিট গেল দাঁত ব্রাশ করতে। একবার রিস্টওয়াচ দেখল, তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। তবে ওর মনে হলো, সময় পেরিয়েছে বড়জোর তিন মিনিট।

সাড়ে চার মিনিট পর অপারেশন্স সেন্টারে ঢুকল রানা। গুঞ্জন করে চলেছে সুপার কম্পিউটার। এ কামরায় ঢুকলে অদ্ভুত এক অনুভূতি হয় ওর। এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় গোটা জাহাজ ও অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্র। মুহূর্তে হাতে চলে আসে প্রচণ্ড ক্ষমতা।

রানা সিটে বসতেই ধূমায়িত কফির মগ পাশে রাখল মোস্তাফা আবুল। 'মিস্টার আতাসি বললেন, আপনার লাগবে।'

'ধন্যবাদ।' মগে চুমুক দিল রানা। আতাসির মনিটরের দিকে চাইল। 'এবার বলো।'

'আপনি তো জানেন অটোমেটিক্যালি প্রতিটি ফ্রিকোয়েন্সি স্ক্যান করে আমাদের কম্পিউটার। প্রতিটি রেডিওর স্পেকট্রাম। ওটা যখন বুঝল ইএলএফ লেভেলে ট্র্যান্সমিট চলছে, রেকর্ড করতে শুরু করল। তারপর যখন বুঝতে পারল একটা শব্দ ধরতে পেরেছে, আমাকে সতর্ক করে দিল। আমি এখানে আসবার পর এখন পর্যন্ত মাত্র ওই চারটে শব্দ ট্র্যান্সমিট করেছে।' মাথা কাত করে ফ্ল্যাট-প্যানেল দেখাল সে। রানা স্ক্রিনে দেখতে পেল ওখানে লেখা: দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস।

'ব্যস?' তবে রানার কণ্ঠে কোনও হতাশা প্রকাশ পেল না।

ইএলএফ ওয়েভ অত্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়, চলে যায় সোজা বাইশ শ' মাইল উপরে। পুরো পৃথিবী ঘুরে তথ্য পৌঁছে যায় সাগরের গভীরে। আসলে ইএলএফ ট্র্যান্সমিটার পুরো পৃথিবীকে বিশাল এক অ্যান্টেনার মত ব্যবহার করে। এর খারাপ দিক, সাবমেরিনগুলো পাল্টা জবাব দিতে পারে না। তাদের ওই আকারের ট্র্যান্সমিটার থাকে না। এ কারণে পুরো সিস্টেম বাতিল করে দিয়েছে নেভি। এক কথায়, যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসাবে ওটা বাতিল হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে: কেন ইএলএফ সিস্টেম নেই সাবমেরিনে। উত্তর: সেক্ষেত্রে কমপক্ষে লাগবে তিরিশ মাইল দৈর্ঘ্যের অ্যান্টেনা। ওটা মাত্র আট ওয়াট সিগনাল ব্যবহার করে, তবে অতবড় অ্যান্টেনায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করবার ক্ষমতা সাবমেরিনের নেই। এমন কী নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের রিয়্যাক্টরও তা পারে না। তবে সবচেয়ে বড় কারণ: এমন এক এলাকায় রাখতে হবে ট্র্যান্সমিটার, যে মাটিতে বিদ্যুৎ চলৎশক্তি খুব কম। যাতে রেডিও ওয়েভ শোষিত না হয়। পুরো পৃথিবী জুড়ে মাত্র কয়েকটি এলাকা রয়েছে, যেখানে ইএলএফ ব্যাণ্ড পাঠানো যায়। সেগুলোর ভিতর নেই কোনও সাবমেরিন।

'লগের কথা বলি,' মনোযোগ কেড়ে নিল আতাসি। 'আরেকটা ইএলএফ ট্র্যান্সমিশন হয়। ওটা একই ফ্রিকোয়েন্সিতে। সময়টা ছিল গতকাল রাত দশটা। মেসেজে ছিল একগাদা এক আর শূন্য। আমি মেইনফ্রেম কম্পিউটারকে কাজ দিয়েছি। ওটা যদি কোনও কোড হয়ে থাকে, বেরিয়ে আসবে।'

আতাসির স্ক্রিনে আরেকটা অক্ষর ভেসে উঠেছে—'আই'। এক মিনিট পর এল একটা 'টি'।

'দাঁতের ডাক্তার যেভাবে আয়েস করে দাঁত তোলে, তার চেয়ে দেরি করে এর নড়াচড়া,' নালিশ করল আতাসি। 'কে তৈরি করে এই কচুর ইএলএফ অ্যান্টেনা?'

'সোভিয়েতরা,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'ওরা গভীর পানিতে থাকা সাবমেরিনের সঙ্গে বহু দূর থেকে যোগাযোগ করত। এ ছাড়া আর কোনও কারণ ছিল না।' একটা চিন্তা এসেছে ওর। এই ট্র্যান্সমিটার যদি আমেরিকান না হয়, তো হতে পারে রাশান বা ইজরায়েলিদের। শুনেছে গোপনে রাশানদের কাছ থেকে প্রযুক্তি কিনছে ইজরায়েল। ইজরায়েলিরা হয়তো জেনে গেছে, ওরা নজর রাখছে আর্মস ডিলার ব্যালফোর জেনকিন্সের উপর।

'অপেক্ষা করতে হবে বাকি জীবন,' বলল আতাসি। 'হয়তো দশ বা পনেরো মিনিট পর আরেকটা অক্ষর ছাড়বে।'

অপেক্ষা করল ওরা। তবে এক মিনিট পর কম্পিউটারে আরও অক্ষর ভেসে উঠল। সব মিলে রইল দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস ইটস উর...

চেয়ে রইল রানা, এরপর একটা একটা করে এল অক্ষরগুলো। বিওএসএইচআই।

অর্থাৎ, বশি?

'এর মানে কী?' বলল আতাসি।

আস্তে করে শ্বাস ফেলল রানা। 'বলছে, আমি উর্বশী। ইএলএফ ট্র্যান্সমিটার দিয়ে যোগাযোগ করছে।'

বিড়বিড় করে নিজেকে অভিশাপ দিল আতাসি। দ্রুত হাতে কম্পিউটারে আরেকটা উইণ্ডো খুলল। আর্কাইভ থেকে বের করল ওয়ায়ারটেপ। ওটা পাওয়া গেছে ক্রিস ক্রিংগলের অফিস থেকে। 'আগে কেন বুঝলাম না?' নিজের উপর রেগে উঠেছে। স্ক্রিনে

ভেসে উঠল:

আমি মনে করি না... (১:২৭) হ্যাঁ... (২:৫৭) পার্লা মোনা... (১:৩৫) ওই ইল লেফ অ্যাকটিভেট... (:৩৮) কী... (১:০৩) আগামী(কাল).... (৪:২০) তা হবে না... (:৪২) এক মিনি(ট)... (৬:৫৭) বাই। (১:১৪)

'কী বোঝোনি?' জানতে চাইল রানা।

'চতুর্থ শব্দগুলো। ইল লেফ অ্যাকটিভেট মানে ইএলএফ ট্র্যান্সমিটার চালু করতে বলেছে। রেসপন্সিভিস্টদের নিজেদের রয়েছে ইএলএফ ট্র্যান্সমিটার।'

আস্তে মাথা দোলাল রানা। 'ওরা যদি ক্রুজ শিপগুলোর ভিতর ছড়িয়ে দিতে চায় টক্সিন, ইএলএফ বার্তা দিয়ে একইসঙ্গে পুরো দুনিয়া জুড়ে তা জানাতে পারবে।'

অধৈর্য লাগতে শুরু করেছে ওর। উর্বশীর কাছ থেকে অতি ধীরে আসছে বার্তা। এদিকে চেপে ধরেছে ঘুম। হার মেনেছে কড়া কফি। উঠে দাঁড়াল রানা। 'আতাসি, আমি কেবিনে ফিরছি। পুরো বার্তা এলে ঘুম থেকে ডেকো। আরেকটা ব্যাপার, কোথা থেকে ট্র্যান্সমিশন আসছে পিন-পয়েন্ট করো। এটা এখন সবচেয়ে জরুরি। প্রয়োজনে অনিলের সাহায্য নাও।' একবার কম্পিউটারের দিকে চাইল রানা, মনে মনে বলল, 'জানি না কীভাবে যোগাযোগ করলে, উর্বশী, কিন্তু দারুণ দেখিয়েছ!'

নয়

দুনিয়ার সবচে' পুরনো কৌশলগুলোর একটা ওটা, তবে চমৎকার কাজে লেগে গেছে। আণ্ডারগ্রাউণ্ড বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে আসবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্র তীরের ওই পাথুরে ক্লিফটা আবিষ্কার করেছে উর্বশী। এটিভি থেকে নেমে পড়েছে। তুমুল বৃষ্টির মধ্যেও পাহাড়ের পায়ে সমুদ্রের মাথা কোটার ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ শুনতে পেয়েছে পরিষ্কার। জায়গাটা ছোটখাট একটা দ্বীপ বলে মনে হয়েছে ওর কাছে। বুঝতে পেরেছে, এখানে লুকিয়ে থাকা যাবে না। পুরোপুরি খুলে দিয়েছে ও এটিভির থ্রটল, যন্ত্রটা ছিটকে গিয়ে পড়েছে নীচে পাথরের গায়ে, সেখান থেকে সোজা সৈকতে। চারপাশ ছিল নিকষ অন্ধকার, কোথায় গিয়ে পড়ল দেখতে পায়নি ও। ধারণা করেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই পলাতক বন্দির জন্য চারপাশ খুঁজতে শুরু করবে ব্রাঙ্কো। এবং সহজেই পেয়ে যাবে বিধ্বস্ত এটিভিটা।

পায়ে হেঁটে আবার ফিরে এসেছে ও বাঙ্কারের প্রবেশ-পথে। ততক্ষণে ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে বেরিয়ে গেছে সার্চ পার্টি। মেডিকেল স্টাফরা শুশ্রূষা করছে আহত মেকানিকদের। সুযোগ বুঝে আবার গ্যারাজে ঢুকে পড়েছে উর্বশী, আবারও নেমে এসেছে পাতাল ফ্যাসিলিটির ভিতর। ধারণা করে নিয়েছে, ব্রাঙ্কো ভাবতেও পারবে না ও এখানে ফিরে আসতে পারে।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড কমপ্লেক্সের ভিতর অসংখ্য লুকানোর জায়গা। উর্বশীর পরনে মেকানিকের পোশাক। সহজে এখানে ওখানে ঘুরঘুর করতে পারবে। নীচে নেমে আগের দেখা কিছু দরজা খুলে দেখেছে। সেগুলোর বেশিরভাগই ডরমেটরি। অসংখ্য বাঙ্কার। প্রতিজনের জন্য রয়েছে পর্দার ব্যবস্থা। বিশাল সব লকার রুমের মত ঘর, সেখানে শাওয়ারের ব্যবস্থা। উর্বশীর বুঝতে দেরি হয়নি, এই ফ্যাসিলিটি অন্তত কয়েক শ' মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে। তবে এ মুহূর্তে এক শ'র মত লোক রয়েছে। প্রকাণ্ড একটা ঘরে ক্যাফেটারিয়া। স্টোভের বার্নার পরখ করল উর্বশী। এখানে কিছুই রান্না হয়নি। আলমারির চেয়েও বড় ফ্রিজারগুলোর ভিতর ঠাসা খাবার। একটা স্টোরেজ এরিয়া পেল, ওটার মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত পানির বোতল ও ক্যান ভরা খাবার।

কোল্ড-ওয়ারের সময়ে এ ধরনের ফ্যাসিলিটি তৈরি করেছিল আমেরিকা ও রাশা। এটা যেন ঠিক সেগুলোর মত। একজন মানুষের যা যা লাগতে পারে তার সবই রয়েছে। কী নেই? খাবার, পানি, ইলেকট্রিসিটি! হয়তো খুব আয়েশ করে থাকা চলবে না, তবে যুদ্ধ লাগলে নিশ্চিন্তে কাটবে জীবন। এ ফ্যাসিলিটি নতুন, তৈরি করেছে রেসপন্সিভিস্টরা, কাজেই উর্বশী আন্দাজ করেছে, কোনও ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে চলেছে এরা। ওর মনে পড়ল, রানারা গোল্ড অভ মার্সে কী ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য দেখেছে।

বড় এক ক্যান ভরা মটরশুঁটি খেয়ে দূর করল খিদে, তারপর ওখানে দাঁড়িয়েই দু'বোতল পানি শেষ করল উর্বশী। এরপর বুক ও পেটের আহত অংশ বেঁধে নিল কষে। আধুনিক ডাক্তাররা নাকি বলেন চিড় ধরা হাড় না বাঁধতে; তবে প্লাস্টিক

দিয়ে পাঁজর বেঁধে নেয়ার পর ব্যথা অনেক কমল। খাবার ও পানি ওকে বেশ অনেকটা শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে।

ওভারঅলের গভীর পকেটে আরও দুটো পানির বোতল চালান দিল উর্বশী, তারপর নতুন করে শুরু করল অভিযাত্রা। প্যাঁচালো করিডোরে দু'চারজনের সঙ্গে দেখা হলো। তারা সন্দেহ নিয়ে ওর ক্ষতগুলোর দিকে চাইল। তারপর যখন শুনল সেই পলাতক বন্দি ওর উপর হামলা করেছিল, তখন সান্ত্বনা দিল।

ওকে যেখানে রাখা হয়, তার একতলা উপরে এসে উর্বশী টের পেল, এসব করিডোরে আসে না সাধারণ রেসপন্সিভিস্টরা। বুঝতে দেরি হলো না, এটা অভিজাত এলাকা। সেগুলোর ভিতর একটা করিডোরের এই দু'পাশ আবার সেরা। এখানে মুখোমুখি দুটো দরজার উপর সিকিউরিটি কী-প্যাড। ইলেকট্রনিক্সগুলো এখনও পুরোপুরি বসানো হয়নি। মেঝের উপর ছোট এক টুল ও পাশে টুলবক্স। মনে হয় কোনও জরুরি যন্ত্র লাগবে, তাই আনতে গেছে মিস্ত্রি।

একপাশের দরজা খুলে ঢুকে পড়ল উর্বশী, আগের মত আবারও বন্ধ করে দিল দরজা। মেঝের উপর পুরু সবুজ কার্পেট। দেয়ালে কাঠ ও পাথরের কারুকার্য। বাতাসে এখনও রঙের হালকা গন্ধ। বাতির ফিক্সচার আগের মতই ফ্লুরোসেন্ট, তবে অত্যন্ত দামি। দেয়ালে যে সব ছবি, সব উজ্জ্বল রঙের। সেগুলোর ভিতর রুচির ছাপ নেই যদিও। ডাইনিং ফ্যাসিলিটি নামকরা কোনও রেস্টুরেন্টের মত। দেয়ালে সত্যিকারের জানালার বদলে ফ্ল্যাট-প্যানেল মনিটর। চেয়ারগুলো ভারী, দামি চামড়া দিয়ে মোড়া গদি। বারের উপর অংশ মেহগনি কাঠের।

এই প্রকাণ্ড কমপ্লেক্সে সবই আছে। সেক্রেটারিদের অফিস,

কমিউনিকেশন্স সেণ্টার, জিমনেশিয়াম, সুইমিং পুল—কী নেই। কমিউনিকেশন্স রুমে ঢুকল উর্বশী। চোখ খুঁজতে শুরু করেছে ফোন বা কোনও রেডিও। কিন্তু বদলে অন্য কিছু দেখল। জিনিসটা ঠিক বুঝল না। তবে ধারণা করল, এই ছোট ঘরে ধরা পড়তে পারে। ঠিক করল, পরে আবার চারপাশ খুঁজবে।

বেরিয়ে এল উর্বশী। একপাশে এগজিকিউটিভ উইং। ওখানে যেসব বেডরুম, হার মানাতে পারে ফাইভ-স্টার হোটেলকে। প্রতি বেডরুমে মিনি-বার। বিশাল বেডের পাশে টেবিল, সেখানে ধর্মীয় বই নেই, বদলে লিঙ্ক চ্যাপেলের: *নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনছি আমরা অতিরিক্ত সন্তান জন্ম দিয়ে।* চারপাশে চল্লিশজন থাকবার মত ঘর, ওখানে থাকতে পারবে দম্পতিরাও। এসব বোধহয় রেসপন্সিভিস্টদের সেরা মানুষগুলোর জন্য, ভাবল উর্বশী। নেতা, বোর্ড অভ ডিরেক্টর্স ও বিশাল ধনী লোকেরা এখানে থাকবে। এগজিকিউটিভ উইঙের শেষে আরেকটা সুইট দেখল উর্বশী। ওটা বোধহয় ডিয়েটস কেসলার ও তার স্ত্রীর জন্য। ওটার ভিতর অংশ অন্য যে-কোনও সুইটের চেয়ে অনেক বেশি বিলাসবহুল। শুধু বাথরুমই সাধারণ স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টের চেয়ে বড়। বাথটাব দেখে মনে হলো ওটার ভিতর নামলে সাহায্য চাইতে হবে লাইফগার্ডের।

রাতটা কাটাল উর্বশী ডিয়েটস কেসলার ও তার স্ত্রীর বিছানায়। সকালে উঠে তাদের কারও একজনের জন্য রাখা টুথব্রাশ দিয়ে মেজে নিল দাঁত। তবে কুলি করতে গিয়ে চমকে উঠতে হলো। লিভিংরুম থেকে শুনতে পেল মানুষের কণ্ঠ। গলার আওয়াজই বলে দিল বিশ্রী ইংরেজিতে কী যেন বলছে ব্রাঙ্কো। তারপর আরেকজন কথা বলে উঠল। মসৃণ ভাবে ইংরেজি বলে। এ বোধহয় ডিয়েটস কেসলার। তারপর শোনা

গেল তৃতীয় কণ্ঠ। এবার আরেকবার চমকে উঠল উর্বশী। আরে! এ লোক তো সেই লিয়োনার্দো চার্চ, সেই ডিপ্রোগ্রামার!

কথাগুলো কান পেতে শুনতে লাগল উর্বশী। একের পর এক তথ্য ওর ভিত কাঁপিয়ে দিল। লিয়োনার্দো চার্চ আসলে লিঙ্ক চ্যাপেল। সাধারণ একটা কৌশল, কিন্তু কাজে লেগেছে—মনে মনে বলল উর্বশী। বুঝতে পারছে এই লোকগুলো যা বলছে সেসব বিশ্বাসও করে নিজেরা। ওদের একটা ধর্ম আছে, আছে পথ দেখানোর মত নেতা, প্রচুর অনুগত কর্মী—তাদের যা-ই নির্দেশ দেওয়া হোক, বিনা দ্বিধায় পালন করবে।

ক্রিস ক্রিংগলের আত্মহত্যা সম্বন্ধে বলল ডিয়েটস কেসলার। উর্বশী বুঝে নিল লোকটাকে আসলে খুন করেছে ব্রাঙ্কো। এরপর লোকগুলোর ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা শুনে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। ওরা ছেড়ে দেবে ওদের তৈরি করা ভয়ঙ্কর ভাইরাস। দুনিয়ার বেশিরভাগ মানুষকে স্টেরাইল করে দেবে!

সত্যি পারবে, ভাবতে গিয়ে স্বীকার করে নিতে হলো। দুনিয়া জুড়ে বাইয়োঅ্যাটাক হলে সভ্যতা মুখ থুবড়ে পড়ত, কিন্তু ওরা যেটা করতে চলেছে তাতে মানব-সভ্যতা টিকবে। অবশ্য সবচে' ভয়ঙ্কর ভাইরাসটা যদি প্রয়োগ না করে, তা হলেই। এক শ' বা দুই শ' বছরের জন্য পিছিয়ে পড়বে মানবসভ্যতা। তবে শেষে সবাই পাবে বিপুল বিত্ত, সর্বক্ষেত্রে অপরিসীম প্রাচুর্য। ইণ্টারনেটে লিঙ্ক চ্যাপেলের বই পড়েছে। লোকটা লিখেছে: *দারিদ্র্য কোনদিন মুছত না, যদি না আসত কাল মহামারী। অর্ধেক ইউরোপ খালি হয়ে গেল সেই প্লেগের আক্রমণে। ফলে সম্ভব হলো মানুষের জন্য নতুন এক ভবিষ্যতের দুয়ার উন্মোচন।*

ব্যাপারটা এত সহজ নয়, নিজেকে বলল উর্বশী। ওরা যা খুশি করবে, তা হবে না। যদিও মনে মনে জানে, এখন দুনিয়া

জুড়ে চব্বিশ ঘণ্টা তথ্যের চালাচালি চলছে, যানবাহনের উন্নতির ফলে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় চলে যাচ্ছে মানুষ। আর সে কারণেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে মহামারী ও আতঙ্ক। আগামী বিশ বছরের মধ্যেই অনেক হ্রাস পাবে জনসংখ্যা, দ্রুত খালি হয়ে আসবে দুনিয়া। আসলে সুবিধা কাদের হবে? যারা এদের কথা মেনে চলবে, তাদের। তারা বেশিরভাগই হবে শ্বেতাঙ্গ। তারাই পরিচালনা করবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে। বাকিরা থাকবে তাদের দাস হিসাবে।

ওরা সর্বনাশ করতে চাইছে দুনিয়ার সব অশ্বেতাঙ্গ মানুষের। আমারও। রাগে কাঁপতে শুরু করেছে উর্বশী। চ্যাপেল, কেসলার বা ব্রাঙ্কো কোন্ অধিকারে মানবসভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়?

যদি পারত, বাথরুম থেকে বেরিয়ে একাই হত্যা করত উর্বশী ওই লোকগুলোকে। কিন্তু সে সাধ্য ওর নেই। মনকে শান্ত করতে চাইল। মনে মনে বলল, অপেক্ষা- করো, মেয়ে—তোমারও সময় আসবে। ধৈর্য ধরো।

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর বাথরুম থেকে বেরুল উর্বশী, বেরিয়ে এল ওই সুইট থেকে। কাছের এক বেডরুমে ঢুকল, খুঁজে নিল ক্লজিট। আপাতত এটাই ওর আশ্রয়স্থল। চট্ করে কেউ খুঁজে পাবে না। তবে মাথা থেকে দূর করতে পারল না দুশ্চিন্তা। বুক কাঁপছে ওর। লোকগুলো আরও কী করতে চলেছে, কে জানে!

একটা ট্র্যান্সমিটারের কথা বলেছে ওরা। কোঅর্ডিনেট করবে, ছড়িয়ে দেবে ভাইরাস। নিশ্চয়ই সেজন্য রয়েছে কোনও অ্যাকটিভেশন কোড? উর্বশী নিজেই খুঁজে পেল ওর ধারণাতে ভুলটা কোথায়। এরিয়াল ব্রডকাস্ট হলে, তা যতই হোক না শর্টওয়েভ, কেউ না কেউ শুনবে। তা হলে তাদের নিরাপত্তা

বলতে কিছুই থাকবে না। অনেক বেশি ঝুঁকি। নানান বাধা পড়বে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে ব্রডকাস্ট করা না-ও যেতে পারে। ঠিক ওই সময়ে থাকতে পারে সানস্পট। সিগনাল ফেইলিয়ার হতে পারে।

না, শর্টওয়েভ হতে পারে না।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড সাববেসমেন্টের কথা মনে পড়ল উর্বশীর। ওখানে রয়েছে পুরু তামার তার। কোথায় গেছে সেসব? তারের ভিতর দিয়ে বইয়ে দেয়া যেতে পারে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ।

বিড়বিড় করে বলল উর্বশী, 'তোমরা ইএলএফ অ্যান্টেনা তৈরি করেছ।' ওর জানা হয়ে গেল কী করে সতর্ক করবে রানাকে।

অপেক্ষা করে রইল উর্বশী। আগে ইএলএফ অ্যান্টেনা টেস্ট করুক ব্রাঙ্কো। রাত গভীর হওয়ার পর সাবধানে আবার বেরুল উর্বশী।-পা টিপে চলে এল কমিউনিকেশন্স রুমে। প্রথমে এ ঘরকে তাই ভেবেছিল। ট্র্যান্সমিটার কীভাবে ব্যবহার করা হয় তা বুঝতে দীর্ঘ বিশ মিনিট সময় লাগল। ফাইন-টিউন করে নিল ফ্রিকোয়েন্সি, তারপর তথ্য দিতে শুরু করল:

দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস আমি উর্বশী এরা ভাইরাস আক্রমণ করতে চলেছে কেবল পঞ্চাশটা ক্রুজ শিপে খুন নয় দুনিয়া জুড়ে আরও খারাপ কিছু শীঘ্রি যেভাবে হোক এখানে নিউক ফেলতে হবে > হাতে সময় বাহাত্তর ঘণ্টা

যদি পারত, উর্বশী জানিয়ে দিত কোথায় রয়েছে এই ট্র্যান্সমিটার, কিন্তু ওর কাছে সে তথ্য নেই। মনে মনে আশা করল, এই সিগনাল ট্রেস করবে আতাসি। ইচ্ছে করে লিখেছে নিউক্লিয়ার বোমার কথা। ওর ধারণা, এটা সাধারণ বাঙ্কার নয়। ধ্বংস করতে হলে ফেলতে হবে আণবিক বোমা। নিজে মরতে

রাজি, তবুও ওই পিশাচগুলো যেন দুনিয়ার উপর নরক নামিয়ে আনতে না পারে। ও জানে না, রানার পক্ষে নিউক্লিয়ার বোমার ব্যবস্থা করা সম্ভব কি না। তবে কী প্রয়োজন সেটা রানাকে জানানো ওর কর্তব্য। রানা যদি না পারে তা হলে...

নিজ আস্তানার ভিতর গিয়ে ঢুকল উর্বশী; কয়েকটা প্রোটিন-বার শেষ করে মিনি-বার থেকে নিল বিয়ার। খাওয়া হলে আবার ঢুকে পড়ল ক্লজিটের ভিতর। ও জানে, দ্রুত এগিয়ে আসছে রেসপন্সিভিস্টদের আক্রমণ-দিবস, সুতরাং ব্রাঙ্কোকে নির্দেশ দেবে ডিয়েটস কেসলার—এই ফ্যাসিলিটির প্রবেশপথে থাকবে প্রহরী। ওই পথে বেরুনো অসম্ভব। অন্য কোনও উপায় খুঁজতে হবে। সেজন্য হাতে সময় মাত্র তিনদিন।

অফিসে বসেছে ডিয়েটস কেসলার, সঙ্গে লিঙ্ক চ্যাপেল। জমে উঠেছে আলাপ, এমন সময়ে কে যেন নক করল দরজার উপর। চট্ করে ডেস্ক থেকে চশমা তুলে নিল ডিয়েটস, লুকিয়ে ফেলল। কিছুদিন হলো বাধ্য হয়ে ব্যবহার করতে হয় চশমা। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়েছে ব্রাঙ্কো। চেহারা তার সবসময়ই গম্ভীর থাকে, তবে এই মুহূর্তে মনে হলো কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে।

যাই ঘটে থাকুক, তা খারাপ কিছু, বুঝে নিল কেসলার। জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?'

'টিভি নিউজে দেখলাম, ইস্তাম্বুলে ক্রুজ শিপ পার্ল অভ মুনে একজন মানুষ মারা গেছে। আমাদের নিজেদের লোক। চাক গুণ্ডারসন।'

'ওকেই তো দলের নেতা করে পাঠানো হয়েছিল, ঠিক?'

'জী, স্যর।'

'বিস্তারিত কিছু জানা গেছে?' জানতে চাইল চ্যাপেল।

'শুধু জানি এইট্রিয়ামের ব্যালকনি থেকে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে।'

'দুর্ঘটনা?'

'খবরে তা-ই বলছে। তবে আমি বিশ্বাস করি না। অতি কো-ইনসিডেন্স। একেবারে টিম লিডারকেই মরতে হবে?'

'তোমার ধারণা যারা অমল দাশা কিডন্যাপিঙের পিছনে ছিল, তারাই এ কাজ করেছে?' কেসলারের কণ্ঠে ব্যঙ্গের আভাস। 'তুমি বেশি বেশি ভাবছ, ব্রাঙ্কো। দুটো বিষয় এক সুতোয় গাঁথা না-ও হতে পারে।'

'আরও আছে,' আড়ষ্ট স্বরে বলল ব্রাঙ্কো। 'এইমাত্র ফিলিপিন্স থেকে আমাদের টিম যোগাযোগ করেছে। জানিয়েছে দু'জন লোক নাকি ভাইরাস ফ্যাক্টরির ভিতর ঢুকে পড়েছিল, আবিষ্কার করে ফেলেছে জাপানিদের গোরস্তান। সাধারণ কোনও টুরিস্ট না। গোলাগুলি হয়। আমাদের অন্তত দুজন মারা গেছে। গুহার ছাত ধসে পড়ায় ওরাও ভেতরে আটকা পড়েছে। কারা ওরা? কী মনে করে ঠিক ওখানেই গিয়ে হাজির হলো লোক দুজন? এসব ভাবনার বিষয় নয়, স্যর?'

থুতনির ভাঁজে আঙুল রাখল কেসলার। 'ঠিক আছে, বুঝলাম ওরা মাটি খুঁড়ছে। তবে কী করে জানবে ওখানে আমাদের ফ্যাসিলিটি ছিল? জানি না তারা কীভাবে টের পেল ওখানে জাপানিজ সুড়ঙ্গ আছে। তবে যা-ই হোক, এখন আর কিছুই যায় আসে না। আটকা পড়ে থাকলে এতক্ষণে মারা পড়েছে তারা। তা ছাড়া, আমরা পিছনে কিছুই রেখে আসিনি। কেউ সন্দেহ করবে না আমাদের। আর করলেই বা কী? আমাদের কাজ তো প্রায় শেষ।'

'আমার ভাল লাগছে না, ডিয়েটস,' বলল চ্যাপেল। একটু

ঝুঁকে এসেছে। 'এসবের ওপর বহু কিছু নির্ভর করছে। তা ছাড়া, আমি কো-ইনসিডেন্সে বিশ্বাস করি না। শুধু যদি অমল দাশার কিডন্যাপিঙের ফলে তোমাকে হুমকি দেয়া না হতো, আমি ভাবতাম না। কিন্তু এখন একইসঙ্গে দুটো কো-ইনসিডেন্স ঘটেছে। আমাদের দুজন লোককে খুন করে ফিলিপিন্স ফ্যাসিলিটির ভিতর লোক ঢুকেছে, ইস্তাম্বুলে মারা গেছে চাক গুণ্ডারসন। আমার ধারণা, অলরেডি একদল লোক ভালমতই আমাদের পিছনে লেগে গেছে।'

'তা যদি হতো, তা হলে এতক্ষণে ক্যালিফোর্নিয়ার হেডকোয়ার্টারে হামলা করত এফবিআই, চাপ তৈরি করত এথেন্সের ফ্যাসিলিটির উপর।'

রেসপন্সিভিস্টদের সর্বোচ্চ নেতা চুপ করে রইল। কথা ঠিকই বলেছে কেসলার।

'এরা যদি উর্বশী দাশার ভাড়া করা কোম্পানি হয়ে থাকে?' বলল জ্যারোন। 'যাদের দিয়ে ভাইকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে? হতে পারে তারা তদন্ত করছে। আমাদের ভিতরের খবর খুঁজছে। ভাবছে, একইসঙ্গে ওই দুই ভাই-বোনকে উদ্ধার করবে।'

ধীরে মাথা দোলাল লিঙ্ক চ্যাপেল। 'ঠিক তা-ই মনে হচ্ছে। তা হলে হিসাব মিলে যায়।'

'তার মানে আপনি মনে করেন ওরা আমাদের প্ল্যান সম্পর্কে কিছুই জানে না?' জানতে চাইল ডিয়েটস।

'হতে পারে,' বলল ব্রাঙ্কো, 'আর তারা যদি চাক গুণ্ডারসনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকে, সবই জেনে গেছে। সেক্ষেত্রে এতক্ষণে হামলার পরিকল্পনা করছে।'

'এই পরিস্থিতিতে কী করতে বলো, জ্যারোন?'

'আমি চাই পার্ল অভ মুনে গিয়ে উঠতে। কোনও অবস্থাতেই

ওদেরকে ভাইরাস খুঁজে পেতে দেয়া যাবে না। ওটা যদি পেয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে কর্তৃপক্ষের হাতে। কাজে লেগে যাবে একদল বিজ্ঞানী, হয়তো সিম্পটম থেকে বের করে ফেলবে টিকা। আমি ওখানে যাওয়ার পর চাইব সম্পূর্ণ কমিউনিকেশন ব্ল্যাকআউট। কোনও যাত্রী যেন ইন্টারনেট ব্যবহার বা শিপ-টু-শোর কল করতে না পারে। সেক্ষেত্রে ওই দলের লোকগুলো তাদের বড় অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না।'

'ওই জাহাজ এখন কোন দিকে চলেছে?'

'ইস্তাম্বুল থেকে ক্রিটের আর্কলিয়োনে। ওটা গ্রিক দ্বীপগুলোর কাছে এলেই আমি উঠতে পারব।'

এ সংগঠনের বাইরের খুব কম লোক জানে ওই জাহাজ কোম্পানির মালিক একজন রেসপন্সিভিস্ট। এ লোক স্ত্রী সহ এই সংগঠনে আসে কারণ ডাক্তাররা জানিয়ে দেন, কখনও তাদের সন্তান হবে না। এরপর তারা যখন চ্যাপেলের বই পড়ল, নিজেদের ভাগ্যকে মেনে নিল। তারও বেশি করল, বিশ্বাস করতে লাগল সন্তান না নেয়া মানুষের অন্যতম কর্তব্য। কোটি কোটি টাকা দান করল তারা এই সংগঠনে। খুব কম রেটে ব্যবহার করতে দিল ক্রুজ শিপগুলো। তবে এই শিপিং মোগল কখনও সর্বোচ্চ নেতাদের ধারে কাছে পৌঁছতে পারেনি। তার জানা নেই, এই জাহাজগুলোকে ব্যবহার করা হবে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়ার জন্য।

'আপনি ওই লাইন্সের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলুন,' বলল ব্রাঙ্কো। 'বলা যেতে পারে যে দল তাদের গোল্ড অভ মার্সে হামলা করেছে, সেই একই দল এবার পার্ল অভ মুনে হামলা করতে চলেছে। সে আমাকে জাহাজে উঠতে দিক, সেই সুযোগে

সাগরে থাকতেই ভাইরাস ছড়িয়ে দেব আমরা। এর ফলে আমাদের প্রতিপক্ষ সবই বুঝবে, কিন্তু কাউকে কিছু জানাতে পারবে না।'

'হামলার কথা শুনলে পুরো ক্রুজই বাতিল করে দিতে পারে ওদের প্রেসিডেন্ট,' বলল কেসলার।

'তা হলে তাকে বলুন আমাদের জরুরি কাজে জাহাজে ওঠা দরকার। ওখানে আমাদের পঞ্চাশজন রেসপন্সিভিস্ট আছে। ওদের নিয়ে সার্চ শুরু করতে পারি। হাতে যথেষ্ট লোক থাকায় খুঁজতে সুবিধে হবে। সন্দেহজনক কাউকে পেলেই আটক করব।'

লিঙ্ক চ্যাপেলের দিকে চাইল ডিয়েটস। চাইছে তাদের লিডার, রেসপন্সিভিজমের প্রণেতা কিছু বলুক। লোকটার চোখের দিকে চাইলেই বোঝা যায়, যে-কোনও বিষয়ের অনেক গভীরে গিয়ে চিন্তা করতে পারে মানুষটা। যা মুখ দিয়ে বলে, তার সব নিজে বিশ্বাসও করে।

'ডিয়েটস,' বলল সে. 'আমাদের মানব-জাতি ধ্বংস হতে চলেছে। অসংখ্য ক্ষুধার্ত মুখ হাঁ করে রয়েছে। প্রাকৃতিক সমস্ত উৎস শুকিয়ে এল বলে। তুমি জানো, আমিও জানি, পৃথিবী রক্ষা করতে হলে একমাত্র উপায় এখন জনসংখ্যা কমিয়ে আনা। নইলে শেষ হবে গত সাত হাজার বছরের সভ্যতা। আমরা যা করছি তা সঠিক। যা করতে হবে, তা করতেই হবে। নইলে ফুরিয়ে যাবে সমস্ত সম্ভাবনা। শেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

'পরিকল্পনা থেকে সরে যাওয়া আমি পছন্দ করি না। আমার ধারণা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে জ্যারোন। যেভাবেই হোক, আমাদের প্ল্যান-প্রোগ্রাম কেউ জেনে ফেলেছে। ভাবতে পারো,

আমি আন্দাজে কথা বলছি। কিন্তু এ মুহূর্তে কোনও ঝুঁকি নেয়া চলবে না। আমরা সফলতার খুব কাছে পৌঁছে গেছি। এক সপ্তাহও নেই সব শুরু হতে। ওদের লোক যদি পার্ল অভ মুনে আমাদের ভাইরাস খুঁজতে থাকে, হয়তো পেয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে সব জানিয়ে দেবে ম্যারিটাইম অথোরিটিকে। সবাই জেনে যাবে কীভাবে ছড়িয়ে দেয়া হবে কোন্ ধরনের ভাইরাস। তার মানে সর্বনাশ হবে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনার। এটা কি হতে দেয়া যায়?'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল কেসলার। 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমিই ভুল ভেবেছি। ভাবা উচিত হয়নি যে, কেউ আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। জ্যারোন, আমি ক্রুজ লাইন্সের সঙ্গে কথা বলব। তোমার যা প্রস্তুতি, নিতে শুরু করো। সঙ্গে নাও প্রয়োজনীয় লোক ও ইকুইপমেন্ট। আমি ব্যবস্থা নেব, যাতে ওই জাহাজের ক্যাপ্টেন তোমার নির্দেশ মত চলে। তবে একটা কথা মনে রেখো: ওই ভাইরাস যেন জাহাজ থেকে সরিয়ে না নেয়া হয়। প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

'জী, স্যর। প্রয়োজনে কঠোরতম ব্যবস্থা নেব।'

'তোমরা টের পাচ্ছ না?' বলল চ্যাপেল। প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে চাইল দুই রেসপন্সিভিস্ট। আশ্চর্য একটা ভাবের ঘোর এসে ভর করেছে চ্যাপেলের মধ্যে। বক্তৃতার ঢঙে বলে চলল, 'আমরা এখানে কালো শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে নেমেছি। ওটা আমাদের ডিমেনশনাল মেমব্রেন থেকে অনেক দূরের কিছু। এরা হাজার বছর ধরে মানুষকে একটু একটু করে বদলে অমানুষ বানিয়ে দিয়েছে। মানুষ হয়ে উঠেছে ধ্বংসাত্মক। আমরা জানোয়ার হয়ে উঠেছি। এইসব শক্তি আজ আমাদের মানবতাকে

এ অবস্থায় টেনে এনেছে। আমরা নিজেরা নিজেদের শেষ করতে চলেছি। তবে এখন আমরা পাল্টা ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছি। নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছি নিজেদের হাতে। আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমি পরিষ্কার এটা অনুভব করি। ওরা ভীষণ হতাশ হবে, ওদের বুঝতে হবে, আর আমাদের উপর কর্তৃত্ব করা চলবে না।

'আমরা যখন সফল হব, ওরা মুঠোর মধ্যে আমাদের রাখতে পারবে না। আমরা নতুন এক পৃথিবী তৈরি করব। আর কিছু আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। অচেনা ওই কালো শক্তি আর কখনও অদৃশ্য শেকল পরাতে পারবে না আমাদের হাতে-পায়ে। তোমরা তো জানো, বেশির ভাগ মানুষ বোঝে না কী ক্রীতদাসত্ব বরণ করেছে। এজন্য আমরা বহু কষ্ট সহ্য করেছি। ওরা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করেছে আমাদের সহজাত আচরণের ফলে। আর আজ দেখো সেসব আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধার কষ্ট, বাড়তি চাহিদা। এগুলো দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে মেমব্রেন আমাদের শত শত বছর ধরে। আর আজ আমরা সেই শেকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

'শেষ পর্যন্ত আমি যখন বুঝলাম, কোনও সভ্য-সমাজ এ ভাবে বাঁচতে পারে না; টের পেলাম আমরা নিজেরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেই। এসবই ঘটছে কারণ বাইরের ইউনিভার্স থেকে আসছে এরা। এরা আমাদের মস্তিষ্ক দখল করে, ভাবনা-চিন্তা সব নিয়ে যায় খারাপ দিকে। আর সে চিন্তাগুলো আজ আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে? আমিই প্রথম মানব, যে দেখতে পেল ওইসব প্রাণী আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে। আমার কথা শুনে তোমাদের মত চিন্তাশীল মানুষ বুঝল: পৃথিবী এমন হওয়ার কথা নয়, অথচ নীতিহীন এই বিশ্বে একের পর এক চরম অন্যায় ঘটে

চলেছে। এর মূল কারণ এরা ষড়যন্ত্র করে চলেছে আমাদের বিরুদ্ধে।

'এরা প্রায় সফল হতে চলেছে, এমন সময় বাধা দিতে শুরু করলাম আমরা। এরপর যা ঘটতে চলেছে সেটার উপর আর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না তাদের। আমাদের সমাজ বদলে যেতে চলেছে। আমরা সঠিক পথ বেছে নিয়েছি। আমরা জেনে গেছি আমাদের ধ্বংস করতে চায় তারা। কাজেই ব্যবস্থা নেব আমরা। তোমাদের শুধু এটুকু বলব, আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় উত্তেজি· বিশাল এক উত্থান সামনে। আর সেই উত্থানের সময় আমরা সবাই পরস্পরের হাতে হাত রেখে এগুব।'

চ্যাপেলের এই মগজ দখল করে নেয়ার গল্প সব সময় ব্রাঙ্কোকে অস্বস্তির ভিতর ফেলে। তবে কখনও প্রতিবাদ করে না। কারণ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, পৃথিবী জুড়ে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। বিশেষ করে কালো মানুষদের সংখ্যা। প্রাকৃতিক সম্পদ শেষ হতে চলেছে। ফলাফল: মানব সভ্যতা বিনষ্ট হবে। এগুলো সে ভালই বোঝে। এবং বোঝে বলেই বিশ্বের মানুষকে রক্ষা করতে চাইছে। এটা তো ঠিক, এখনই পদক্ষেপ নেয়ার সঠিক সময়। এজন্যই সে নিজে একাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তার প্রথম কাজ এখন শত্রুদের শেষ করা। আর সেই শত্রুদের এক অংশ রয়েছে পার্ল অভ মুন জাহাজে।

দশ

দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস।

অপারেশন্স সেন্টারে নিজের সিটে বসেছে রানা, মনোযোগ দিয়ে শুনছে আতাসির বক্তব্য। রুমে উপস্থিত ফু-চুং, গগল, অনিল, ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ, জলিল খান ও আরও ক'জন কমাণ্ডো। অনিলের সহায়তা নিয়ে প্রায় অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটিয়েছে আতাসি।

'ম্যাডাম উর্বশী যখন ব্রডকাস্ট করছেন, সে-সময়ে আমার পরিচিত ক'জন অ্যামেচার রেডিও কমিউনিকেশন এক্সপার্টের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারা ম্যাডাম উর্বশীর ফ্রিকোয়েন্সিতে নিজেদের রেডিও টিউন করে। আমি তাদের জিপিএস স্যাটালাইট ব্যবহার করতে দিই। আমরা ছিলাম এক শ' ভাগ সিনক্রোনাইযড। প্রতিটি অক্ষর যখন এল, আমি তাদের লিখে নিতে দিলাম। ফলে জানা গেল ঠিক কোন্ সময়ে তথ্য এল। আপনি তো জানেন, বস, বিভিন্ন বস্তুর ভিতর দিয়ে বিভিন্ন গতিতে বইছে রেডিও ওয়েভ। ...একটু আগে ও পরের সময় আন্দাজ করে নিয়ে হিসাব কষতে হয়েছে। এ বিষয়ে সাহায্যে এলেন মিস্টার অনিল। উনি কম্পিউট করে বললেন কী ডিসক্রেপেনসি হতে পারে। এ কারণে আমরা সঠিক সময় ও দূরত্ব হিসাব কষতে পারলাম। বেরিয়ে এল একটা ত্রিকোণ

ভূমি। তারই ভিতর ওই ট্র্যান্সমিটার থাকতে বাধ্য।'

কম্পিউটারের কী বোর্ডে টাইপ করল আতাসি, এবার বিশাল প্রধান মনিটরে ফুটে উঠল বিরান এক দ্বীপ। দেখতে ওটা অশ্রুর ফোঁটার মত। টিলা দিয়ে ঘেরা চারপাশ। দক্ষিণে পাথুরে সৈকত, তবে ওদিক দিয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব। ক্রমে উপরের দিকে গেছে জমিন, মিশেছে গিয়ে আরও উঁচু টিলার সঙ্গে। ওখানে সর্বক্ষণ বইছে জোরালো হাওয়া। গাছপালা নেই বললেই চলে। দু'চারটে আঁকাবাঁকা হয়ে কোনমতে টিকতে চাইছে। দু'চার জায়গায় ঘাসের চাপড়া। ব্যস, এ-ই। ছবির নীচের স্কেলে লেখা: আট মাইল দীর্ঘ। চওড়ায় দুই মাইল।

'এটাই ইয়োস আইল্যাণ্ড। তুরস্ক থেকে চার মাইল দূরে ম্যাণ্ডালে গালফে। কয়েক শতাব্দী ধরে ওটার উপর দাবি জানিয়ে আসছে গ্রিস ও তুরস্ক। তবে কেন যে চাইছে তা বুঝবার সাধ্য কারও নেই। কিছুই নেই ওখানে। জিয়োলোজিকালি ওটা প্রি-ক্যামব্রিয়ান বেডরক ছাড়া কিছুই নয়। অ্যাক্টিভ ভলক্যানিক জোন। বেশির ভাগ সময় থাকে না কেউ। এই ছবি চার বছর আগে তোলা হয়েছে।'

উর্বশী ওখানে বন্দি? দ্বীপের দিকে চেয়ে রইল রানা। এবার কাজে নামতে হবে। মার্ভেলের প্রচণ্ড গতি কাজে লাগিয়ে চলে যেতে পারে ওরা ওই দ্বীপে।

স্ক্রিনে অন্য ছবি তুলেছে আতাসি। 'এটা ইয়োস দ্বীপের গত বছরের ছবি।'

দ্বীপের দক্ষিণে বিশাল কয়েকটা হলুদ যন্ত্র মাটি সরাচ্ছে। খোঁড়া হচ্ছে বিশাল এক গর্ত। পাশেই তৈরি করা হয়েছে সিমেণ্ট প্লাণ্ট। সৈকতের আগে থেকে শুরু করে সাগর পর্যন্ত গেছে একটা ডক। ওখান থেকে উপরের সাইটে গিয়ে মিশেছে একটা

রাস্তা।

'এ কাজ করে ইটালিয়ান এক হেভি-কনস্ট্রাকশান কোম্পনি। তাদের টাকা পরিশোধ করা হয় কয়েকটা সুইস নাম্বার্ড ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে। আন্দাজ করা যায় কে টাকা দেয়। টার্কিশ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় ওখানে বিশাল এক মুভি সেট তৈরি করা হবে।'

আরেকটা ছবি দেখা গেল। 'সাইটের কয়েক মাস পরের ছবি। দেখছেন গর্তের ভিতর কংক্রিট স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে।'

'এক্সকেভেশন ইকুইপমেন্টের দৈর্ঘ্য আমরা জানি,' বলে উঠল অনিল। 'সেই হিসেবে ফ্যাসিলিটির ফুটপ্রিণ্ট কম-বেশি পঞ্চাশ হাজার স্কয়্যার ফিট। ছবিতে দেখা যাচ্ছে নির্মাণের এই পর্যায়ে ওখানে তিনতলা তৈরি করা হয়েছে।'

আবার শুরু করল আতাসি, 'আট মাস কাজ চালাবার পর নকল মুভি কোম্পানি জানিয়ে দিল, তাদের ফাণ্ড শেষ। কাজেই প্রজেক্ট বাতিল করতে হয়েছে। তুরস্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের চুক্তি হয়: দ্বীপ যেমন ছিল ঠিক তেমনি অবস্থায় রেখে যেতে হবে। কাজেই নকল মুভি কোম্পানি কী করল দেখুন।'

অন্য ছবি ভেসে উঠল মেইন মনিটরে। প্রকাণ্ড এক্সকেভেশন কর্ম হারিয়ে গেছে। মনে হলো আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনই রয়েছে দ্বীপ। মালপত্র, যন্ত্রপাতি যা ছিল সব সরিয়ে নেয়া হয়েছে। বুজিয়ে দেয়া হয়েছে গহ্বর। এখন ঠিক আগের মতই চারপাশে প্রাকৃতিক পাথর। শুধু রয়ে গেছে ডক ও সেই রাস্তাটা। সড়ক দেখলে মনে হয় ওটার কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মাঝপথে এসে ভুলে গেছে কোথায় যাচ্ছিল।

'এটা অফিশিয়াল টার্কিশ গভর্নমেন্টের এনভায়ার্নমেণ্টাল-ইমপ্যাক্ট রিপোর্ট,' বলল আতাসি। 'আন্দাজ করা যায় তাদের

মোটা অংকের ঘুষ দেয়া হয়। রিপোর্টে বলা হয়ঃ ইয়োস দ্বীপ ঠিক আগের মত করেই রেখে গেছে মুভি কোম্পানি।'

'ইএলএফ অ্যান্টেনা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'আণ্ডারগ্রাউণ্ড বাঙ্কারের নীচে,' বলল অনিল। 'সে কারণে উর্বশী লিখেছেঃ বাঙ্কারে ফেলতে হবে নিউক্লিয়ার বোমা। বোমা লেখেনি, যেন ট্র্যান্সমিশনে বাড়তি সময় না লাগে। লিখেছেঃ নিউক।'

'এয়ারফোর্স যেসব বাঙ্কার-বাস্টার বোমা ব্যবহার করে, সেগুলো ফেললে?' জানতে চাইল সোহেল।

'কাজ হবে, সরাসরি অ্যান্টেনা বা পাওয়ার জেনারেটারের উপর ফেলতে পারলে,' বলল রানা। 'তবে সে বোমা আমাদের হাতে নেই।'

'সোজা কথায়, দু' শ' টন টিএনটি লাগবে, নইলে কিছুই করা যাবে না,' বলল কট্টর গগল।

'একমাত্র উপায় কমাণ্ডো রেইড,' বলল ফু-চুং। অপারেশন্স সেন্টারের পিছন দিক থেকে সামনে চলে এসেছে। 'দক্ষিণের ওই সৈকতে নামতে পারি। তা যদি করতে না চাই, বাইরের দিকের কোনও টিলা বেয়ে উঠতে হবে।'

'মিশন সফল হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নিল্,' বলল অনিল। 'ধরে নেয়া যায় ওই ফ্যাসিলিটির প্রবেশপথে কড়া পাহারা থাকবে। আক্রমণ করলে সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ডিফেন্স ফোর্স বন্ধ করে দেবে পথ। বাঙ্কের ভিতর রাখা হবে একের পর এক ব্যারিকেড।'

'কাজেই পিছন-দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে,' বলল রানা। 'ওখানে নিশ্চয়ই ভেন্টিলেশন সিস্টেমের জন্য এয়ার ইনটেক থাকবে। ভিতরের পাওয়ার প্লান্টের জন্য থাকবে এগযস্ট ভেন্ট।'

'আমার ধারণা ওগুলো রয়েছে ডকের নীচে,' বলল সোহেল।

আতাসির দিকে ইশারা করল অনিল। কয়েক সেকেণ্ড পর আবার স্ক্রিনে এল প্রথম কনস্ট্রাকশান ছবি। 'ওরা তখনও সড়ক তৈরি করছে।'

ছবিটা জুম করে আরও বড় করল আতাসি। ওখানে একটা পেভিং মেশিন অ্যাসফল্ট পেতে চলেছে। মেশিনের ঠিক সামনের পথ সমান করছে গ্রেডাররা। আরেকটু এগুলে দেখা যায় এক্সকেভেটারগুলো গভীর এক ট্রেঞ্চ বুজিয়ে চলেছে।

'রাস্তা যেদিক দিয়ে গেছে, তার তলা দিয়ে গেছে ভেণ্ট পাইপ,' বলল অনিল। 'পরে আবার তার উপর অ্যাসফল্ট ফেলা হয়েছে। আমাদের আন্দাজ করে নিতে হবে, ওসব ইনটেক বা ভেণ্ট পাহারা দেয়া হয়। প্রথম আক্রমণে বন্ধ হবে ফ্যাসিলিটির সব কিছু। কোনও কণ্ডুইট দিয়ে এগুতে পারবে কমাণ্ডো টিম, ভিতরে ঢুকলে ফাঁদে পড়তে হবে।'

একবার সোহেল ও ফু-চুঙের দিকে চাইল রানা। আস্তে করে মাথা দোলাল ওরা।

'একটা ভুল মানে মৃত্যু টেনে আনা,' ফু-চুং বলল, 'তা ছাড়া, আমরা যদি ভিতরে ঢুকেও পড়ি, সামনে এগুতে হবে ফ্ল্যাশ লাইটের আলো ফেলে। শত্রুপক্ষ আমাদের দেখবে, আর পাখির মত গুলি করে মারবে।'

'অন্য কোনও অপশন?' জানতে চাইল রানা।

'নেই।' কিছুক্ষণ পর বলল অনিল। 'ফু-চুং ঠিকই বলেছে। ওই ফ্যাসিলিটি আমরা চিনি না। ওটার সিকিউরিটি সিস্টেম কী, গার্ড ক'জন—এরকম এক শ' একটা বিষয় না জেনে ভিতরে ঢোকা আর নিজেদের মরণ ডেকে আনা এক কথা।'

নীরবতা নেমে এল অপারেশন্স সেণ্টারে।

'বলতে খারাপ লাগছে, তবে আমাদের প্রথম কাজ ওই ইএলএফ ট্র্যান্সমিটার নীরব করে দেয়া,' কিছুক্ষণ পর বলল সোহেল। 'ওটার কারণে একই সঙ্গে সিগনাল পাবে গোটা দুনিয়া জুড়ে ক্রুজ শিপগুলো। ফলাফল, ভয়াবহ ভাইরাস আক্রমণ।'

'হ্যাঁ, প্রথম কাজ ইএলএফ ট্র্যান্সমিটার শেষ করা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'কারও কোনও সাজেশন?'

কথা বলছে না কেউ। টিকটিক আওয়াজ তুলছে দেয়াল ঘড়ি। মৃদু গুঞ্জন করছে কম্পিউটার।

'একটা কথা,' কিছুক্ষণ পর বলল সোহেল। 'আর উপায় নেই রে, এখন দরকার ইজরায়েলের তৈরি জিব্রাইলের মুষ্টি। তুই ওটার ব্যাপারে জানিস, রানা।'

যেন ঝাঁকি খেল রানা। আস্তে করে হেলান দিল সিটে। 'ওটার কথা মনে আছে তোর?'

'মনে থাকত না, কিন্তু আর্মস ডিলার ব্যালফোর জেনকিন্স ও প্রিন্স ইবনে আল-কাশিম ওটার কথা তোলায় চট্ করে একবার কম্পিউটারে চোখ বুলিয়ে নিলাম।'

এসব তথ্য রানার কম্পিউটারেও আছে। তবে এখনও পড়বার সময় হয়নি। তা ছাড়া পড়বার কথাও নয়, ওগুলো যাবে বিসিআই হেডকোয়ার্টারে। বস্ ঠিক করবেন কী করতে হবে। ওদের বলা হয়েছে শুধু কান পেতে শুনতে।

'ব্যালফোর জেনকিন্স জিব্রাইলের মুষ্টির ব্যাপারে কী বলে?' জিজ্ঞেস করল অনিল। 'এ নিয়ে আমিও সামান্য রিসার্চ করেছি। ওটার ব্যাপারে কী জানিস বল তো, রানা।'

'তোদের ধারণা ওটা কাজে লাগতে পারে?' নিচু স্বরে বলল রানা।

'একটু খুলে তো বলবি?' বলল ফু-চুং।

কম্পিউটারে দ্রুত টাইপ করতে শুরু করল রানা। মেইন স্ক্রিনে ফুটে উঠল ছবি ও তথ্য। জিব্রাইলের মুষ্টি একটা স্যাটালাইট। আগে কখনও এমন কিছু পাঠানো হয়নি অরবিটে। রকেটের দেহ চুরুটের মত, তবে পেটের কাছে গোল করে ঘিরে সাজিয়ে রাখা আছে লম্বা পাঁচটা ক্যানিস্টার। প্রতিটি দৈর্ঘ্যে তিরিশ ফুট। সেগুলোর উপর ইজরায়েলি পতাকা আঁকা। অস্ত্রের ডিজাইন আমেরিকান।

'ওটার সত্যিকারের কোড নেম: গ্রীষ্মের আকাশ,' বলল রানা। 'আরেকটা নাম দেয়া হয়: জিব্রাইলের মুষ্টি। দু'হাজার সাত সালে মাউণ্ট সিনাই থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় ওটা অরবিটে।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু কীসের জন্য?' জানতে চাইল গগল।

'ওটা একটা ওবিপি,' বলল রানা। 'অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রোজেক্টাইল। এক কথায় ভয়ানক অস্ত্র। এর কথা ভেবেছে আমেরিকা ও ব্রিটেন, শেষে দেয়া হয় ইজরায়েলকে। ধারণা করা হয়, যুদ্ধ না করে জমি পেতে চাইলে ওদের কাজে লাগবে। ওটার আরেকটা নাম: ঈশ্বরের দণ্ড। থিওরি খুব সহজ। এসব টিউবের ভিতর রয়েছে টাংস্টেনের রড। প্রতিটির ওজন আঠারো শ' পাউণ্ড। যদি ফায়ার করা হয়, অ্যাটমসফিয়ারের ভিতর দিয়ে পড়বে। যে এলাকায় তাক করা হবে, সে এলাকা বিধ্বস্ত হবে। নেমে আসবার সময় প্রতি ঘণ্টায় আঠারো হাজার মাইল গতি তুলবে। ওটার ম্যাস বহু গুণ হওয়ায় তৈরি হবে কাইনেটিক ফোর্স। তা অ্যাটমিক বোমার শক্তির চেয়েও অনেক বেশি। কোথাও কোনও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। আক্রান্তদের নিজেদের রক্ষা করার উপায় নেই। ওটা কোনও সাধারণ ব্যালিস্টিক মিসাইল নয় যে ধ্বংস করা যায়। কেউ উপরে তাকালে দেখবে ঝলমলে আকাশে জ্বলে উঠেছে অতি-উজ্জ্বল

তারা। পরক্ষণে নেমে আসবে নরক। সতর্ক হওয়ার উপায় নেই, ব্যর্থ হবে না টার্গেট।

'ইজরায়েল ওটাকে ফার্স্ট-স্ট্রাইক ওয়েপন হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছে। একই লঞ্জিটিউডাল অ্যাক্সেসে বেশ কিছু মিডল ইস্ট শহরকে টার্গেট করে। দোষ দেয়া যেত বিদঘুটে উল্কার উপর। কোনও রেডিওঅ্যাকটিভ ফলআউট হতো না। ইমপ্যাক্টের ফলে বাষ্পায়িত হতো রডগুলো। কেউ ধারণা করতে পারত না কী ঘটেছে। তাদের হাতে ছিল অ্যাসট্রোনমারদের তোলা মিটিওর শাওয়ারের ছবি। টিভিতে দেখিয়ে দিত আসলে কী ঘটেছে। ততক্ষণে মধ্য-প্রাচ্যের পাঁচটি শহর ও তার আশপাশের বিশ মাইল এলাকা শেষ।'

'মনে হয় তুই জানিস কেন ওরা সফল হলো না?' বন্ধুর দিকে চাইল ফু-চুং।

'একটা মিশন নিয়ে ইজরায়েলের মাউন্ট সিনাই কসমোড্রোমে ঢোকে রানা,' চাপা গর্ব প্রকাশ পেল সোহেলের কণ্ঠে। 'ওই এনার্জি রকেট লঞ্চ হওয়ার এক সপ্তাহ আগে। ইজরায়েলিদের কম্পিউটারগুলো স্যাবোটাজ করে। এমন ভাবে স্যাটালাইট রিগ করে যে পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য আর সিগনাল পাঠানো যায়নি। ওই অস্ত্র ব্যবহার করতে চাইলে অ্যাটমসফিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজটা করতে হবে।'

'প্যাডের উপর নষ্ট করে দিলে হতো,' বলল অনিল।

'তা হলে আবার তৈরি করে নিত। তা ছাড়া, ওটা ছিল ম্যানড্ মিশন। দুই কসমোনট ম্যানুয়ালি সোনার প্যানেল ডিপ্লয় করবে। তবে তিনদিন পর আবিষ্কার করল তাদের পাখি স্যাবোটাজ করা হয়েছে।'

'আর পৃথিবী থেকে সিগনাল দিলে?' বলল আতাসি।

'ওদের ইলেকট্রনিকস সে চাপ নিতে পারবে না, জ্বলে যাবে।'

'আমেরিকান কোনও স্যাটালাইট দিয়ে সিগনাল দিলে?' বলল অনিল।

'ততদিনে ইজরায়েলিরা জেনে ফেলেছে দুনিয়াময় ফাঁস হয়ে গেছে তাদের পরিকল্পনা। কাজেই ঘুরতে থাকল তাদের উপগ্রহ।'

'ওটা এখনও কাজ করবে?' জানতে চাইল সোহেল।

'মহাকাশের জঞ্জাল ওটাকে বিধ্বস্ত না করলে, ভাল ভাবেই করবে,' বলল রানা। বুকের ভিতর উত্তেজনা টের পেল। 'সবাই মিলে কিন্তু আবিষ্কার করে ফেলেছে আণবিক বোমার বদলে কী কাজে লাগানো যায়। আমরা যদি স্পেসের ষাট মাইল উপরে ট্র্যান্সমিটার নিই, সহজেই ব্যবহার করতে পারি ওই স্যাটালাইট।'

'অবশ্য আপনি যদি ব্যালফোর জেনকিন্সের কাছ থেকে কোড নিতে পারেন...' কী-বোর্ডে টাইপ করতে শুরু করেছে আতাসি। আরেকটা ছবি ফুটে উঠল।

'ঠিক,' বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন সিরাজ। 'আমি উঠে যেতে পারি ওই স্যাটালাইটের কাছে।'

সবাই চুপ হয়ে গেছে, রানা ছাড়া। মৃদু হাসছে ও। 'আপনার সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেল, ক্যাপ্টেন সিরাজ। আমি অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে আলাপ করব। আশা করি উনি ব্যবস্থা করে দেবেন আপনার ট্র্যান্সপোর্ট।' ফু-চুং, অনিল আর সোহেলের দিকে পালাক্রমে চাইল রানা। 'তোরা একটা পরিকল্পনা তৈরি কর্। আর্মস ডিলারের কাছ থেকে কোড আদায় করতে হবে। যা করার আজ রাতেই। তারপর বন্দর ছাড়ব আমরা।'

'আমরা চলেছি ইয়োস দ্বীপে?' বলল ফু-চুং।

মাথা দোলাল রানা। মনে মনে বলল, 'আমরা এভাবে মরতে দেব না উর্বশীকে।'

এগারো

আয়নার দিকে চেয়ে রইল রানা। ওর চেহারা কেমন হবে, নিজেও জানে না। মেকআপের উপর আরও মেকআপ চড়িয়ে চলেছে মোফিজ বিল্লাহ্। আয়নার বিরাট এক অংশ দখল করে নিয়েছে বড়সড় ফটো। বারবার প্রিন্সের ছবি দেখছে মেকআপ আর্টিস্ট। দু'ঘণ্টা পর রানার মনে হলো, আশ্চর্য! আমিই তো সেই বদমাশ লোকটা! ওকে সঠিক উইগ পরিয়ে দিয়েছে বিল্লাহ্। গোঁফ-দাড়ি যেন ছিঁড়ে এনেছে প্রিন্সের গাল থেকে।

'আরও কিছু?' জানতে চাইল রানা।

'ওই লোক সবসময় চোখে রে-ব্যান সানগ্লাস রাখে, তাই এত না খাটলেও চলত, কিন্তু ঝুঁকি নিলাম না,' বলল বিল্লাহ্। রানার গলা থেকে সরিয়ে নিল কাগজের কলার। একবার দেখে নিল টুক্সেডো শার্ট। সব ঠিকঠাক। গুড! 'আপনার চেহারা এখন অবিকাল ওই নোংরা প্রিন্সের মত।'

বো টাই ঠিক করে নিল রানা, গায়ে চাপিয়ে নিল সাদা ডিনার জ্যাকেট। বেশির ভাগ লোককে দেখতে ভাল লাগে টুক্স-এ, তবে রানার সিক্স প্যাক অ্যাব-এর উপর পুরু করে সাঁটা

হয়েছে একগাদা প্যাডিং। ফলে ও হয়ে উঠেছে ভোঁড়েল (ভুঁড়িঅলা) প্রিন্স। কোমরে, মেরুদণ্ডের পাশে রেখেছে প্রিয় ওয়ালথার।

'মাসুদ ভাই এখন পেটমোটা সিন কনোরি!' ওঅর্ক রুমের আরেকদিক থেকে বলল জলিল।

'আসলেই তাই,' বলল বিসিআইয়ের নতুন এজেন্ট খোরশেদ নবী।

'চোপ!' প্রিন্সসুলভ হুঙ্কার ছাড়ল রানা। 'ব্যাদ্দোব কোথাকার! তোমরা ঝাড়ুদার-মেথর মানুষ, সবসময় মাথা নিচু করে রাখবে। শাহজাদাদের সামনে একটা কথাও বলবে না—হুজুর যা বলেন শুনবে কেবল।'

জ্যানিটর হিসাবে নেয়া হয়েছে ওদের। সঠিক পোশাক পরিয়ে দেয়ায় জলিল খান ও খোরশেদ নবী হয়ে উঠেছে ক্যাসিনো দ্য মণ্টি কার্লোর কর্মচারী। যে-কোনও সময় লাগতে পারে, কাজেই মোফিজ বিল্লাহ ও তার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট যোগাড় করে রেখেছে শতখানেক ইউনিফর্ম। রাশান জেনারেল থেকে শুরু করে দিল্লির ট্রাফিক পুলিশের ইউনিফর্ম পর্যন্ত রয়েছে তাদের সংগ্রহে। সব ফ্রি সাইজের। প্রয়োজন পড়লে আধ ঘণ্টার ভিতর সরবরাহ করতে পারে যে কাউকে।

জলিল ও নবীর সঙ্গে থাকছে চাকা লাগানো হেভি ডিউটি ট্র্যাশ ক্যান। একহাতে থাকবে মপ বাকেট। সঙ্গে প্লাস্টিকের সাইন, তাতে লেখা: সাবধান! মেঝে পিচ্ছিল!

ডোরওয়েতে দেখা দিল চিফ-বাবুর্চি মোস্তফা আবুল, থমথম করছে মুখ। সুটের উপর পরেছে সাদা অ্যাপ্রন। হাতে সিল করা প্লাস্টিকের কণ্টেইনার। ওটা এমন ভাবে ধরেছে, মনে হয় যেন কেউটে সাপ। সবাইকে দেখে ভীষণ কুঁচকে গেল তার ভুরু।

'আবুল, আপনি জানেন ওটা নকল,' মৃদু হাসল রানা। 'খারাপ লাগার কিছু নেই।'

'স্যর, আমি নিজে বানিয়েছি, কাজেই জানি ওটা একদম আসলের মত।'

'একটু দেখা যাক।'

মোফিজ বিল্লাহ্‌র মেকআপ কাউন্টারের উপর কন্টেইনার রাখল শেফ, ঝট্‌ করে পিছিয়ে গেল এক পা। বোঝা গেল ওটার মুখ খুলতে রাজি নয়। ক্যাপ খুলল রানা, পরক্ষণে নাক সরিয়ে নিল একপাশে। চেঁচিয়ে উঠল, 'ইয়াল্লা!'

'ওরেব্বাপ্‌স্‌! এমন জিনিস আমার টেবিলে?' হায়-হায় করে উঠল মোফিজ বিল্লাহ্‌।

'স্যর বলেছেন নকল বমি চাই, কাজেই খুব যত্ন করে তৈরি করেছি। আর জানা কথাই, ওটা দেখতে যেমন হবে, ঠিক তেমনি হবে সুবাস—ঠিক আসলের মত।'

'হেলেন জিলের জন্য যে মাছ রেঁধেছিলেন, অনেকটা তার মত লাগছে না গন্ধটা,' বলল জলিল খান, খোঁচা দিতে পেরে খুশি। এসে চট্‌ করে বন্ধ করে দিল কন্টেইনারের মুখ। রেখে দিল ওটা মপ বাকেটের ভিতর।

স্কুলের হেডমাস্টার যেমন বজ্জাত ছেলের দিকে তাকান, ঠিক সেভাবে চাইল আবুল। 'মিস্টার খান, আগামী কিছুদিন শুধু রুটি আর পানি পাবেন কিচেন থেকে।'

'আসলে ওই ডিশ সত্যিই ছিল দারুণ,' বড় দ্রুত কথা উল্টাল জলিল। মার্ভেলে জুনিয়ারদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে বাবুর্চি মোস্তফা আবুলের হুমকিকে পাত্তা দেবে না। 'জানতে পারি এটা কী দিয়ে তৈরি?'

'বেস তৈরি হয়েছে পি সুপ দিয়ে, অন্য জিনিসগুলো বলব

না। প্রফেশনাল সিক্রেট।'

'আগে এ জিনিস তৈরি করেছেন?' সন্দেহ নিয়ে চাইল রানা।

'কম বয়সে নেভির এক ডাঁটিয়াল কমাণ্ডারকে দিয়েছিলাম। বেচারা মরতে বসেছিল। গর্ব করে বলত তার পেট লোহা খেয়েও হজম করতে পারে। যেদিন জাহাজে এলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, সেদিন কমাণ্ডারকে খেতে দিলাম। ভাসিয়ে দিল টেবিল। এরপর যা হয়, বহুদিন বেচারা ক্যাপ্টেন হতে পারেনি।'

জোর করে হাসবার চেষ্টা করছে জলিল ও নবী। এই প্রথম এ ধরনের মিশনে চলেছে। টেনশন দূর করতে চাইছে।

'আর কিছু লাগবে, স্যর?'

'না, আর কিছু না। এটুকুই যথেষ্ট, ধন্যবাদ।'

'বেস্ট অভ লাক, স্যর।' দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বাবুর্চি। তাকে পাশ কাটিয়ে ম্যাজিক শপে ঢুকল ডক্টর ফারা।

চওড়া হাসি ফুটে উঠল জলিল ও নবীর ঠোঁটে। ম্যাজেণ্টা রঙের স্ট্র্যাপলেস ড্রেস পরেছে ফারা। সেঁটে আছে শরীরের প্রতিটি ভাঁজে। চুলে বরাবরের মত পনিটেইল নেই, ছড়িয়ে আছে মাথা জুড়ে। তাতে কোঁকড়া কোঁকড়া রিং। মুখে প্রচুর প্রসাধনীর ফলে হয়ে উঠেছে এলিজাবেথ টেইলরের যমজ বোন।

'এই যে নাও,' রানার হাতে পাতলা একটা লেদার কেস ধরিয়ে দিল ফারা। ওটা খুলল রানা। ভিতরে প্রোটেকটিভ স্লটে তিনটে হাইপোডারমিক নিডল। 'শিরার ভিতর দিলে পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ঘুমিয়ে পড়বে।'

'আর ট্যাবলেট?' জানতে চাইল রানা।

প্লাস্টিক পিল বটল বেরুল ফারার পার্স থেকে। বোতলের ভিতর মাত্র দুটো ট্যাবলেট। 'যদি ওই আল-কাশিমের কিডনি

সমস্যা থাকে, ব্যথরুমে যাওয়ার আগে হাসপাতালে ছুটতে হবে।'

'কতক্ষণ পর কাজ করবে?'

'দশ থেকে পনেরো মিনিট।'

'স্বাদে টের পাবে না?'

মাথা নাড়ল ফারা। পার্স থেকে বের করে নিজের পাসপোর্টটা দেখাল রানাকে। স্থানীয় মেয়েদের ঢুকতে দেয়া হয় না ক্যাসিনোর ভিতর। আইডেণ্টিফিকেশন পরীক্ষা করা হয় দরজার বাইরেই।

'সবার সঙ্গে ফোন আছে?' জানতে চাইল রানা। ইয়ারবাড রেডিও বা ল্যাপেল মাইক্রোফোন ব্যবহার করবে না। বদলে ব্যবহার করবে সেল-ফোনের ওয়াকি-টকি মোড। সবাইকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বলল রানা, 'ঠিক আছে, চলো তীরে যাওয়া যাক।'

বিশ্বখ্যাত আর্কিটেক্ট চার্লস গার্নিয়ার ডিজাইন করেছেন প্যারিস অপেরা হাউসের, ঠিক তেমনই আরেকটি স্থাপত্য তাঁর ক্যাসিনো দ্য মণ্টি কার্লো। ধার্মিক মানুষ যেভাবে ক্যাথিড্রালে যায়, ঠিক তার উল্টো লোকে যায় ওই প্রসিদ্ধ জুয়ার আড্ডায়। গার্নিয়ারের সৃষ্টি এই অদ্ভুত সুন্দর স্থাপত্য তৈরি করা হয়েছে নেপোলিয়ন থ্রি ডিজাইন অনুসরণ করে। ক্যাসিনোর ভিতর ঢুকবার আগে দারুণ সব ফোয়ারা, দু'পাশে টাওয়ার। তামা দিয়ে তৈরি ক্যাসিনোর ছাত। অভিজাত এইট্রিয়ামকে ধরে রেখেছে আটাশটা অনিক্স কলাম। প্রতিটি ঘরে মার্বেল ও স্টেইনড গ্লাসের ছড়াছড়ি। ক্যাসিনোর সামনে পৌঁছে দেখল রানা, পোর্টারের দায়িত্বে রাখা হয়েছে তিনটা ফেরারি ও চারটা বেণ্টলি। এখানে আসে সমাজের

উঁচু লেভেলের সম্ভ্রান্ত সব মানুষ। পুরুষদের পরনে টুক্সেডো, তাদের সঙ্গিনীদের গলায়-হাতে মহামূল্যবান গহনা। কারও কারও গাউনে খচিত থাকে হীরা-পান্না-চুনি।

বাম হাতের কাফ তুলে সময় দেখে নিল রানা। ব্যালফোর জেনকিন্স ও প্রিন্স ইবনে আল-কাশিম রাত দশটার দিকে পৌঁছুবে। আধ ঘণ্টা আগেই এসেছে ও। এরইমধ্যে বেছে নিতে হবে কোনও জায়গা, যেখানে নিশ্চিন্তে সময় কাটানো যায়। আল-কাশিম থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে, নইলে নকল জিনিস ধরা পড়বে।

টিঁট-টিঁট করে উঠল ফোন।

'মাসুদ ভাই, আমরা পজিশনে,' রিপোর্ট করল জলিল।

'কোনও সমস্যা?'

'জ্যানিটরের পোশাকে আমরা প্রায় অদৃশ্য-মানব।'

'আছ কোথায়?'

'লোডিং ডকের কাছে। বুদ্ধি করে কয়েক জগ সয়াবিন তেল ঢেলেছে নবী, এখন ব্যস্ত হয়ে ওটা পরিষ্কার করছি।'

'ঠিক আছে। আমার সিগনালের জন্য অপেক্ষা করো।'

প্রবেশ-দ্বারে নিজের পাসপোর্ট দেখাল রানা, এণ্ট্র্যান্স ফি মিটিয়ে দিল। ভিড় করা লোকগুলো চলেছে ডানদিকে, ওদিকে একের পর এক গেমিং রুম। তাদের পিছু নিল রানা। তবে জুয়া-ঘরের দিকে না গিয়ে উঠে এল দোতলায়, বার-এ। একটা মার্টিনি নিল, তবে ওটাতে চুমুক না দিয়ে চারপাশের পরিবেশ বুঝতে চাইল। চলে এসেছে এক কোনার কিছুটা অন্ধকারমত এলাকায়।

ক'মুহূর্ত পর কল দিল ফারা, জানিয়ে দিল পৌঁছে গেছে। আপাতত থাকছে স্যালোন দ্য এল'ইউরোপ-এ। ক্যাসিনোর

নামকরা একটা গ্যাম্বলিং হল ওটা।

চুপচাপ সময় পার করছে রানা। ভাবতে শুরু করেছে, অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রজেক্টাইল ফেলবার আগে উর্বশীকে কীভাবে উদ্ধার করবে ইয়োস দ্বীপ থেকে। ওর মনে কোনও দ্বিধা নেই, যদি উর্বশীকে সরিয়ে নিতে না পারে, তবুও ধ্বংস করতে হবে ইয়োস দ্বীপ। বিশাল জুয়া খেলছে ওরা। উর্বশী নিজেও একই সিদ্ধান্ত নিত—কোটি কোটি মানুষকে বিপদে ফেলা যায় না। যেমন করে হোক ওই ইএলএফ অ্যান্টেনা উড়িয়ে দিতে হবে। তারপর চোদ্দশিকের ওপারে পাঠাতে হবে পালের গোদাগুলোকে।

বারবার ভেবেছে রানা, ইএলএফ ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করে উর্বশীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কি না। কোনও উপায় আসলে নেই। ওটা ট্র্যান্সমিটার, রিসিভার নয়। এখন পর্যন্ত অন্তত দশটা পরিকল্পনা করেছে, তবে ভেবেচিন্তে শেষে প্রতিটিকে বাতিল করতে হয়েছে। কোনটাই পছন্দ হচ্ছে না।

'ওরা পৌঁচেছে,' ফোনে বলল ফারা। বিশ মিনিট হলো বারে বসে আছে রানা। 'এখন যাচ্ছে শেমান দ্য ফেয়ার টেবিলের দিকে।'

'ওরা বসুক, দু'চারটে ড্রিঙ্ক নিক, কাজ শুরু কোরো।'

ক্যাসিনোর ভিতর মনোযোগ দুই ভাগে ভাগ করে নিল ফারা, খেয়াল রাখছে টার্গেটের দিকে, একইসঙ্গে দেখছে রুলেত টেবিলের খেলা। ওর সামনে দ্রুত কমে চলেছে চিপস। ধীরে ধীরে বইছে সময়। এদিকে তৃতীয় ড্রিঙ্ক নিয়েছে ইবনে আল-কাশিম।

ভাবতে গেলে অবাক লাগে, এ লোক ধর্মের নামে জঙ্গী-সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দিতে চায় অস্ত্র। অথচ ইসলাম ধর্মে

পরিষ্কার বলা হয়েছে অ্যালকোহল হারাম। লোকটা বোধহয় নিজেকে তাকফির মনে করে, ধর্মের সত্যিকারের অন্ধ অনুসারী। আর মানুষের একটু-আধটু দোষ তো থাকতেই পারে। পশ্চিমা সমাজে এসে আলখেল্লা বাদ দিয়েছে, তো কি, দাড়ি তো আছে! মদ্যপান করলে কিংবা বালক ও মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করলে কি মাফ করে দেবেন না মহান আল্লাহ্?

'আমার মনে হয় সময় হয়েছে,' ফোনে বলল ফারা। টেক্সট মেসেজ পড়ছে এমন ভঙ্গি নিয়েছে।

'ঠিক আছে। যা করার করো। ...জলিল, অপারেশন ফাইভের জন্য তৈরি থাকো।'

একটু বিরতি নিল ফারা, তারপর ছয় নম্বর স্লটে রুলেত বল পড়তেই হেরে যাওয়া চিপসগুলো নিয়ে নিল ডিলার। তাকে একটা চিপ্ বকশিস দিল ফারা, তারপর অবশিষ্টগুলো নিয়ে সরে এল। পার্স থেকে হাতে চলে এল দুটো ট্যাবলেট, রওনা হয়ে গেল ফারা রাজপুত্রের উদ্দেশে। ফারার দিকে চেয়ে চোখ টিপল কেউ কেউ। তবে বেশিরভাগ মজে আছে জুয়ার ভিতর।

ব্যালফোর ও আল-কাশিম যে টেবিলে খেলছে সেখানে এ মুহূর্তে কোনও বাড়তি চেয়ার নেই। বাধ্য হয়ে প্রিন্সের পিছনে দাঁড়াল ফারা। ঠিক সময়ের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। কিছুক্ষণ পর যখন বড় এক দান পেল ইজরায়েলি, তার পাশে চলে গেল ফারা। ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'কংগ্র্যাচুলেশন্স।' প্রথমে চমকে উঠল আর্মস ডিলার, তারপর সুন্দরী মেয়ে দেখে পাল্টা হাসল।

কিছুক্ষণ পর যখন আরেক খেলোয়াড় বড় দান পেল, তাকেও কংগ্র্যাচুলেশন্স জানাল ফারা। ততক্ষণে সবাই মেনে

নিয়েছে ওকে। অপ্সরীর মত মেয়েটা আশপাশে থাকলে বরং খেলার মজা আরও বাড়বে। এবার দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের স্ট্যাকের উপর সামান্য চিপস রাখল ফারা। ওই লোক যদি জেতে, ও-ও জিতবে।

তবে পরের দানে হারল লোকটা। ফারার দিকে চেয়ে দুঃখ-প্রকাশ করল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিষয়টা উড়িয়ে দিল ফারা। ওর ভাব দেখে মনে হলো, এ কোনও ব্যাপারই নয়।

এবার আল-কাশিমের দিকে চাইল ফারা। নিঃশব্দে ভুরু উঁচু করল। প্রিন্সের চিপসগুলোর সঙ্গে নিজেরগুলো রাখতে চাইছে। বার কয়েক মাথা দোলাল লোকটা। তার ড্রিঙ্কের পাশে এক হাত রাখল ফারা, ঝুঁকে পড়ে টেবিলে চিপস রাখল। আবার যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল, তখন প্রায় উল্টে যাচ্ছিল গ্লাস। ওটা পড়বার আগেই অবশ্য খপ্ করে ধরল, ততক্ষণে মদের ভিতর পড়েছে দুটো ট্যাবলেট। গ্লাসটা ম্যাটের উপর রাখল।

ওই দুই ট্যাবলেটের ভিতর রয়েছে হোমিওপ্যাথিক কম্পাউণ্ড। ওগুলো দিয়ে অ্যাডিক্টদের শরীর থেকে দূর করা হয় ড্রাগ। এই জিনিসের ব্যাপারে পড়াশোনা করেছে ফারা। আসলে ওটা কোনও কাজই করে না। তবে অন্য ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে। ওই জিনিস খেলে বারবার ছুটতে হয় প্রস্রাব করতে। আল-কাশিমকে দেয়া হয়েছে যেন সে একটু পর ক্যাসিনোর রেস্টরুমে যায়।

আল-কাশিম কিছুই সন্দেহ করেনি। এ দান শেষে জিতল সে, নেকড়ের মত হাসতে লাগল। হাসি থামতে ফারার জেতা চিপস তুলে দিল ওর হাতে।

'মার্সি, মোসিউ,' বলল ফারা। অন্য এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে বাজি ধরল এবার। এবং হেরেও গেল। অপেক্ষা না করে ওই

টেবিল থেকে সরে বেরিয়ে এল গ্যাম্বলিং হল থেকে। ফিরে এল আকাশ ছোঁয়া এইট্রিয়ামে, ফোনে জানিয়ে দিল ওর কাজ শেষ।

'ঠিক আছে, এমন কোথাও থাকো যেখান থেকে তাকে দেখতে পাও। বাথরুমের দিকে গেলে জানিয়ে দিয়ে মেরিনায় চলে যেয়ো।' স্যালন দ্য এল'ইউরোপ থেকে সবচেয়ে কাছের ল্যাভাটোরির দিকে চলেছে রানা। 'জলিল, নবী, তোমরা পজিশনে চলে এসো।'

'আসছি, মাসুদ ভাই।'

রেস্টরুম থেকে এক দরজা আগে বিল্ডিঙের সার্ভিস করিডোর, ওখানে থাকে জ্যানিটর ও ওয়েটস্টাফ, ক্যাসিনোর পেট্রনদের সেবা দেয়। পৌঁছে গিয়ে একটু দ্বিধা করল রানা, ততক্ষণে খুলে গেল দরজা। ওর দিকে নকল বমির ক্যানিস্টার বাড়িয়ে দিল জলিল খান। ওটা নিয়ে রেস্টরুমে ঢুকে পড়ল রানা। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল, এতক্ষণে আল-কাশিমের উপর ড্রাগের প্রভাব শুরু হওয়ার কথা।

ক্যাসিনোর আর সব কিছুর মত রেস্টরুমও মার্বেলের তৈরি, এখানে ওখানে সোনার রং। একটু আগে রানা যখন ঢুকেছে, এক লোককে দেখেছে। সে হাত পরিষ্কার করছিল। তবে স্টলগুলোর কাছে পৌঁছতেই বেরিয়ে গেল সে লোক। অসুস্থ হওয়ার ভান করতে হলো না রানার। নিশ্চিন্তে মেঝের উপর ঢালল আবুলের তৈরি বমি। সে দুর্গন্ধ ভয়ানক। নিজেও ঢুকে পড়ল এক স্টলে।

কয়েক মিনিট পর পেট্রনদের একজন বাথরুমে ঢুকল। স্টলের ভিতর রানা বুঝল, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এ লোকের জীবন। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাসিনোর কর্মচারীদের ডাকল সে। ফ্রেঞ্চ

ভাষায় বকে চলেছে। অ্যাটেণ্ডেন্ট তাকে নিশ্চিত করল, এখনই আসবে জ্যানিটরিয়াল স্টাফ। দুটো পায়ের আওয়াজ উঠল। তারপর আরও দুটো পায়ের আওয়াজ। পেট্রন অন্য রেস্টরুমের খোঁজে চলেছে। স্টলের ভিতর রানা আন্দাজ করল, কাছের সার্ভিস করিডোর লক্ষ্য করে ছুটছে কর্মচারী। করিডোরে দুই জ্যানিটরকে পাবে সে, তারা এসে পরিষ্কার করবে বমি।

দু'মিনিট পেরুল, আবার খুলে গেল রেস্টরুমের দরজা। ঘড়ঘড় করে ভিতরে ঢুকল ট্র্যাশ ব্যারেলের চাকাগুলো। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'কী বুঝলে?' স্টল থেকে বেরিয়ে এল রানা।

'মাসুদ ভাই, মরে গেলে আর বাঁচব না,' করুণ স্বরে জানাল নবী।

'কপাল কাকে বলে,' আফসোস করল জলিল। 'মাসুদ ভাই হলেন রাজপুত্র, আর আমরা হলাম জমাদার! সব কপালের ফের!'

আবার খুলে গেল রেস্টরুমের দরজা। এক লোক ঢুকতেই হাতের ইশারা করল নবী, মাথা কাত করে দেখিয়ে দিল এখানে না থাকাই ভাল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফিরতি পথ ধরল পেট্রন। ততক্ষণে মেঝে থেকে থকথকে বমি পরিষ্কার করতে শুরু করেছে জলিল।

'এইমাত্র টেবিল ছাড়ল,' রানার উদ্দেশে বলল ফারা। 'বাথরুমের দিকে চলেছে।'

'গুড। তোমার সঙ্গে পরে দেখা হবে।' আবার স্টলের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা।

কিছুক্ষণ পর খুলে গেল রেস্টরুমের দরজা, ভিতরে এসে ঢুকল ইবনে আল-কাশিম। দুর্গন্ধ পেয়ে কুঁচকে ফেলল নাক।

তবে তার প্রয়োজন আর্জেন্ট, প্রায় ছুটতে ছুটতে ঢুকল একটা স্টলে।

মুতুক শালা, অপেক্ষা করছে রানা। তবে লোকটার কাজ প্রায় শেষ হতে নিঃশব্দে পিছনে গিয়ে হাজির হলো। কে যেন পিছনে, হঠাৎ টের পেল আল-কাশিম, ঘুরে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে চাইল যমজ ভাইয়ের দিকে। তবে বুঝে উঠবার আগেই তার ঘাড়ের পিছনে গেঁথে গেল হাইপোডারমিক নিডল। প্লাঞ্জার দাবিয়ে দিল রানা। চেঁচিয়ে উঠল আল-কাশিম, বিশাল হাঁ করল সাহায্য চাওয়ার জন্য। তবে এক হাতে তার মুখ চেপে ধরেছে রানা। আরেক হাতে ঘাড়। ঝটকা দিয়ে সরতে গিয়ে রাজপুত্রের চোখ থেকে খসে পড়ল সানগ্লাস। আর মাত্র দুই সেকেণ্ড জেগে রইল, তারপর এলিয়ে পড়ল রানার কাঁধে।

দরজার ওপাশ থেকে আরেক পেট্রনকে ফিরিয়ে দিল নবী। ততক্ষণে জলিল ও রানা বড় ট্র্যাশ ক্যানের ভিতর ভরে ফেলেছে আল-কাশিমকে। নিজের ঘড়ি পকেটে রেখে দিল রানা, পরে নিল প্রিন্সের হালকা মোভাডো ও ডানহাতের প্রকাণ্ড আঙটি।

'ঘুমাক, আমি যাই জেনকিন্সের খোঁজে,' একবার নিজেকে আয়নায় দেখে নিল রানা। 'রাজপুত্তুরকে এমন কোথাও রাখবে, যেন কয়েক ঘণ্টার ভেতর কেউ খুঁজে না পায়। কাজ শেষ হলেই ফারাকে সঙ্গে নিয়ে মার্ভেলে ফিরবে।'

'লোডিং ডকের কাছে ইউটিলিটি ক্লজিট দেখেছি,' বলল জলিল। 'রাতের এ সময়ে ওদিকে কেউ থাকবে না।' মপ দিয়ে বমির শেষ অংশ তুলে ফেলল। আবার চকচক করছে মেঝে। বাকেটের ভিতর রেখে দিল মপ।

'পরে দেখা হবে,' দরজা খুলে বেরিয়ে গেল রানা।

তিন মিনিটেই পৌঁছে গেল শেমান দ্য ফেয়ার টেবিলে। শু

থেকে তাস নিয়েছে ব্যালফোর। 'দোস্তো, শরীর এখন কেমন?' ইংরেজিতে বলল।

'পেট কামড়ে চলেছে, আর কিছু না, ব্যালফোর।' প্রিন্স ও আর্মস ডিলার তিন ঘণ্টা আলাপ করেছে, এমন এক টেপ শুনে এসেছে রানা। তাদের কথা বলবার ভঙ্গি ও আচরণ জানে। দ্বিতীয়বার রানার দিকে চাইল না ব্যালফোর।

পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ মিনিট জুয়া খেলল ওরা। তার ফাঁকে বার কয়েক জানিয়েছে রানা, ভাল লাগছে না ওর শরীর। শেষের দিকে খেলা রীতিমত খারাপ হয়ে উঠল। বোকার মত বাজি ধরল, এক দানে প্রিন্সের দুই লাখ চল্লিশ হাজার ডলারের চিপসের অর্ধেক হেরে গেল।

'সরি, ব্যালফোর,' ডানহাতে পেট ধরে বলল রানা, 'আমার মনে হয় এবার ইয়টে ফেরা উচিত।'

'ডাক্তার লাগবে?'

'অত সিরিয়াস মনে হয় না। একটু শুলে ঠিক হয়ে যাবে শরীর।' নিজে ডিল করবার সুযোগটা নিল না রানা। একটু টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। 'আপনারা খেলুন প্লিয। আমি...'

বড় ঝুঁকি নিয়েছে রানা, আর্মস ডিলার যদি মনে করে, ঠিক আছে, আল-কাশিম ফিরে যাক ইয়টে, আমি আরও খেলি—তা হলে বিপদ হবে। এদের দু'জনের কথা থেকে যা বুঝতে পেরেছে, তাতে রানার মনে হয়েছে, এভাবেই কথাটা পাড়ত শাহজাদা।

ইজরায়েলি আর্মস ডিলারের মনে এ ভাবনা যে আসেনি, তা নয়, তিরিশ হাজার ডলার জিতেছে সে। প্রতিদিন কপাল এমন থাকে না। কিন্তু মুশকিল হলো, আল-কাশিম হয়ে উঠতে পারে তার মস্ত বড় একজন ক্লায়েন্ট।

'এক রাতে এদের যথেষ্ট টাকা নিয়েছি,' ডানের লোকটার দিকে ছয়-ডেক শু বাড়িয়ে দিল জেনকিন্স, উঠে দাঁড়াল। পুরুষ্টু কাঁধের উপর ঝুলছে জ্যাকেট।

চিপসগুলো ফিরিয়ে দিল ওরা, ক্যাসিনো থেকে টাকা না নিয়ে জানিয়ে দিল, আগামীকাল এসে এই দুই অ্যাকাউন্ট চালু করবে। সাজানো এইট্রিয়াম ধরে চলেছে ওরা। সেল-ফোনে ড্রাইভারের সঙ্গে যোগাযোগ করল ব্যালফোর জেনকিন্স। ওরা বেরুবার আগেই ক্যাসিনোর সামনের চত্বরে চলে আসবে লিমাযিন।

এণ্ট্রান্সের সামনে থামল লিমাযিন, তবে ড্রাইভিং সিট থেকে নামল না ড্রাইভার। পাশের সিট থেকে লাফ দিয়ে নামল জেনকিন্সের বডি গার্ড, খুলে দিল পিছনের দরজা। দৈর্ঘ্যে লোকটা রানার চেয়ে অন্তত সাত ইঞ্চি উঁচু। শীতল চোখ কাউকে বিশ্বাস করে না। চারপাশ দেখে নিল সে। ব্যালফোর জেনকিন্স পিছনের সিটে বসতেই কঠোর চোখে চাইল সৌদি প্রিন্সের দিকে।

ট্রেইনিং রানাকে জানিয়ে দিল, ওকে স্বাভাবিক থাকতে হবে। মর্মর মূর্তির মত চাইল রানা বডি গার্ডের দিকে। একটু রাগ নিয়ে জানতে চাইল, 'কোথাও কোনও সমস্যা?'

দৃষ্টি একটু নরম হলো লোকটার। 'না, তেমন কিছু না।'

গাড়ির পিছন সিটে উঠে পড়ল রানা, পাশ থেকে দরজা বন্ধ করে দিল বডি গার্ড। কাছেই মেরিনা। বডি গার্ড সামনের সিটে বসতেই রওনা হয়ে গেল গাড়ি। দু'হাতে পেট চেপে ধরে সিটে এলিয়ে পড়ে থাকল রানা। আসলে চাইছে না লিমাযিনের ভিতর কথা বলতে হোক। পাঁচ মিনিট পেরুনোর আগেই চলে এল গাড়ি ওয়াটারফ্রন্টে।

আর্মস ডিলারের ইয়ট থেকে এসেছে প্রাইভেট লঞ্চ, ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। গাড়ি থামতেই বেরিয়ে গেল বডি গার্ড, চারপাশ দেখে নিয়ে পিছনের দরজা খুলে দিল।

'কপাল ভাল যে আজ কোনও মেয়ের পিছনে টাকা খরচ করিনি,' রানার পাশে হাঁটতে শুরু করল জেনকিন্স। সামনের পানিতে ঝিলিমিলি, দুলছে রাজহংসের মত সাদা লঞ্চ।

'পেট যেমন মোচড় মারছে, মেয়েলোক তো দূরের কথা, কচি ছেলেও চাই না এখন। লঞ্চে উঠতে গেলে মাথা ঘুরে উঠতে পারে।'

ভালুকের হাতের মত মোটা হাত রানার কাঁধে ফেলল জেনকিন্স। 'পৌঁছতে পাঁচ মিনিট। হার্বারের পানি শান্ত। ভয় নেই, বমি হবে না।'

লঞ্চের ইঞ্জিন চালু করল বডি গার্ড, লিমোর ড্রাইভার বো ও স্টার্নের লাইন খুলে দিল। ছয় মিনিট পর ইয়ট মাউন্ট সিনাইয়ের চওড়া দিকটায় পৌঁছে গেল লঞ্চ। ইয়টের টিক ডাইভ প্ল্যাটফর্মের পিছনে নামিয়ে দেয়া হয়েছে সিঁড়ি।

'সোজা কেবিনে গিয়ে বিশ্রাম নিন,' ইয়টের ডেকে উঠবার সময় বলল জেনকিন্স।

সিঁড়ির উপর ধাপে অপেক্ষা করছে এক কর্মচারী, যদি কিছু লাগে ইজরায়েলি আর্মস ডিলারের! ডেকে উঠে আরও দু'জন গার্ড দেখল রানা। একজন ব্রিজের সানডেকে, অন্যজন পায়চারি করছে ইয়টের পুলের পাশে।

মার্ভেল থেকে রানাকে জানানো হয়েছে এই মেগা ইয়টে রয়েছে কমপক্ষে আঠারোজন ক্রু। আর দশজন আছে সিকিউরিটি দেখবার জন্য।

'আমি বরং আপনার অফিসে বসতে চাই,' বলল রানা।

'খুব জরুরি?' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল জেনকিন্স। তার জানা আছে কেউ শুনে ফেলতে পারে। ওরা রয়েছে তীর থেকে খুব কাছে।

'না-না-না,' আল-কাশিমের ভঙ্গিতে বলল রানা। 'আজ রাতে একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবছি।'

বিশাল এই অভিজাত নৌযানের ডেক ধরে হাঁটতে শুরু করল ওরা। বিশজন বসতে পারে এমন ডাইনিং রুম পেরিয়ে মুভি থিয়েটার। ওখানে বসতে পারে চল্লিশজন। আরও বিশ ফুট যাওয়ার পর একতলা নামল ওরা, সামনে পড়ল জেনকিন্সের অফিস। রানা ভিতরে ঢুকতেই দরজা আটকে দিল ইজরায়েলি আর্মস ডিলার। পাশের সুইচ বোর্ডে হাত রেখে জ্বেলে দিল আলো। কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই থমকে যেতে হলো তাকে। তার ঘাড়ের পাশে ওয়ালথার ঠেসে ধরেছে আল-কাশিম। এবং এত জোরে যে, ছড়ে গেল ত্বক।

'একটা আওয়াজ, ব্যস, মরবে,' আরবী টানে বলা ইংরেজি উধাও হয়েছে। রাজপুত্র এখন নিখুঁত ইদ্দিশ ভাষা ছাড়ছে!

নড়ল না ব্যালফোর জেনকিন্স। বুদ্ধিমান লোক, বুঝে গেছে এ যে-ই হোক, ওকে খুন করতে আসেনি। ইচ্ছা করলে আগেই শেষ করতে পারত। এর অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে।

'কে তুমি?'

কোনও জবাব মিলল না। বগলে হোলস্টার আছে কি না দেখা হলো। কোমরে কিছু নেই। এক হাতে আর্মস ডিলারের দুই কব্জি আটকে দেয়া হলো ফ্লেক্সিকাফে।

'তুমি আমার ভাষা জানো, আরব নও, অন্য কোনও দেশের মানুষ। তোমার সাহস দেখে অবাক হচ্ছি। আমি যখন রিসার্চ করি, বুঝতে পারি ইবনে আল-কাশিমের ব্যাকগ্রাউণ্ড পরিষ্কার।

অর্থাৎ তার পরিচয় নিয়ে এখানে আসা কঠিন ছিল। আমার পরিচিত অনেকে বলেছে, আল-কাশিম সলিড কাস্টমার।'

'আমি ইবনে আল-কাশিম নই,' বলল রানা।

দাঁত খিঁচিয়ে বলল জেনকিন্স, 'তা তো বুঝতেই পারছি।'

'সে আছে ক্যাসিনোয়, লোডিং ডকে ট্র্যাশ ক্যানের ভিতর। চব্বিশ ঘণ্টা পর জেগে উঠবে। পরে তার সঙ্গে আর্মস নিয়ে আলাপ কোরো।' তিন পা পিছিয়ে গেল রানা। 'ঘুরে দাঁড়াও।'

ঘুরে ওর দিকে চাইল আর্মস ডিলার। সরু হয়ে গেল দুই চোখ। পরিস্থিতি বুঝতে চাইছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকে অনিশ্চয়তার ভিতর রাখল রানা, তারপর বলল, 'শুনেছি মণ্টি কার্লোয় এসেই তোমাদের পরিচয় হয়। অবশ্য তাতে আমার কিছু না। আমি এখানে এসেছি অন্য কাজে। তুমি আগে মোসাদে চাকরি করতে। তোমার মালিকদের কাছ থেকে একটা জিনিস চুরি করেছ।'

'আমি তো অনেক কিছুই নিয়েছি,' খানিক গর্ব নিয়েই বলল জেনকিন্স।

এই লোকের ফাইল পড়েছে রানা। ওর বদলে অন্য কেউ হলে এর খুলির ভিতর একটা বুলেট পাঠিয়ে দিয়ে তারপর কথা বলত। তাতে একটু সাফ হতো জগৎ।

'আমি জিব্রাইলের মুষ্টির কোড ফিরিয়ে নিতে এসেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ওর, ঠিক দু'দিন আগে আল-কাশিমকে ওই অস্ত্রের কথা বলেছে জেনকিন্স। আরেকবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

'যা চাই তা না পেলে, আমি তোমার মৃত্যুদূত।'

'তোমরা আমার উপর সার্ভেইল্যান্স রেখেছ, না?'

'বেশ কিছুদিন ধরে। বাধ্য না হলে তোমাকে খুন করতে

চাই না। অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রোজেক্টাইল স্যাটালাইটের কোড দেবে। পরে ইবনে আল-কাশিমের সঙ্গে খুশিমত ব্যবসা কোরো, আপত্তি নেই। তবে আজ ওই কোড না দিলে মরবে তুমি।'

মার্ভেল থেকে আসবার আগে বিসিআই চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রানা। উনি জানিয়েছেন, এমন কিছু করবে না যেটা জেনকিন্স ও আল-কাশিমের আর্মস ডিল নষ্ট করে। ওদের ঠিক সময়ে হাতের মুঠোয় পেতে চাই।

ওয়ালথারের হ্যামার কক করল রানা। নীরবে বুঝিয়ে দিল, যা বলছে, তাই করবে।

কড়া চোখে চাইল ইহুদি আর্মস ডিলার। তবে ঠিকই চোখে পড়ল, আঙুলের চাপ বেড়ে গেছে ট্রিগারে।

'ট্রিগার টেপো, ঠিক বিশ সেকেণ্ডে পৌঁছুবে আমার সিকিউরিটি টিম,' পাল্টা বলল সে।

'ততক্ষণে তুমি পৌঁছে গেছ জাহান্নামে,' চাপা শোনাল রানার কণ্ঠ। 'তা-ই চাও? সেক্ষেত্রে জেহোভার কাছে প্রার্থনা করে নাও।'

'তুমি কাদের লোক? মোসাদ?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেনকিন্স।

'ঠিকই ধরেছ। ওই কোড ফেরত চাই।' সানগ্লাস খুলে ফেলল রানা। ওর কঠোর, নির্দয় দৃষ্টি বিদ্ধ করল আর্মস ডিলারের চোখ দুটোকে। 'আমরা বিশ্বাসঘাতককে মাফ করি না, তবে বাধ্য না হলে ইহুদি খুনও করি না।'

এ তথ্যে কোনও ভুল নেই। কিন্তু মোসাদ কী করে টের পেল সে সরিয়েছে কোড! কাঁধ ঝাঁকাল ব্যালফোর জেনকিন্স। 'আমি বিশ্বাস করি না তুমি মোসাদের কেউ। তবে তাতে কিছু যায় আসে না। ওই কোড কখনও কাজে লাগবে না। না আমার,

না কারও। সবই আছে ওই ছবির পিছনের সিন্দুকে।' উলঙ্গ এক যুবতীর ছবি ঝুলছে ওদিকের দেয়ালে।

পাঁচ পা সরল রানা, ওয়ালথারের নল দিয়ে দীর্ঘ হিঞ্জ সরাল। এটা হতে পারে বুবি ট্র্যাপ। তবে তেমন কিছু হলো না, দুই ফুট বর্গাকারের সিন্দুক, তার উপর দশ ডিজিটের ইলেকট্রনিক প্যাড।

'কম্বিনেশন।'

'এক-পনেরো, এক-এক-তিন, এক-নয়-এক-সাত।'

নাম্বারগুলো প্যাডে টিপল রানা, তবে খুলল না সিন্দুক। ওয়ালথার দিয়ে ইশারা করল। 'সিন্দুকের সামনে এসে দাঁড়াও।'

ওখানে এসে থামল জেনকিন্স। পাশ থেকে হ্যাণ্ডেলে টান দিল রানা। এ ধরনের সেফের মডেল ওর চেনা। এগুলোতে কোনও ভুল কোড দিলে বিস্ফোরিত হয় স্টান গ্রেনেড। তবে কোনও চালাকি করেনি জেনকিন্স। কোড সঠিক।

সিন্দুকের ভিতর বাণ্ডিল বাঁধা কয়েক শ' হাজার ডলার আর একটা পিস্তল। পিস্তলটা পকেটে রাখল রানা। এ ছাড়া ভিতরে রয়েছে বেশ কিছু ফোল্ডার ও ফাইল।

'ফাইলের নীচের দিকে পাবে,' বলল জেনকিন্স। যত দ্রুত সম্ভব ঝামেলা থেকে মুক্তি চাইছে।

মূল ডকুমেন্ট খুঁজবার সময় আরও দু'চারটে ফাইলে চোখ বোলাল রানা। আমেরিকা থেকে প্রচুর অস্ত্র কিনেছে ইজরায়েল। তার কিছু অংশ বিক্রি করে দিয়েছে আর্মির এক ব্রিগেডিয়ার। সেই চালান জেনকিন্সের মারফতে গেছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের চরমপন্থীদের হাতে। বদলে মিলেছে প্রচুর ওপিয়াম। সেটা আবার বিক্রি হয়েছে ইউরোপে। জটিল লোক

এই ব্যালফোর জেনকিন্স!

সর্বশেষ ফাইলের আগেরটিতে দেখল লেখাঃ *জিব্রাইলের মুষ্টি।* কয়েকটা পাতা পড়ল রানা, তারপর সন্তুষ্ট হলো। ঠিক জিনিস পেয়েছে। এই কোডকে ইংরেজিতে ভাষান্তর করবে মার্ভেলের কম্পিউটার। এরপর সেটা চলে যাবে ক্যাপ্টেন আলম সিরাজের হাতে। অনিলের সঙ্গে বসে বুঝে নিতে হবে তাঁর জটিল অঙ্ক ও প্রক্রিয়াগুলো।

একটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগের ভিতর ফাইল রেখে দিল রানা। একবার চাইল ব্যালফোর জেনকিন্সের দিকে। কড়া কিছু না বলে শান্ত স্বরে বলল, 'তুমি যখন আল-কাশিমকে পাবে, ওকে বোলো, আজ যা ঘটল তার সঙ্গে তোমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তুমি একটা জিনিস চুরি করেছিলে, সেটা আবার বাটপারি করে নিয়ে গেছে আরেকজন। ঠিক আছে, এবার দুই হাঁটুর উপর বসো... নিল ডাউনের ভঙ্গিতে।'

রানা পিস্তল বের করবার পর এই প্রথমবারের মত ভড়কে গেল জেনকিন্স। চোখে ফুটে উঠেছে আতঙ্ক। কাঁপা স্বরে বলল, 'তুমি যা চেয়েছ, তা তো পেয়েই গেছ!'

'না, তোমাকে খুন করব না,' বলল রানা। হাইপোডারমিক কেস থেকে বের করেছে সিরিঞ্জ। উজ্জ্বল আলোয় ঝিক করে উঠল সুই। 'ভয় নেই, এই একই জিনিস দিয়েছি ইবনে আল-কাশিমকেও। জাস্ট একটাদিনের জন্য ঘুমাও। কোনও ক্ষতি হবে না, বরং উপকার হবে শরীরের।'

'সুঁই আমি ভয় পাই। তার চেয়ে মাথার উপর পিস্তলের বাড়ি দেয়া...'

এর বেশি কিছু বলবার সুযোগ পেল না সে, ঝট্ করে সামনে বাড়ল রানা, ওয়ালথার উপরে তুলেই জেনকিন্সের মাথার তালুর

উপর নামিয়ে আনল নল। আর মাত্র দুই পাউণ্ড শক্তি ব্যবহার করলে চুরমার হতো হাড়, সঙ্গে সঙ্গে মরত লোকটা। কলা গাছের মত ঝুপ করে পড়ল আর্মস ডিলার। অজ্ঞান। 'তোমার ইচ্ছা পূরণ করলাম,' বলল রানা। ওয়ালথার রেখে দিল মেরুদণ্ডের পাশে, লোকটার ঘাড়ে বিঁধিয়ে দিল হাইপোডারমিক সুঁই। ওষুধ পুরোপুরি দেয়ার পর সন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল।

জেনকিন্সের অফিসের এক পাশ ঘিরেছে কাঁচের জানালা। জায়গাটা ইয়টের খোল থেকে বেরিয়ে রয়েছে। ওখানে চলে গেল রানা, খুলে ফেলল জানালাগুলো। উপরের দিকে চাইল। রেলিঙে কেউ নেই। ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ গুঁজে নিল শার্টের নীচে, জানালা দিয়ে ফেলে দিল জেনকিন্সের পিস্তল। জুতো জোড়া খুলে নিঃশব্দে জানালা দিয়ে নেমে গেল সাগরে।

ডলফিনের ভঙ্গিতে চলেছে। কালো পানির সঙ্গে মিশে গেছে কালো উইগ। উপর থেকে বুঝবে না সাঁতরে চলেছে কেউ। মেগা ইয়ট মাউন্ট সিনাইয়ের খোলের পাশ কেটে পৌঁছে গেল নোঙরের শেকলের পাশে। ওখানে ডুব দেবে, শেকলের লিঙ্কগুলো ধরে নীচের দিকে নামবে।

কিন্তু ডুব দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ঝপাস্ করে পানিতে নেমে এল কে যেন! চারপাশে ছিটকে গেল পানি। কী ব্যাপার, কেউ দেখে ফেলল নাকি? ঠিক তাই। তিন সেকেণ্ড পর ভেসে উঠল ব্যালফোর জেনকিন্সের বিশালদেহী বডি গার্ড। একহাতে খপ করে ধরতে চাইল রানার চুল। সরতে চাইল রানা, কিন্তু ওর চেয়ে দ্রুত নড়ল লোকটা। ঘুসি বসিয়ে দিল রানার ভুঁড়িতে। ফোলা ফোমের উপর ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল রানা, দু' সেকেণ্ড লাগল পরিস্থিতি বুঝতে। ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে দানব, দু'হাতে টিপে ধরতে চাইল রানার গলা।

আবারও পিছিয়ে গেল রানা, বুঝতে পেরেছে এ লোকের সঙ্গে জোরে পারবে না। সরতে শুরু করেছে শেকলের দিকে। নতুন উৎসাহ নিয়ে ধাওয়া করল লোকটা। কাউকে ডাকছে না, বোধহয় ভাবছে আর্মস ডিলারের সমস্ত প্রশংসা একাই নেবে। শেকলের ওপাশে চলে গেল রানা, তারপর আর পিছাল না। টুক্স জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করে নিয়েছে ফ্লেক্সি কাফ।

ওর গালে চাপড় বসাতে চাইল লোকটা। মাথা সরিয়ে নিল রানা, তবে চোখ রেখেছে হাতের উপর, চট্ করে একটা ফেক্সিকাফ আটকে দিল লোকটার ডান কব্জিতে। পরক্ষণে শিকলে আটকে দিল অন্য কাফ। ভীষণ রেগে ঝটকা দিল বডি গার্ড, পরক্ষণে বুঝে নিল ফাঁদে পড়েছে।

'অ্যাই, তোমরা কে কোথায়!' হুঙ্কার ছাড়ল সে।

চট্ করে দম নিল রানা, পরক্ষণে ডুব দিল। একটু নীচের শিকলে হাত পড়তেই নেমে যেতে লাগল। প্যান্টের পায়া ধরে টেনে নিয়ে চলেছে দৈত্যটাকে। এক মিনিট পেরুনোর আগেই পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট জায়গায়। প্যান্ট ছেড়ে দিতেই লোকটা শেকল বেয়ে উপর দিকে উঠতে লাগল। হাঁসফাঁস অবস্থা।

খুলতে শুরু করল রানা টুক্স জ্যাকেট। এরপর দ্রুত খুলল শার্ট ও ফোলা ফোম। এখন ওর পরনে কালো স্কিন-টাইট শার্ট।

আধমিনিট পর পেয়ে গেল ও ডাইভিং ইকুইপমেণ্টগুলো।

ড্রেইগার রিব্রিদার, ওয়েট বেল্ট, মুখোশ, ফিন ও লিউমিনাস কম্পাস আগেই এখানে রেখে গেছে ফু-চুং। ওগুলো সংগ্রহ করে ধীরে সুস্থে পরে নিল রানা, উপরে উঠে যত খুশি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করুক ব্যাটা। তিনমিনিট পর তৈরি হয়ে রওনা হলো ও সাগরের দিকে। মাত্র একমাইল দূরে অপেক্ষা করছে মার্ভেল।

ভাটা চলছে। অনায়াসে এগুতে পারছে ও।

মাথার ভিতর গিজগিজ করছে নানান চিন্তা। প্রতিটা জরুরি।

বারো

ওদের কেবিন নেই, তবে কোনও বিপদে পড়েনি সানজিদা স্বর্ণা ও কাশেম বক্স। দোকান থেকে কিনে নিয়েছে পোশাক ও টয়েলেট্রিজ। জাহাজের ফিটনেস ফ্যাসিলিটির পাশের লকার-রুমে প্রয়োজন পড়লে গোসল করবে। দুপুরের দিকে পুলের ডেক-চেয়ারে পালা করে ঘুমিয়ে নিয়েছে। রাত কাটিয়েছে ক্যাসিনোর ভিতর। ফটোগ্রাফিক মেমোরির কারণে কাশেম হয়ে উঠেছে দক্ষ তাসুড়ে। দু'জন ওরা পাঁচ শ' ডলার নিয়ে জাহাজে উঠেছিল, এখন সেটা বেড়ে চল্লিশগুণে দাঁড়িয়েছে। চাইলে এর দশগুণ আয় করতে পারত, তবে গোপনে চলতে হবে, সবার চোখ পড়ে যাক ওদের উপর তা চায়নি।

তবে দ্বিতীয় দিন হঠাৎ করেই সব বদলে গেল।

জাহাজের শিপ-টু-শোর কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটি সাধারণ যাত্রীদের কাছে প্রয়োজনীয় নয়, বাধ্য হলে যোগাযোগ করে। কিন্তু আজ ক'জন ব্যবসায়ী যোগাযোগ করতে চাইলেন নিজ প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু তাঁদের সবিনয়ে মানা করে দিল কমিউনিকেশন অফিসার। এ বিষয়টা অবশ্য বেশির ভাগ যাত্রী খেয়াল করল না।

সতর্ক হয়ে উঠল কাশেম ও স্বর্ণা। আরও কিছু বিষয় বিপদ-সঙ্কেত হয়ে দেখা দিল। ওরা দেখল আগের চেয়ে অনেক বেশি ক্রু বেরিয়ে এসেছে ডেকে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো মেইনটেন্যান্সের কাজে ব্যস্ত। কিন্তু লোকগুলো অনেক বেশি নজর দিতে শুরু করেছে যাত্রীদের দিকে। ওদের কাছে এখন পর্যন্ত রুমের চাবি দেখতে চায়নি ক্রুরা, তবে স্বর্ণা ও কাশেম বুঝে নিল সামনে তেমন কিছু ঘটতে পারে।

ওদের মনে কোনও সন্দেহ রইল না, খবর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছেঃ কেউ গোপনে উঠেছে জাহাজে অবৈধ ভাবে। ক্রুজ লাইন এখন খুঁজছে এক বা একাধিক অনুপ্রবেশকারীকে।

এ খবর তো আছেই, তার চেয়ে বড় দুঃসংবাদ হয়ে উঠলঃ বেশ কিছু যাত্রী আক্রান্ত হলো সর্দি-জ্বরে।

দ্বিতীয় দিন সকালে যাত্রী এবং ক্রুরা রুমাল ব্যবহার করতে লাগল। অনেকে হেঁচে চলেছে অনর্গল। পুলের কাছে ও ডাইনিংরুমে যা শুনল, তাতে দুইয়ে দুই চার যোগ করে নিল ওরা। মাত্র গতকাল রাতে মানুষগুলো সুস্থ ছিল, কিন্তু আজ ভোর থেকে হয়ে উঠেছে রোগী। ছুটছে মেডিকেল বে-তে। মাঝরাতের বুফের পর থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে বেশির ভাগ রাঁধুনি ও ওয়েটস্টাফ।

‘ওরা ভাইরাস পরীক্ষা করছে,’ বলেছে কাশেম।

‘ভাইরাস পরীক্ষা করছে তা না-ও হতে পারে,’ নাস্তার সময় বলল স্বর্ণা। ওরা বসেছে বিশাল ডাইনিংরুমের এক কোণে।

‘দুটো কারণে তা মনে হয়েছে, প্রিয় ম্যাডাম স্বর্ণা।’

‘আমি আবার কবে আপনার প্রিয় হলাম?’ ভুরু কুঁচকে চাইল স্বর্ণা।

‘না-ই বা হলেন প্রিয়, কিন্তু হতেও তো পারতেন। ওভাবেই

বলতে হয় গোয়েন্দা কাহিনির চরিত্রগুলোর।'

'এটা আপনার বট-তলার গল্প নয়, যা বলার সরাসরি বলুন। আমি কখনও আপনার কেউ নই।'

হতাশ হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল কাশেম। 'যা বলছিলাম, দুটো কারণে সন্দেহ করছি।'

'আপনি বলতে চাইছেন বেশির ভাগ জাহাজে ভাইরাল আউটব্রেক হয় গ্যাসট্রোইনটেস্টিনাল ধরনের,' কথা কেড়ে নিল স্বর্ণা। 'আর এই আক্রমণটা রাইনোভাইরাস?'

'দ্বিতীয় কারণ কিন্তু বলেননি, এটা যদি আসল আক্রমণ হতো, এতক্ষণে স্রষ্টার সঙ্গে দেখা করতে রওনা হয়ে যেতাম।'

'এখন কী করা উচিত বলে মনে করেন?' প্লেটে সামান্য খাবার তুলে নাড়ছে স্বর্ণা, মুখে তুলছে না।

'এখন প্রথম কাজ নাস্তা শেষ করা। তারপর সতর্ক হতে হবে। কোনও হাতল, রেলিং বা নব হাত দিয়ে ধরা চলবে না। ডাক্তার ফারা তো বলেছেন, আর যাই করুন, চোখ ছোঁবেন না। ওই পথে সবচেয়ে দ্রুত ঠাণ্ডা-জ্বর দেহে বাসা বাঁধে। আমরা প্রতি আধঘণ্টা পর হাত ধোব। অন্য সব নিয়মও মেনে চলব। এখন আমরা জানি কীভাবে ভাইরাস ছড়িয়ে দেয় গোল্ড অভ মার্সে।'

'আর কিছু?'

'এখন প্রশ্ন উঠছে, আমরা কি এখানে ধরা পড়ার ঝুঁকি নেব, না জাহাজ ত্যাগ করব?' খাবার শেষ করছে কাশেম।

'আমি জাহাজে থাকছি, প্রথমে খুঁজে বের করব কীভাবে ভাইরাস ছড়াবে।'

'আমরা কিন্তু ভুলও করতে পারি। ওয়াটার সিস্টেম পরীক্ষা করেছি। এয়ারটেকও। বাদ দিইনি এয়ার-কণ্ডিশনিং প্লাণ্ট। এমন

কী আইস মেকারও বাদ পড়েনি। এখন পর্যন্ত যখন ধরতে পারিনি, তখন আর না-ও ধরতে পারি।'

সামান্য খাওয়া শেষে ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছল স্বর্ণা। 'আমরা প্রতিবার খুঁজবার সময় আরও সতর্ক হয়ে উঠিনি। ...একটা কথা জানেন, আমরা যখন কিছু হারাই, সেটা পাওয়া যায় ঠিক শেষ জায়গাটাতে।'

'কেন?'

'কারণ, পেয়ে গেলেই তো খোঁজা শেষ। আর খুঁজতে যাব কোন্ দুঃখে?'

'তা হলে এখন নতুন জায়গা খুঁজতে হয়। নাকি আগের জায়গাগুলো আবার?'

'সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই তা-ই করব। এখন...'

ডাইনিং রুমের দেয়ালের ইনসুলেশনের ভিতর দিয়ে কেমন অদ্ভুত আওয়াজ শুরু হয়েছে। দু' সেকেণ্ড পর ওরা বুঝল, আসলে আওয়াজ করছে কপ্টারের রোটর। টেবিল ছাড়ল ওরা, বেরিয়ে এল জাহাজের পিছন দিকের ডেকে। ফ্যানটেইলের কাছে রয়েছে এক সুইমিং পুল। তবে এখন ওই নীল পানি ঢেকে দেয়া হয়েছে মোটা কাপড় দিয়ে। ওদিকে কাউকে যেতে দিচ্ছে না ডেক-হ্যাণ্ডরা।

ওই কপ্টার বেল জেটরেঞ্জার, লেজের কাছে জ্বলজ্বলে রঙে লেখা: *মেডিউসা টুর্স।* কয়েক ডেক উপর থেকে পাইলট ও তিন প্যাসেঞ্জারকে দেখতে পেল স্বর্ণা ও কাশেম।

'পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে,' কপ্টারের আওয়াজ ছাপিয়ে বলল কাশেম।

'আপনার কি মনে হয় ওরা আমাদের ধরতে এসেছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। সাধারণত ক্রুজ শিপে কেউ মরে না।

কিন্তু যখন ওদের কেউ বেকায়দা ভাবে মরল, ডিয়েটস কেসলার সতর্ক হয়ে গেল। প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা ক্রুজ লাইনকে রাজি করাল কীভাবে। ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ সহজে জাহাজে নামেন, তবে চলন্ত জাহাজে নামা সবসময় খুব বিপজ্জনক।'

'ওদের পয়সার অভাব নেই।'

জ্যাক স্টাফের উপর দিয়ে এল কপ্টার। ডেক থেকে ময়লা জড় করছিল এক ক্রু, সেগুলো সব হাওয়ায় উড়ে গেল। খানিক উপরে ভাসতে লাগল যান্ত্রিক ফড়িং। পাইলট ছুটবার গতি ও বাতাসের গতিবেগ আন্দাজ করে নিল, তারপর পুলের কাভারের দিকে নামতে লাগল। আকাশে ভার ধরে রেখেছে, স্টিডদুটো নেমে এল কাভারের ছয় ইঞ্চি উপর। একের পর এক লোকগুলো নেমে পড়ল কাপড়ের উপর। কাঁধে ঝুলছে নাইলন ব্যাগ। ওজন কমে যেতেই দ্রুত ইকুইপমেন্ট অ্যাডজাস্ট করল পাইলট, দরজা বন্ধ হতেই উঠতে শুরু করল। দেখতে না দেখতে সরে গেল জাহাজের উপর থেকে।

'জ্যারোন ব্রাঙ্কোর ব্যাপারে মিস্টার ফু-চুং বলেছিলেন, সে দেখতে খানিকটা আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারের মত,' থুতনি তাক করে বলল কাশেম।

'সবার মাঝখানের বিশাল লোকটা?'

'এই তো তাকে পেয়েছেন।'

জাহাজের এক অফিসার এসে অভ্যর্থনা জানাল তিনজনকে, তবে কেউ তারা করমর্দন করল না তার সঙ্গে। লোকগুলোর পরনে সাধারণ পোশাক—খাকি প্যান্ট, পোলো শার্ট ও হালকা উইণ্ডব্রেকার। পিঠে ব্যাকপ্যাক।

'ব্যাগে কি থাকতে পারে?' আনমনে বলল স্বর্ণা।

'বাড়তি আণ্ডারপ্যান্ট, মোজা, একটা রেযর। আর, হ্যাঁ,

অস্ত্র।'

ও জিনিস আমাদের নেই, ভাবল স্বর্ণা। গতকাল পর্যন্ত ধরা পড়লে মস্ত কোনও বিপদে পড়ত না ওরা। নানা রকমের ব্যাখ্যা দিতে চাইত। শেষে ওদের তুলে দেয়া হতো কোনও দেশের কর্তৃপক্ষের হাতে। কিন্তু এখন সব বদলে গেছে ওই জ্যারোন ব্রাঙ্কো ও তার লোক চলে আসতেই। ওই যে, দুই ষণ্ডা লোক এগিয়ে আসছে ওদের দিকে! যদি ওদের ধরতে পারে, ভীষণ কোনও বিপদে পড়তে হবে। কাশেম আর ওর একমাত্র সুবিধা, ব্রাঙ্কো জানে না কয়জন খুঁজছে ভাইরাস। কিন্তু সে সুবিধা হারাতে হতে পারে। জাহাজের অফিসার বা ক্রুরা খুঁজতে শুরু করলেই ধরা পড়বে ওরা!

'হঠাৎ একটা কথা মনে হলো,' রেলিং থেকে সরে গেল কাশেম।

'হ্যাঁ, বলুন?'

'ব্রাঙ্কো কি নিজে ভাইরাস ছাড়বার সময় থাকবে? পার্ল অভ মুনের সবাইকে খুন করবে?'

'করতে পারে। হয়তো তার ভ্যাকসিনেশন আছে।'

'তা-ই আসলে।'

দুপুর হতে না হতে জাহাজের চার ভাগের তিন ভাগ যাত্রী আক্রান্ত হলো ভাইরাসে। এবং খুবই দুঃখজনক, অতি সতর্ক থাকবার পরও, ঠাণ্ডা-জ্বর ধরে বসল স্বর্ণা ও কাশেমকে!

তেরো

মরুভূমির জোরালো শোঁ-শোঁ হাওয়া বইছে এয়ারফিল্ড জুড়ে। যেন আকাশ ঢেকে দেবে ধুলো-বালির বিশাল মেঘ। রানওয়ের মাঝখানে না নেমে তিরিশ ফুট বামে নামতে শুরু করল চার্টার্ড সাইটেশন জেট বিমান। ক্রস-উইণ্ডে থর-থর কাঁপছে ফিউজেলাজ।

যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে ধপ করে আটকে গেল গিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত হলো ফ্ল্যাপগুলো। টার্বোজেট প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে আরও ক' মুহূর্তের জন্য ভাসিয়ে রাখল এয়ারক্রাফট।

কেবিনের একমাত্র যাত্রী এই পরিবেশ নিয়ে চিন্তিত নন। এর চেয়ে ঢের ভয়ঙ্কর ও খারাপ আবহাওয়ায় ল্যাণ্ডিং করেছেন নিজেই। নিস থেকে সোজা লণ্ডনে পৌঁচেছেন, ওখান থেকে ডালাসে। অপেক্ষা করছিল লিজ নেয়া এগযিকিউটিভ জেট। ওটা রওনা হওয়ার পর থেকে কোলে ল্যাপটপ রেখে কিবোর্ডের চাবি টিপে চলেছেন।

সোহেল আহমেদ যখন ইজরায়েলি ব্যালিস্টিক প্রজেক্টাইল ব্যবহারের কথা বললেন, সেটা ছিল আবছা একটা পরিকল্পনা। মাসুদ রানা ছাড়া আর কেউ জানত না ওটা ব্যবহার করতে হলে কী পরিমাণ ডেটা লাগবে। সেগুলো শেষ পর্যন্ত জোগাড় হলো। অর্বিটাল স্পিড, ভেক্টর, পৃথিবীর রোটেশন, টাংস্টেন রডের ম্যাস

ও অন্যান্য হাজারো বিষয় হিসাব জড়িত ছিল। কোড ও অন্য তথ্য সংগ্রহের পর বিভিন্ন কম্পিউটেশন করতে হয়।

এয়ারফোর্স ব্যাকগ্রাউণ্ডের কারণে ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, তার উপর সাহায্য করলেন মিস্টার অনিল, তাঁরা দু'জন মিলে সমাধা করলেন অঙ্কগুলো। এমনিতেই ক্যাপ্টেনের পছন্দের বিষয় ট্রিগোনোমেট্রি, ফলে সহজ হয়ে উঠেছে হিসাবগুলো। অথচ সাধারণ ক্রুরা ধারণা করেছিল এ কাজে হাত দেয়া কঠিন হবে।

কোনও স্যাটালাইট ও কম্পিউটারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে, তা ঠিক করতে হলে, মাসুদ রানা ছাড়া দ্বিতীয় যৌক্তিক ব্যক্তি ছিল আতাসি। তবে সে আবার কার্নিভেলের রাইড সহ্য করতে পারে না। আর মার্ভেলে থাকতেই হবে মাসুদ রানাকে। কাজেই একমাত্র ভরসা ক্যাপ্টেন সিরাজ।

ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ যে কাজ করতে চলেছেন, সে কাজ পৃথিবীর খুব কম মানুষই করেছে। অবশ্য এ মুহূর্তে তাঁর মনে কোনও উত্তেজনা নেই, শুধু জানেন একের পর এক সংখ্যা টাইপ করবেন। বাড়তি মিলবে নতুন এক মজার অভিজ্ঞতা।

টাচ ডাউন করল চার্টার্ড সাইটেশন জেট, সঙ্গে সঙ্গে বিপজ্জনক ভাবে দুলতে শুরু করল দুই চাকার উপর। দ্রুত রাডার চেপে ধরল পাইলট। সোজা না হলে মুখ থুবড়ে পড়বে বিমান। ট্যাক্সি করে চলেছে, যেন থামার তাগিদ নেই। এই এয়ারস্ট্রিপ পুরো তিন মাইল দীর্ঘ। তার শেষে রয়েছে বিশাল এক হ্যাঙার। ওটার দিকে ছুটে চলেছে বিমান। দূরে দেখা গেল হ্যাঙারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা এগযিকিউটিভ জেট। জানালা দিয়ে চেয়ে ক্যাপ্টেন সিরাজ ভাবলেন, এসেছেন তা হলে ভদ্রলোক! হ্যাঙারের দরজার উপর বহু আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া

এক এয়ারলাইনের নাম। তাঁরা পৌঁছে গেছেন গন্তব্যে। সাইটেশন জেটের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। ককপিট থেকে বেরিয়ে এল কো-পাইলট।

'সরি স্যর, এই বালিঝড়ের ভিতর হ্যাঙারে ঢুকবে না প্লেন। তবে চিন্তা করবেন না, আজ রাতেই ঝড় থামবে।'

ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে বেশ কিছু ওয়েদার সাইট দেখেছেন ক্যাপ্টেন সিরাজ। সেখানে লেখা হয়েছে শীঘ্রি এই আবহাওয়া কেটে যাবে। মাঝরাতের পর থেমে যাবে হাওয়া।

ল্যাপটপ বন্ধ করে দিলেন তিনি, সুটকেস নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বিমানের দরজা খুলে দিল কো-পাইলট, ঝুঁকে পড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন। চোখে-মুখে এসে আছড়ে পড়ছে বালি। ঘূর্ণি তৈরি হচ্ছে টারমাকে। বিশাল হ্যাঙারের পাশের ছোট এক দরজা খুলে অপেক্ষা করছে এক লোক, হাত নেড়ে চলেছে। জগিঙের ভঙ্গিতে মাঝখানের চল্লিশ ফুট দূরত্ব পেরুলেন সিরাজ, দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লেন। পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা। হ্যাঙারের মাঝখানে রাখা হয়েছে বড়সড় একটা বিমান, ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা। বিমানের আকৃতি আন্দাজ করা গেল না, তবে এ ধরনের জিনিস আগে কখনও দেখেননি সিরাজ।

'ধূলির কারণে ভীষণ ক্ষতি হয় এসব বিমানের,' হ্যাণ্ডশেক করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল মানুষটা। 'আপনি বোধহয় ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ। আমি চার্লস মার্টিন।'

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে নিজেকে সম্মানিত মনে হচ্ছে, কর্নেল,' বললেন সিরাজ। 'সেই কম বয়সেই আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু পড়েছি।'

বয়স যাট পেরিয়েছে চার্লস মার্টিনের, কুঁচকে গেছে গালের

চামড়া। দেখলে মনে হয় রুক্ষ আবহাওয়ায় থেকেছেন বহু বছর। তবে নীল দুই চোখ ঝিকমিক করছে। অত্যন্ত পৌরুষদীপ্ত, যেন সত্যিকারের কোনও কাউবয়। যে-কোনও সময়ে কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে লড়তে বেরুবেন। কঠোর চোয়ালে দু'দিনের রুপালি দাড়ি। পরনে চিনো, ফ্লাইট ইউনিফর্ম শার্ট ও বম্বার জ্যাকেট। হাত যেন লোহার আঁকশি, অন্তর দিয়ে করমর্দন করেন। কপালের উপর বেসক্যাপ। তার উপর বহুকাল আগের এক শাটল মিশনের লোগো। নিজে তিনি ওই মিশনের পাইলট ছিলেন।

'জীবনের সেরা রাইডের জন্য তৈরি?' জানতে চাইলেন মার্টিন। হ্যাঙারের কোণে অফিস, সেদিকে নিয়ে চলেছেন সিরাজকে। কথার টান শুনে বোঝা গেল টেক্সাসেরই লোক।

মৃদু হাসলেন সিরাজ। 'নিশ্চয়ই!'

অফিসে দু'জন বয়স্ক লোক বসে আছেন। তাঁদের একজনকে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন বলে ধরে নিলেন সিরাজ। অন্যজনের ছবি দেখেছেন। উনি লিজেণ্ডারি এয়ারক্রাফট ডিজাইনার ফ্রান্সিস স্ক্যারাম্যাংগা। অ্যাডমিরালের দিকে চাইলেন সিরাজ। ভদ্রলোকের বয়স সত্তর মত হবে। চোখদুটো যেন অন্তর পড়তে চায়।

'মিস্টার সিরাজ,' উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'রানার প্রিয় মানুষদের সঙ্গে সহজে দেখা হয় না আমার।'

অতি-ভদ্রলোক, ভাবলেন সিরাজ। আগ্রহ নিয়ে করমর্দন করলেন। 'মিস্টার রানার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি, স্যর।'

'তা-ই?' মৃদু হাসলেন জর্জ হ্যামিলটন। 'ও সত্যি অদ্ভুত এক মানুষ। যেমন দুর্দান্ত সাহস, তেমনি মহৎ ওর হৃদয়, মানুষের

প্রয়োজনে জান বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে যে কোনও বিপদে।'

'ঠিক এই একই কথা শুনেছি মিস্টার রানার মুখে,' বললেন সিরাজ। 'আপনার সম্পর্কে। ...শুনেছি এবং দেখছি এখন; তাঁর কথায় নিজে চলে এসেছেন এই মিশন সফল করতে।'

'আর কোনও উপায় ছিল না,' বললেন হ্যামিলটন।

'তারপরও আমি রাজি হতাম না,' একটু আড়ষ্ট স্বরে বললেন মার্টিন। 'তবে আপনি বলেছেন পাইয়ে দেবেন এফএএ আর নাসার কাজ।'

'আরও অনেক কিছু পাওয়ার যোগ্যতা তোমাদের আছে,' মার্টিনের দিকে চাইলেন হ্যামিলটন। 'তোমাদের এয়ারক্রাফট এখনও সার্টিফাই করা হয়নি। এবং করবে না বলে ঠিক করেছে উঁচু পর্যায়ের অফিসাররা। তাদের মতামত পাল্টে যাবে এই মিশন সফল হবার পর। লাল ফিতা সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করব আমি।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন মার্টিন। 'তাতে দেশের উপকার হবে। আপনি যে পারবেন সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই আমার। আপনার সাহায্য ছাড়া এই ফ্লাইটের জন্য টেম্পরারি সার্টিফিকেট বের করা যেত না।' সিরাজের দিকে চাইলেন তিনি। 'আমরা কোন্ সময়ে আকাশে উঠব?'

'নোরাড় থেকে পাওয়া ডেটা অনুযায়ী আমরা ক্যালকুলেশন করেছি। ওই স্যাটালাইট ইন্টারসেপ্ট করতে হবে আগামী কাল সকাল আটটা দশ মিনিট ছয় সেকেণ্ডে।'

'ঠিক সময়ে ওখানে হাজির হওয়া যাবে এমন কথা কিন্তু দিতে পারি না। অলটিচিউড পেতেই লাগবে এক ঘণ্টা। তারপর আরও ছয় মিনিট লাগবে বার্নের জন্য।'

'এক মিনিট এদিক ওদিক হলে খুব একটা অসুবিধে হবে না,' বললেন সিরাজ। 'মিস্টার স্ক্যারাম্যাংগা, আপনি দয়া করে গুরুত্ব দেবেন এই মিশনকে, এটা আমার অনুরোধ। আমাদের উপর নির্ভর করছে কোটি কোটি মানুষের জীবন। শুনতে হয়তো আপনার মনে হচ্ছে বাজে কোনও কল্পকাহিনি থেকে সংলাপ বলছি। কিন্তু যা বলছি তা শতভাগ সত্যি। আমরা যদি ব্যর্থ হই, বদলে যাবে ভবিষ্যৎ পৃথিবী। এবং সেটা সবার জন্যই ভয়ানক খারাপ হবে।'

'ঠিক বলেছেন,' জোর দিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

ল্যাপটপ খুললেন সিরাজ, গোল্ড অভ মার্সের ফুটেজ দেখাতে শুরু করলেন অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ারকে। ভয়াবহ দৃশ্যগুলো ব্যাখ্যা করতে হলো না, সবার মুখ থমথমে হয়ে উঠল। ফুটেজ শেষে সিরাজ বললেন, 'ওখানে যাদের দেখলেন, তাদের বেশির ভাগ লোক নিজেরাই তৈরি করেছে ওই ভাইরাস। কাজ শেষ হতেই তাদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

ল্যাপটপ থেকে চোখ তুলে চাইলেন স্ক্যারাম্যাংগা। ততক্ষণে ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। 'আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। ধরে নিন, পূর্ণ মনোযোগ দেব।'

'অনেক ধন্যবাদ, স্যর।'

'আগে কখনও বেশি জি ফোর্সে থেকেছেন?' জানতে চাইলেন মার্টিন।

'আমি যখন এয়ারফোর্সে ছিলাম, তখন। তিন বা সাড়ে তিন পর্যন্ত।'

'বমি করেন না তো?'

মাথা নাড়লেন সিরাজ। 'না।'

'চলবে।' বন্ধুর দিকে চাইলেন মার্টিন। 'ফ্রান্সিস?'

'ইন্সুরেন্সের একগাদা ফর্ম পূরণ করতে দেব না তোমাকে। ওদের পয়সা দিতে গেলে ফতুর হয়ে যাব আমরা। তার চেয়ে আমার উপর বিশ্বাস রাখো। ঠিক ভাবে উড়বে আমার পাখি। বরং তোমার শরীর ঠিক রাখো। তা হলে আমার পাখিও ভাল থাকবে।'

সিরাজের দিকে চাইলেন মার্টিন।

'প্রতি ছয় মাসে ফিজিক্যাল করা হয়,' বললেন সিরাজ। 'আমার কোনও ধরনের শারীরিক সমস্যা নেই।'

'তো ঠিক আছে। সকালের আগে নানা ধরনের প্রিপারেটরি কাজ শেষ করতে হবে।' কব্জি ঘুরিয়ে বড়সড় রোলেক্স দেখলেন স্ক্যারাম্যাংগা। 'বিশ মিনিট পর আসবে আমার টিম। তোমাদের গিয়ার পরিয়ে ওজন আর ব্যালেন্স বুঝে নিতে হবে। তারপর নিজের এয়ারক্রাফটে ফিরবেন, সিরাজ। ফ্লাইটের সময় আসার আগে কোনও কাজ নেই আপনার। শহরে দুটো হোটেল আছে, ইচ্ছে করলে ওখানে থাকতে পারে আপনার দুই পাইলট। সেক্ষেত্রে তাদের শহরে রেখে আসবে আমার লোক।'

'বেশ। আরেকটা কথা, মিস্টার স্ক্যারাম্যাংগা।'

'বলুন।'

'একবার বিমানটা দেখতে চাই।'

উঠে দাঁড়ালেন ফ্রান্সিস স্ক্যারাম্যাংগা, হাতের ইশারা করে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছু নিয়ে বেরুলেন জর্জ হ্যামিলটন, মার্টিন ও সিরাজ। ঢেকে রাখা বিমানের পাশে দীর্ঘ এক কর্ডে ঝুলছে টিভি কন্ট্রোল রিমোটের মত কি একটা। ওটার বাটন টিপলেন ফ্রান্সিস, ধীরে ধীরে ছাতের দিকে উঠতে লাগল

তারপুলিন।

বিমানটা বরফের মত সাদা, তাতে নীল নীল খুদে নক্ষত্র। কাঁধের কাছে লেখা: *দ্য রিয়েল কংকর্ড।* এ ধরনের বিমান আগে কখনও দেখেননি সিরাজ। চিলের মত ডানা ওটার, দেখতে খানিকটা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের করসারের মত। তবে ফিউজেলাজ বেশ খাড়া। এয়ারফ্রেম থেকে সোজা মাটিতে নেমেছে ল্যাণ্ডিং গিয়ার। সিঙ্গেল সিট ককপিটের উপর দুটো জেট ইঞ্জিন। দুই ডানার নীচে দুটো দণ্ড। সেগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে ত্রিকোণ আকৃতির লেজের অ্যাসেম্বলি।

তবে বিশাল বিমানের নীচে অন্য কিছু মনোযোগ কেড়ে নিল আলম সিরাজের। ওটা রকেট পাওয়ার যুক্ত গ্লাইডারের মত, দেখলে মনে হয় একটা বড় ডানা। ওটার গায়ে লেখা: *রুখ।* বিশাল সেই আরবী পাখি। আসলে বিমানের ফিউয়েল শেষ হলে ওটাকে ছেড়ে আরও উপরে উঠে যায় রুখ। এই গ্লাইডারের গতিবেগ ওঠে দু'হাজার মাইলে। গোটা জিনিসটা একটা সাব-অর্বিটাল স্পেস বিমান। এই প্রথম ব্যক্তিগত ফাণ্ড ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে এ ধরনের জিনিস। এরইমধ্যে এ বিমান অল্টিচ্যুডের রেকর্ড তৈরি করেছে। উঠে গিয়েছিল এক শ' বিশ কিলোমিটার, অর্থাৎ মাটি থেকে প্রায় পঁচাত্তর মাইল উপরে।

দ্য রিয়েল কংকর্ড ওটাকে তুলে দেয় আটত্রিশ হাজার ফুটে। এরপর দুই উড়োজাহাজ বিচ্ছিন্ন হয়, এরপর রুখের রকেট ওটাকে তুলে নিয়ে যেতে থাকে স্বর্গের দিকে। নীচে পড়ে থাকে নীল পৃথিবী। আরও ষাট মাইল উঠবার পর ধীরে ধীরে গ্লাইড করে ফিরতে থাকে বাড়ির উদ্দেশে।

ফ্রান্সিস স্ক্যারাম্যাংগা ও তাঁর দলের বিজ্ঞানীরা চান এই

সাব-অর্বিটাল ডানা ব্যবসায়িক ভাবে ব্যবহার করতে। বহু কোটিপতি চাইবেন এই বিমানে উঠে ভারশূন্য স্পেসের স্বাদ পেতে। আর সেই অভিযানে প্রথম পয়সা খরচ করতে চলেছে মাসুদ রানা ও তার সহযোগীরা। তবে উত্তেজনার জন্য এই অভিযানে আসেননি আলম সিরাজ। সঠিক সময়ে এই ডানায় ভর করে পৌঁছে যাবেন তিনি ইজরায়েলি অস্ত্র প্ল্যাটফর্মের ক্ষতিগ্রস্ত অ্যান্টেনার কাছে। ব্যালফোর জেনকিন্সের কাছ থেকে পাওয়া কোড অনুযায়ী স্যাটালাইটের দিক পাল্টে দেবেন তিনি। ফলে একটা প্রজেক্টাইল খসে পড়বে ইয়োস দ্বীপের উপর। আঠারো শ' পাউণ্ডের টাংস্টেন রড তৈরি করবে ভয়ঙ্কর কাইনেটিক এনার্জি, মুহূর্তে বাতাসে মিশে যাবে কেসলারের সমস্ত পরিকল্পনা, সুখস্বপ্ন।

'দেখতে খুবই বদখত, তা-ই না?' গর্ব করে বললেন ফ্রান্সিস স্ক্যারাম্যাংগা। ফিউজেলাজে হাত বুলিয়ে আদর করে দিলেন।

'উড়বার সময় কেমন লাগে?' জানতে চাইলেন সিরাজ।

'আমি নিজে উঠিনি, তবে দারুণ হওয়ারই কথা।'

টেস্ট পাইলট মার্টিন বললেন, 'মনে হবে কোনওদিন সত্যিকারের রোলার কোস্টারে ওঠেননি।'

খুকখুক করে কেশে উঠলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'জেন্টলমেন, এবার ফিরতে হয় আমার।' একে একে সবার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন তিনি। এ বয়সেও শক্ত করে ধরেন হাত। 'তা হলে থাকুন, সবাই। আর, মিস্টার সিরাজ, আপনি আমার সঙ্গে চলুন, ফিরবার আগে দু'চারটে ব্যাপারে আলাপ সেরে নিই।'

'নিশ্চয়ই।'

দু'জন হাঁটতে শুরু করলেন হ্যাঙারের দরজার দিকে।

'আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি থেকে একটা তথ্য জানানো হয়েছে নুমাকে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ওটা ইএলএফ ট্র্যান্সমিশন ধরতে পেরেছে। সেটা ছিল সম্ভবত রানার কলিগ উর্বশী দাশার। তার সামান্য আগে আরেকটা মেসেজ পাঠানো হয়। বিপুল টাকা খরচ করতে হয় এসব ট্রান্সমিটার তৈরি করতে, কাজেই সতর্ক হয়ে উঠেছি আমরা। আপনারা যা জানতে পেরেছেন তা আর কেউ জানতে পারেনি। জানি রানা কঠোর ব্যবস্থা নেবে। সবসময় যে আইন মেনে চলতে হবে, তা-ও নয়।' অ্যাডমিরালের পাশে হাঁটছেন সিরাজ, কিছু বলতে চলেছেন, এমন সময় আবার মুখ খুললেন অ্যাডমিরাল, 'জানি কখনও কখনও আইন মেনে চলা যায় না। তবে আমি চাইব, রানা যতটা পারা যায় আইন মানবে। অর্থাৎ ডিয়েটস কেসলার ও তার দলের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় নিয়ে লড়বে।

'আমি আপনাদের এই অভিযান সফল করতে সময় দিয়েছি, সেজন্য মস্ত কোনও ক্ষতি হতে পারে আমার। তবে তা নিয়ে ভাবছি না। আপনারা যদি রেসপন্সিভিস্টদের মুখোশ খুলে দিতে পারেন, তারা যদি সত্যিই এ ধরনের দানব হয়ে উঠে থাকে, আমরা তাদের রুখতে কাজে নামব। তবে আগে হাতে পেতে হবে শক্ত প্রমাণ। সেটা আগে আপনাদের খুঁজে বের করতে হবে।'

'আমরা সে-কাজ করছি, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন,' বললেন সিরাজ। 'আইনের ব্যাপারে আপনি যা বলেছেন, তা ঠিক। তবে, এখন যদি আইন মেনে চলি, কোটি কোটি মানুষকে মরতে হবে। আপনি নিজেও দেখেছেন ওই জাহাজে অতগুলো মানুষকে কী নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে ভাইরাস দিয়ে।'

বেশ কঠোর স্বরেই বলেছেন ক্যাপ্টেন।

মৃদু হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'বুঝতে পারছি যোগ্য লোক সংগ্রহ করেছে রানা। সবসময় সাহস ও যোগ্যতা খুঁজে বের করে। ওকে বলবেন, ডিয়েটস কেসলারের বিরুদ্ধে তথ্য খুঁজতে শুরু করেছি আমরা। আশা করি ততক্ষণে ধ্বংস হবে ইএলএফ ট্র্যান্সমিটার।' হ্যাঙারের দরজার কাছে পৌঁছে গেছেন দু'জন। বাইরে তুমুল হাওয়া, কাজেই যা বলবার এখানে বলতে হবে। 'ওই স্যাটালাইট ব্যবহার করার কথা কার মাথা থেকে বেরিয়েছে?'

'মিস্টার রানার বন্ধু সোহেল আহমেদের। আমরা ভাবছিলাম আণবিক বোমা না পেলে ইএলএফ অ্যান্টেনা নষ্ট করা সম্ভব হবে না।'

একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল। ক্যাপিটোল হিলে কিছু গুজব শুনেছেন তিনি। ওই ইজরায়েলি স্যাটালাইট নষ্ট করে দেয় এক দুর্ধর্ষ গুপ্তচর। এমন কী হতে পারে, সে মাসুদ রানা?

একই সময়ে মাসুদ রানার কথা ভাবলেন আলম সিরাজ। সোহেল আহমেদের কাছে জানতে চাওয়ায় তিনি বলেন, ওই স্যাটালাইট নষ্ট করবার জন্য পনেরো দিন ব্যয় করেন মাসুদ রানা। ওই ফ্যাসিলিটির ভিতর ঢুকে বনে যান ইউরি ক্রামোস নামের এক টেকনিশিয়ান। সিনাই কসমোড্রোমের ওই কঠোর সিকিউরিটির ভিতর আণ্ডারকাভার অবস্থায় থাকাটা ছিল নরকে থাকবার মত। মিশন শেষে ফিরে এসে তাঁকে ডাক্তারি পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়। তবে তাঁদের নোটে লেখা ছিলঃ 'আমাদের দেখা সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথার মানুষ এই মাসুদ রানা।'

মিস্টার সোহেলের কাছে জানতে চেয়েছিলেন সিরাজ,

'সত্যিকারের ইউরি ক্রামোসের কী ঘটে?'

'খুন করেছিল কি না জানতে চান? না। সে লোককে তারই কোয়ার্টারে বন্দি করে রেখেছিল।'

আরেকবার হাত বাড়িয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল। 'এবার ফিরব আমি। আপনাদের সাফল্য কামনা করি।'

'ধন্যবাদ।' হাতটা ঝাঁকিয়ে দিলেন সিরাজ। 'ভাল থাকুন।'

ধারালো ছুরি যেমন কাটে নীল মখমলকে, ঠিক সেভাবে মেডিটারেনিয়ান সাগর চিরে ছুটছে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। যখনই সুযোগ মিলছে পরিত্যাগ করছে শিপিং লেন, ব্যবহার করছে প্রচণ্ড শক্তিশালী ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন। যেন উড়ে চলেছে জাহাজ। মাত্র একবার গতি কমাতে হয়েছে স্ট্রেইট অভ মেসিনা পেরুনোর সময়। সে-সময় ইতালির বুট থেকে বিচ্ছিন্ন সিসিলি দ্বীপকে পাশ কাটিয়েছে। চমৎকার আবহাওয়া সহায়তা করছে। সাগর শান্ত, সামান্যতম হাওয়া নেই। তীব্র গতি তুলে আইয়োনিয়ান সাগর পেরিয়ে ইজিয়ান সাগরে ঢুকেছে মার্ভেল।

ঘুমের সময় ছাড়া বেশির ভাগ মুহূর্ত কাটছে রানার অপারেশন্স সেন্টারে। মেইন ভিউয়িং মনিটরের উপর অংশে পিছিয়ে চলেছে ডিজিটাল ঘড়ি। বড়জোর আঠারো ঘণ্টা, তারপর পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে ইয়োস দ্বীপ।

যদি উদ্ধার না করা যায়, দ্বীপের সঙ্গে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে উর্বশী নামের সুন্দর মনের দুঃসাহসী মেয়েটি।

গগল হেলম-এ, অনিল ওয়েপন্স সিস্টেম পরীক্ষারত। ফু-চুং ঘরের পিছনে এক চেয়ারে। কাছের বেঞ্চ সিটে ক'জন কমাণ্ডো। আতাসি রেডিও কন্সোল নিয়ে বসেছে। কিন্তু উর্বশী নিজের সিটে

নেই। নেই স্বর্ণা ও কাশেমও। হাই-টেক এ ঘরের পরিবেশ যেন বদলে গেছে।

'কিছু নেই, বস্,' স্টেশন থেকে বলল আতাসি, হতাশ।

পুরো তিন দফা সময় পেরিয়ে গেছে, কিন্তু যোগাযোগ করেনি স্বর্ণা বা কাশেম। ক্রুজ লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে আতাসি, তারা জানিয়েছে পার্ল অভ মুন জাহাজে কোনও কমিউনিকেশন সমস্যা নেই। আতাসি ওই জাহাজের কমিউনিকেশন সেন্টারে যোগাযোগ করেছে, জানিয়েছে ওর ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে চায়। ওদের বাবা মৃত্যু-শয্যায়। সহানুভূতি ছিল সেক্রেটারির কণ্ঠে, জানিয়েছে সে নিজে কেবিন সি-১৩৩-এ খবর পৌঁছে দেবে। এরপর অনেক সময় পেরিয়েছে, কিন্তু ওই যাত্রী যোগাযোগ করেনি। আগেই হয়তো মারা গেছে তার বাবা। বিরক্ত হয়ে ভেবেছে, নিষ্ঠুর কোনও বন্ধু মশকরা করতে চেয়েছে। ওই একই বুদ্ধি কাজে লাগবে না, সুতরাং সে-চেষ্টা করেনি আতাসি। তা হলে রিসেপশনিস্ট সন্দেহ-প্রবণ হয়ে উঠত।

মার্ভেলের বিপুল অস্ত্র ও দুনিয়ার সেরা কমিউনিকেশন সিস্টেম থাকা সত্ত্বেও, রানার কিছুই করবার নেই। এখন বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আগে ইয়োস দ্বীপ রেঞ্জে আসতে হবে, এরপর ভাল কোনও সুযোগ খুঁজতে হবে। শত্রুদের ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে রয়েছে উর্বশী, যোগাযোগও করেছে, কাজেই হয়তো কোনও কৌশল খাটিয়ে বেরিয়ে আসবে সে। সে-সময় ধারেকাছে থাকতে চায় রানা। মার্ভেল এখন ছুটে চলেছে ওই দ্বীপ লক্ষ্য করে।

এদিকে বিশ্রী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে স্বর্ণা ও কাশেমকে নিয়ে। রানা জানে না পার্ল অভ মুনে কী ঘটছে। শুধু আন্দাজ

করতে পারছে, গোপনে জাহাজে উঠে পড়া মানুষদের খুঁজতে শুরু করেছে ক্রুরা। হয়তো বন্দি হয়ে গেছে ওরা। আর ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে কেসলার। এদিকে মার্ভেলের ওরা এখনও বুঝে ওঠেনি কী জানাতে চেয়েছে উর্বশী। মৃত্যুর চেয়ে খারাপ কী? যাক সে ভাবনা, এখন ওদের প্রথম কাজ হয়ে উঠেছে ওই ট্র্যান্সমিটার ধ্বংস করা। এদিকে পার্ল অভ মুনে ভাইরাস আক্রমণ হলে সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত হবে স্বর্ণা আর কাশেমও।

কম্পিউটারে একটা নির্দেশ দিল রানা। মেইন মনিটর থেকে উধাও হলো ডিজিটাল ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটা। বড় বেশি দ্রুত চলছিল ওটা! যেন বারবার বলছিল, আর কিন্তু কিছুক্ষণ পর... এখন ঘড়িতে শুধু ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা। ওগুলো থাকাই যথেষ্ট।

চোদ্দ

'আমাদের বেভারলি হিলসের বাড়িতে রেইড করেছে এফবিআই!' পাথরের নীচে তৈরি করা অ্যাপার্টমেণ্টে লিঙ্ক চ্যাপেলের উদ্দেশে বলল ডিয়েটস কেসলার। ভয়ের চাপে ভেঙে গেল তার কণ্ঠস্বর। কেঁপে উঠল।

সোফায় বসেছে চ্যাপেল, পা নাচিয়ে চলেছে। 'কী বললে, ডিয়েটস?'

'আমাদের বেভারলি হিলসের বাড়িতে, মানে, আমাদের হেড-কোয়ার্টারে রেইড করেছে এফবিআই। কয়েক মিনিট আগে। স্যাটালাইট ফোনে যোগাযোগ করেছে আমার সেক্রেটারি। এফবিআইয়ের হাতে সার্চ অ্যাণ্ড সিইযার ওয়ারেন্ট ছিল। আমাদের সমস্ত ফিনানশিয়াল রেকর্ড জব্দ করেছে। সেই সঙ্গে সদস্য তালিকা। ওদের কাছে আরেকটা ওয়ারেন্ট ছিল। বার্থা আর আমার নামে আয়কর ফাঁকি দেয়ার অভিযোগ। কপাল ভাল যে বার্থা ওর বোনের কাছে বেড়াতে গেছে। কিন্তু বিগ বিয়ার থেকে ওকে গ্রেফতার করতে পারে। এই অবস্থায় কী করব আমরা? ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে, লিঙ্ক। জেনে ফেলেছে সব।'

'শান্ত হও! ওরা কিছুই জানেনি। এফবিআই গেস্টাপোদের মত একই কৌশল নিয়েছে। ওরা যদি আমাদের পরিকল্পনা জানত, ক্যালিফোর্নিয়ায় যারা রয়ে গেল, সবাইকে গ্রেফতার করত। শুধু তাই নয়, টার্কিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই ফ্যাসিলিটিতেও হামলা করত।'

'কিন্তু সব ফাঁস হতে চলেছে, আমাদের গলা টিপে ধরছে ওরা,' বলল ডিয়েটস। ধপ করে বসে পড়ল সে চেয়ারে, দু'হাতে ঢেকে ফেলেছে মুখ।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, বাছা। বড় কিছু ক্ষতি হয়নি।'

'এসব কথা আপনার মুখে মানায়,' রাগী-জেদি শিশুর মত বলে উঠল কেসলার। 'কেউ আপনাকে গ্রেফতার করছে না। আড়ালে লুকিয়ে আছেন, সব দোষ তো এসে পড়বে বার্থা আর আমার উপর।'

'চুপ করো, কেসলার! আমার কথা মন দিয়ে শোনো। এফবিআই জানে না আমরা কী অর্জন করতে চলেছি। ওরা

বড়জোর ভাবছে কিছু একটা করতে চাইছি। তার মানে কী? মানে, ওরা কিছুই জানে না। ছেঁড়া জাল দিয়ে সাগর থেকে মাছ ধরতে চাইছে। আমাদের রেকর্ডগুলো পাওয়ার জন্য সাধারণ ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছে। আশা করছে ওগুলোর ভিতর এমন কিছু থাকবে, যেটা আমাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু আমরা জানি, ওসবে আসলে কিছুই নেই।

'আমরা প্রথম থেকেই সমস্ত রেকর্ড পরিষ্কার রেখেছি। রেসপন্সিভিস্টদের সংগঠন একটা মুনাফাহীন প্রতিষ্ঠান। কাজেই আমরা আয়কর দিই না। তবে নিজেদের আর্থিক বিবরণী নিয়মিত আইআরএস-কে সরবরাহ করি। তুমি আর বার্থা যদি বড় ধরনের ভুল না করে থাকো, তোমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না ওরা। তোমরা যে বেতন নাও, নিশ্চয়ই সেজন্য আয়কর দাও? সেক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই। এখন প্রশ্নঃ ঠিক ঠিক আয়কর দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। প্রতিবছর।'

'তা হলে মন থেকে ফালতু চিন্তা দূর করে দাও। ওই বাড়ির ভিতর এমন কিছু থাকবার কথা নয়, যেটা আমাদের ধরিয়ে দেবে। ওরা বড়জোর আবিষ্কার করবে আমরা ফিলিপিন্সে কাজ করেছি। সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারব, ওখানে ফ্যামিলি-প্ল্যানিং ক্লিনিক ছিল। ওই দেশের বেশির ভাগ মানুষ ক্যাথোলিক হওয়ায়, যথেষ্ট ক্লায়েন্ট পাওয়া যায়নি।'

'কিন্তু ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়ার এই মুহূর্তে রেইড হওয়া!'

'কো-ইনসিডেন্স।'

'আমি তো শুনেছি আপনি এসব বিশ্বাস করেন না।'

'করি না, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিশ্বাস করছি। এফবিআই কিছুই জানে না, ডিয়েটস। আমার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারো।'

কেসলারের মুখের ভাব পাল্টে না যাওয়ায় আবার বলল, 'মন দিয়ে শোনো। তুমি সাংবাদিক ডেকে প্রেস রিলিজ দেবে। তাদের জানাবে অবিশ্বাস্য এবং অকল্পনীয় ভাবে তোমাদের নামে বিশ্রী কুৎসা রটানো হয়েছে। এবং তোমরা দাবি করছ, এফবিআই যেন বেআইনী ভাবে তোমাদের ব্যক্তিগত এবং নাগরিক অধিকার বিনষ্ট না করে। যে ভাবে তোমাদের ভোগান্তির ভিতর ফেলা হয়েছে, তোমরা ঠিক করেছ আইনের আশ্রয় নেবে। আমি কী বলছি সেটা ভাল করেই বুঝতে পারছ। ...এখন, আমরা দ্বীপে লোক আনবার জন্য যে কপ্টার রেখেছ, ওটা এখানে রয়ে গেছে। সেই কপ্টার নিয়ে ইযমার যাব আমি, ওখানে জেট প্লেন অপেক্ষা করছে আমার জন্য। বার্থাকে বলবে সে যেন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বেরিয়ে আসে। ফিনিক্সে আমার দুই মেয়ের সঙ্গে দেখা করব, ফিরিয়ে নিয়ে আসব এখানে। ...আমরা ঠিক করি মূল ভাইরাস আক্রমণের আগে বাঙ্কারে যেতে হবে না, তবে দু'চার মাস আগে হলেও খুব অসুবিধে হওয়ার কিছু নেই। আর ওই ভাইরাস ছড়িয়ে যাওয়ার পর পাগল হয়ে উঠবে প্রতিটি দেশের সরকার। আমেরিকান ফেডারাল গভার্নমেন্ট তখন তোমার ওই সামান্য অভিযোগের দিকে ফিরে চাওয়ার সময় পাবে না।'

'আমরা টিভি সাংবাদিকদের ডাকতে পারি।'

'তা করতেই পারো।' সোফা ছেড়ে কয়েক পা এগুলো চ্যাপেল, কোঁচকানো হাত রাখল ডিয়েটসের কাঁধে। 'ভয় নেই, সব ঠিক চলবে, ডিয়েটস। পার্ল অভ মুনে আমাদের যে লোক খুন হয়েছে, তার খুনিদের খুন করবে তোমার লোক ব্রাঙ্কো। অল্প কয়েক ঘণ্টার ভিতর আমাদের পঞ্চাশটা টিম ভাইরাস নিয়ে তৈরি থাকবে। ধরে নাও গন্তব্যে পৌঁছে গেছি আমরা। সময় হয়ে এল

মহাক্ষণের। কাজেই সামান্য ওই রেইড নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। এখন ভেবে দেখো, ওরা যদি ওই বাড়ি আর তার ভিতরের সব জব্দ করে, তাতেই বা কী? আমরা পৌঁছে গেছি দুনিয়ার সেরা সময়ের কাছে, সাফল্যের কাছে। আমাদের কাছ থেকে সেটা কেড়ে নিতে পারবে না কেউ। দুনিয়ার কারও পক্ষে এখন আমাদেরকে ঠেকানো অসম্ভব।'

শ্বশুরের দিকে চাইল ডিয়েটস কেসলার। লিঙ্ক চ্যাপেলকে দেখতে লাগছে সবে প্রৌঢ়, কিন্তু আসলে নব্বুই পার হয়ে গেছে বয়স। এই মানুষটা তার শ্বশুর, কিন্তু এর চেয়ে অনেক বড় কিছু। এমন এক সাধু, এমন এক পয়গম্বর, যিনি স্বর্গীয় শক্তি নিয়ে এসেছেন তাকে পৃথিবীতে সাফল্য এনে দিতে। এই মানুষটা যখন প্রতিষ্ঠার শীর্ষে, তখন সরে দাঁড়িয়েছেন নিজের কাজ থেকে, বাইরে থেকে রক্ষা করেছেন নিজের সংগঠনকে। তার চেয়েও বড় কথা, নিজ পরিচয় ত্যাগ করে ওদের সবাইকে নিয়ে এসেছেন আজকের এই পর্যায়ে।

আমি আগে কখনও কোনও কারণে লিঙ্ক চ্যাপেলকে সন্দেহ করিনি, ভাবল ডিয়েটস কেসলার। এখন মনের ভিতর বিচ্ছিন্ন চিন্তা আসছে, কিন্তু ওগুলো উড়িয়ে দেব। আমি চিনি এই মানুষটা আমাকে সঠিক পথে এগিয়ে নেবেন। উঠে দাঁড়াল কেসলার, হাত রাখল তার কোঁচকানো হাতের উপর।

'দুঃখিত, লিঙ্ক। এই দুর্বলতা আমি কাটিয়ে উঠব, এগিয়ে যাব গন্তব্যের দিকে। কী-ই বা হবে আমাকে গ্রেফতার করলে? ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়া হবে গোটা দুনিয়া জুড়ে। মুহূর্তে থমকে যাবে বাড়তে থাকা জনসংখ্যা। আর আপনি যা বলেছেন, মানুষ নতুন করে ফিরে পাবে স্বর্ণযুগ।'

'দেখবে, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর আমাদেরকে বলা

হবে দুনিয়ার সেরা মানব। আমাদের মস্ত সব মূর্তি তৈরি করবে ভবিষ্যতের মানুষ। আসলে আমরাই তো অল্প কয়েকজন মানুষ যারা সঠিক পথ দেখিয়েছি।'

'লিঙ্ক, কখনও কি ভেবেছেন, এমন হওয়ার বদলে ওরা আমাদের চরম ঘৃণা করবে? কোটি কোটি মানুষকে বন্ধ্যা করে দেয়া...'

'একদল লোক ঠিকই এখন আমাদের ঘৃণা করবে, তবে কয়েক যুগ পর মানসিকতা বদলে যাবে। মানুষ তো এখনই গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। এমন চলতে পারে না। ঠিক তেমনই একটা বিষয় জনসংখ্যা। তুমি হয়তো বলতে পারো, আমরা কোন্ অধিকারে এত মানুষের জীবন বদলে দেব?' চকচক করছে চ্যাপেলের দুইচোখ। 'আমি শুধু বলব, আমরা যৌক্তিক মানুষ, আবেগ দিয়ে চলি না।

'আমরা এটা করতে পারছি এজন্য যে, আমরা সঠিক কাজ করছি। এর কোনও বিকল্প নেই। জোনাথান সুইফটের এ মডেস্ট প্রোপোজালের কথা শুনেছ তুমি। তখন সতেরো শ' উনত্রিশ। পুরো ইংল্যাণ্ড ছেয়ে গেছে এতিম ছেলে-মেয়ে দিয়ে। উচ্ছন্নে গেছে দেশ। উনি বলেন, আমাদের উচিত এসব বাচ্চাগুলোকে খেতে শুরু করা। তাতে অনেক সমস্যা দূর হবে। তার আশি বছর পর বিখ্যাত টমাস ম্যালথাস প্রকাশ করলেন তাঁর পপুলেশন গ্রোথের উপর রচনা। তিনি লেখেন: মানসিক ভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নইলে মানুষের সংখ্যা আরও দ্রুত বাড়তে থাকবে।

'তবে মানুষ তা মানবে না। কয়েক যুগ হলো কম পয়সায় দেয়া হয়েছে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বড়ি ও কণ্ডোম। কিন্তু তারপরও বেড়েই চলেছে মানুষের সংখ্যা। আমি লিখেছি, আমরা নিজেদের

বদলে নিতে পারি না। সত্যি তা প্রমাণ হয়েছে। কাজেই ভেবেছি, জাহান্নামে যাক মানুষের যৌন প্রবৃত্তি। সেটা আমরা রুখতে পারব না। বদলে জনগণের জন্ম-দান ক্ষমতা কমিয়ে দেব। এটাকে তুমি বলতে পারো আমাদের নিজেদের রক্ষা করার একমাত্র উপায়। পৃথিবী রক্ষা করতে হলে এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আগামী এক শ' বছরের ভিতর এই পৃথিবী হয়ে উঠবে অপরূপ এক স্বর্গীয় উদ্যান।'

লিঙ্ক চ্যাপেলের কণ্ঠ সাপের মত হিসহিস করে উঠল, 'আর সত্যি বলতে, এশিয়া ও আফ্রিকার নিচু জাতের লোকগুলো কী ভাববে, তাতে আমাদের কী যায় আসে? ওরা যদি এতই বুঝত, তা হলে অতিরিক্ত জন্ম দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করতে চাইত না। ওদের মত অর্ধ-মানুষদের নিয়ে ভাবলে আমাদের চলবে না। আমরা মেষপালকের মত, ভেড়াগুলোকে সঠিক পথে নিয়ে যাব। তোমার কি মনে হয়, ডিয়েটস, ভেড়া কী চিন্তা করে তা নিয়ে ভাবে মেষপালক? আমরা ওদের চেয়ে ঢের বেশি বুঝি, ডিয়েটস। আমরা ওদের চেয়ে অনেক উঁচু পর্যায়ের লোক।'

পনেরো

স্টেক ও ডিম অ্যারোনটদের বিখ্যাত নাস্তা, তবে ওগুলো খেতে বিশেষ আগ্রহ বোধ করলেন না ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ।

সামনের এই সাব-অর্বিটাল ফ্লাইটের জন্যও কোন উত্তেজনা বোধ করছেন না। মনের ভিতর কাজ করছে ভয়, যদি বিফল হন! বাইরের মরুভূমির মত বারবার শুকিয়ে আসছে বুক। বুঝতে পারছেন এটা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় একাকী মিশন। হয়তো ভবিষ্যতে কখনও এমন মিশন আর মিলবে না। একটু পর তিনি গোটা বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন।

মন থেকে সব ভাবনা দূর করতে চাইছেন। বার বার মনে পড়ছে উর্বশীকে। ইয়োস দ্বীপে বন্দি মেয়েটা—বড় ভদ্র, নম্র। তার জীবন-প্রদীপ নিভিয়ে দিতে চলেছেন তিনি। রাতেও ভাল ঘুমাতে পারেননি এই কথা ভেবে।

'আপনার কোনও সমস্যা হয়নি তো?' হ্যাঙার অফিসের ভিতর ফ্লাইট সুট পরবার সময় জানতে চাইলেন চার্লস মার্টিন। তাঁরা যে স্পেস বিমানে উঠবেন, সেটার কেবিন প্রেশারাইযড, কাজেই পোশাক ঢিলাঢালা ওভারঅল। 'আপনার মুখ ফ্যাকাসে লাগছে।'

'নানান চিন্তা আসছে, কর্নেল,' বললেন সিরাজ।

'ফ্লাইটের ব্যাপারে মোটেই ভাববেন না,' বললেন প্রাক্তন শাটল পাইলট। 'ঠিকই উপরে উঠব। আবার ফিরেও আসব।'

'ফ্লাইটের জন্য আমি ভাবছি না। ভাবছি কাজটা সঠিক ভাবে করতে পারব কি না।'

এক টেকনিশিয়ান উঁকি দিল অফিসে। 'জেন্টলমেন, হাতে সময় নেই। তৈরি হয়ে নিন। ফ্লাইট ডিরেক্টর বিশ মিনিটের ভিতর দ্য রিয়েল কংকর্ডকে রওনা করিয়ে দেবেন।'

লকার থেকে তাড়াহুড়ো করে হেলমেট তুলে নিলেন মার্টিন। 'তা হলে তো সময় নেই!'

পাঁচ মিনিট পর বিশাল কংকর্ডের নীচে রুখ নামের

গ্লাইডারের ডানার কাছে পৌঁছে গেলেন তাঁরা। ভোরের আগ থেকে কাজে ব্যস্ত ছিলেন সিরাজ, নিজের সিটের পাশে রেখেছেন ল্যাপটপ কম্পিউটার ও পোর্টেবল ট্র্যান্সমিটার। এবার গ্লাইডারে উঠে পড়লেন তাঁরা। সামনের পাইলট পজিশন এড়িয়ে পিছনের সিটে বসলেন সিরাজ। বুকের কাছে হাত তুলে রেখেছেন। টেকনিশিয়ানরা তাঁকে আচ্ছামত আটকে দিল বেল্ট দিয়ে। দু'জন তাঁরা যেন গ্রাঁ প্রি'র ড্রাইভার। সামনে চেয়ে একটু উপরের দিকে জোড়া জানালা দেখলেন সিরাজ। ওখান দিয়ে দেখা যায় উপরের বিশাল মাদার শিপ। দু'পাশে খুদে জানালা। সামনের সিটে বসেছেন মার্টিন, আলাপ করছেন ফ্লাইট ডিরেক্টর ফ্রান্সিস স্ক্যারাম্যাংগার সঙ্গে।

কমিউনিকেশন পোর্টে হেলমেটের জ্যাক দিলেন সিরাজ, অপেক্ষা করলেন। মার্টিনের আলাপ শেষ হলে রেডিও চেক করবেন ফ্লাইট ফ্রিকোয়েন্সির, এরপর পাল্টে নেবেন অন্য ফ্রিকোয়েন্সিতে। তখনও এক কানে শুনবেন পাইলটের বক্তব্য।

'আপনার কী খবর, ক্যাপ্টেন? সব ঠিকঠাক? ওভার।' ভেসে এল আতাসির কণ্ঠ।

'রিডিং ফাইভ বাই ফাইভ। ওভার।'

'টেলিমেট্রি রিসিভ করবার জন্য তৈরি থাকুন। শুরু হলো: থ্রি, টু, ওয়ান, মার্ক।' ল্যাপটপের কি টিপলেন সিরাজ। এবার পুরো ফ্লাইট মনিটর করবে আতাসি। ইজরায়েলি স্যাটালাইট ঠিক কোথায় তা জানা যাবে মার্ভেল থেকে। সিরাজকে দেয়া হয়েছে ওয়েবক্যাম, ওটার কারণে মার্ভেলের সবাই সব দেখতে পাবে। 'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন, সিগনাল স্বাভাবিক। ওভার।'

'বেশ, আর দশ মিনিট পর রওনা হব সময় মত আপডেট

পাবেন। ওভার।'

'রজার। গুড লাক। ওভার।'

খটাং-খটাং আওয়াজ তুলে খুলে গেল বিশাল হ্যাঙারের দরজা। ভিতরে এসে পড়ল নতুন দিনের লালচে আলো। ওয়ার্কাররা ঠেলে নিয়ে চলেছে দ্য রিয়েল কংকর্ডকে, বের করে আনা হলো হ্যাঙার থেকে। রানওয়ের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুরানো এক মোবাইল হোম। ওটা ফ্লাইট ডিরেক্টরের কন্ট্রোল সেণ্টার। ওটার ছাতের উপর একগাদা অ্যাণ্টেনা ও দুটো ঘুরন্ত ডিশ।

'পিছনে আপনার অবস্থা কী?' কাঁধের উপর দিয়ে চাইলেন মার্টিন।

সিরাজ কিছু বলবার আগেই কংকর্ডের ফিউজেলাজের উপর গর্জে উঠল দুই টার্বো জেট। ঝালাপালা হয়ে গেল কান। এবার রেডিওতে ওই একই প্রশ্ন করলেন মার্টিন।

'সামান্য উত্তেজিত,' বললেন সিরাজ।

'একটা কথা মনে রাখবেন, আপনার কন্সোলে লাল একটা বাতি জ্বলে উঠবে। তখন বুঝতে হবে দশ সেকেণ্ড পর বার্ন শেষ হবে। পাঁচ সেকেণ্ড থাকতে বাতি হবে হলুদ। বাতি সবুজ হওয়ার মানে থেমে গেছে রকেট মোটর। ঠিক সে সময়ে আমাদের উচ্চতা হবে আন্দাজ পঁচাত্তর মাইল। তবে মোটর থেমে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে নীচের দিকে নামা শুরু হবে। কাজেই যা করার তাড়াতাড়ি করবেন।'

'বেশ।'

চাকা গড়িয়ে চলেছে কংকর্ডের। বললেন মার্টিন, 'তা হলে রওনা হয়ে গেলাম।'

ঝোলানো ডানা নিয়ে ধীরে চলেছে মাদার শিপ, চলে এল

রানওয়েতে, স্থির হলো সেন্টার স্ট্রিপের উপর। পরক্ষণে বাড়তে লাগল গতি। পুরো পাওয়ার দেয়া হয়েছে ইঞ্জিনগুলোতে। এমন ভাবে কংকর্ড তৈরি, রুখকে তুলে দেবে আটত্রিশ হাজার ফুট উপরে, তবে নিজে ওটা ভাল ডাইন্যামিক এয়ারক্রাফট নয়। প্রায় সম্পূর্ণ রানওয়ে খরচ করে অলস ভঙ্গিতে ভেসে উঠল বাতাসে। উঠে চলেছে ধীরে ধীরে। পাশের জানালা দিয়ে মরুভূমি চোখে পড়ল, সেখানে বিমানের বিশাল ছায়া। দেখলে মনে হয় সায়েন্স ফিকশন সিনেমা থেকে নেয়া হয়েছে ভিনগ্রহের ছবি।

একঘণ্টা ঘুরে উচ্চতা পেল কংকর্ড। এ সময় আরেকবার ইকুইপমেন্ট পরীক্ষা করলেন সিরাজ। মার্টিন চুপচাপ নিজ সিটে বসে রইলেন, কখনও খেললেন ফ্লাইট সিমুলেটর গেমস।

সিরাজের হিসাব অনুযায়ী দশ মিনিট আগে পৌঁচেছেন তাঁরা। কাজেই বাংলা অঙ্কের চারের মত আকাশে একই উচ্চতায় ঘুরতে লাগল বিমান। তাঁদের অনেক উপরে ইজরায়েলি স্যাটালাইট দ্রুত ছুটে চলেছে। শাটল বা ইণ্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন ইকুয়েটার ধরে চলে, কিন্তু অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রজেক্টাইল অস্ত্রটি পৃথিবীর এক পোল থেকে শুরু করে অন্য পোল পর্যন্ত ঘুরতে থাকে। এর ফলে প্রতি চোদ্দদিনে পৃথিবীর প্রতিটি ইঞ্চি কাভার করে। এ মুহূর্তে ওটা রয়েছে ওয়াইয়োমিঙের উপর, প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচ হাজার মাইল গতি তুলে ছুটছে। বর্তমান অর্বিটাল ট্র্যাক অনুযায়ী ওটা যাবে না ইয়োস দ্বীপের উপর দিয়ে। সেজন্য লাগবে আরও এক সপ্তাহ। আর সে কারণেই একটা সিগনাল পাঠাবেন সিরাজ। ম্যানুভারিং রকেট ফায়ার করলে পাল্টে যাবে স্যাটালাইটের গতি-পথ। তখন, সব যদি ঠিকমত চলে, ওই স্যাটালাইটের রেঞ্জে পড়বে ইয়োস দ্বীপ। ঠিক আট ঘণ্টা পর টাংস্টেন রড ছুটবে ওটার

দিকে।

'আর এক মিনিট,' জানালেন ফ্লাইট ডিরেক্টর ফ্রান্সিস স্ক্যারাম্যাংগা। 'প্রতিটি বোর্ড সবুজ।'

'রজার। ষাট সেকেণ্ড বাকি।'

সিরাজের কন্সোলে উল্টো সময় গুনছে এক ঘড়ি। এদিকে ড্যাশবোর্ডের ডিজিটাল স্পিড ইণ্ডিকেটর জানিয়ে চলেছে বর্তমান গতিবেগ ঘণ্টায় চার শ' মাইল।

'বিশ সেকেণ্ড... দশ... পাঁচ... চার... তিন... দুই... এক। সেপারেশন করুন।'

মাদার শিপের পাইলট লিভার টান দিতেই কংকর্ডের পেটের নীচ থেকে সরে গেল রুখ। কয়েক সেকেণ্ডে পিছিয়ে গেল স্পেস প্লেন, কংকর্ডের সঙ্গে তৈরি হলো দূরত্ব, তারপর লিকুইড রকেট মোটর চালু করলেন মার্টিন।

সিরাজের মনে হলো পঞ্চ ইন্দ্রিয় একই সঙ্গে আপত্তি করে উঠেছে। ওঁরা যেন দাঁড়িয়েছেন জলপ্রপাতের নীচে, প্রচণ্ড আওয়াজ তুলছে রকেট ইঞ্জিন। বুকের ভিতর ধুপ-ধাপ লাফিয়ে চলেছে হৃৎপিণ্ড। থর-থর করে কাঁপছে এয়ারফ্রেম, বাধ্য হয়ে দুই হাতে দু'পাশের হাতল চেপে ধরলেন সিরাজ। মনে হলো কেউ তাঁকে গেঁথে দিতে চাইল সিটে। ত্বকের নীচে শিরশিরে অনুভূতি, যেন শিরিষ কাগজ ঘসে চলেছে কেউ। মুখের ভিতর শুকিয়ে গেল। শিরার ভিতর ছুটছে অ্যাড্রেনালিন। স্পিডোমিটারের দিকে চাইলেন সিরাজ, এ মুহূর্তে তাঁরা পৌঁছে গেছেন প্রায় সাউণ্ড ব্যারিয়ারের কাছে।

সিটের সঙ্গে তাঁকে ঠেসে ধরেছে জি ফোর্স। বিমানের নাক উপরে তুলে দ্রুত উঠে চলেছেন মার্টিন। ভয়ানক ভাবে কাঁপতে লাগল বিমান। সিরাজের মনে হলো যে-কোনও সময়ে

এয়ারফ্রেম চুর-চুর হয়ে ভেঙে পড়বে। তারপর হঠাৎ সাউণ্ড ব্যারিয়ার পেরুলেন তাঁরা। উধাও হয়ে গেল প্রচণ্ড আওয়াজ, রইল শুধু ইঞ্জিনের কম্পন ও কড়কড়ে একটা শব্দ।

রকেট মোটর মাত্র এক মিনিটে তাঁদের তুলে নিয়ে গেছে এক লাখ ফুট উপরে। সামলে নিতে শুরু করলেন সিরাজ। ধীরে ধীরে কমছে হৃৎস্পন্দন। অন্তরে অনুভব করলেন স্পেস বিমানের প্রচণ্ড শক্তি। স্বাভাবিক হতে শুরু করলেন।

এয়ারস্পিড গজ জানিয়ে দিল তাঁরা প্রতি ঘণ্টায় দুই হাজার মাইল গতিতে ছুটে চলেছেন। উপরের জানালার দিকে চাইলেন সিরাজ। দ্রুত নিভে আসছে আলো, কালো হয়ে আসছে আকাশ। অ্যাটমসফিয়ার চিরে সগর্জনে ছুটে চলেছে রকেট ইঞ্জিন। তারপর জাদুর মত দেখা দিল একের পর এক নক্ষত্র। প্রথমে অস্পষ্ট, তারপর উজ্জ্বল হলো ক্রমে। কখনও একসঙ্গে এত বেশি তারা দেখেননি সিরাজ। সংখ্যা আরও বাড়তে লাগল। একটু পর মনে হলো অন্ধকার কাটছে, বদলে মিটমিট করছে অজস্র দীপ। দেখলে মনে হয় হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায়।

হঠাৎ সিরাজের সামনের ইণ্ডিকেটর লাল হয়ে উঠল। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলেন না দেখতে না দেখতে কেটে গেছে চার মিনিট। জি ফোর্সকে কাটিয়ে হাত নড়ে উঠল সিরাজের, কোলের উপর ল্যাপটপ।

'দশ সেকেণ্ড,' মার্ভেলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন সিরাজ। আতাসি যদি জবাব দিয়ে থাকে, তা হারিয়ে গেছে রকেট ইঞ্জিনের আওয়াজে।

অল্টিমিটারে দ্রুত ঘুরছে সংখ্যাগুলো। হলুদ বাতি জ্বলে উঠতে পৌঁছে গেলেন তাঁরা তিন লাখ পঁচানব্বুই হাজার ফুটে। পরের পাঁচ সেকেণ্ডে আরও এক মাইল উপরে উঠল রুখ। জ্বলে

উঠল সবুজ ইণ্ডিকেটর, পৌঁছে গেছেন তাঁরা চার লাখ ফুট উপরে।

কি বোর্ডে কমাণ্ড টাইপ করলেন সিরাজ। ঠিক তখন শেষ ফিউল খরচ করে বন্ধ হয়ে গেল মোটরের স্লাইকোনিক পাম্প। কোথাও রইল না সামান্যতম আওয়াজ। এতক্ষণ জি ফোর্স তাঁদের গেঁথে রেখেছিল সিটে, সেটা হঠাৎ দূর হয়ে গেল। হঠাৎ সিরাজ টের পেলেন, তিনি ভারশূন্য হয়ে গেছেন। কখনও এমন লাগে রোলার কোস্টারে। ভাবতে অবাক লাগল, পৌঁছে গেছেন মহাশূন্যে, এখানে বলতে গেলে কোনও মাধ্যাকর্ষণ নেই।

ককপিটে চার্লস মার্টিন আর্মেচার অ্যাক্টিভেট করলেন। রুখের ফিউজেলাজের সঙ্গে একটা অ্যাঙ্গেল নিয়ে উঁচু হয়ে উঠল ডানা। বাড়তি ড্র্যাগ ও নতুন এই ডাইন্যামিক কনফিগারেশনের ফলে অবিশ্বাস্য স্থির রইল বিমান। ধীরে নামতে শুরু করল পৃথিবীর দিকে। বহু পথ পেরিয়ে আবারও ফিরবে টেক্সাসের হানাহান এয়ারফিল্ডে।

'কী মনে হয়?' জানতে চাইলেন মার্টিন।

'এক মিনিট, স্যর।'

মার্টিন ধারণা করলেন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সিরাজ, কাজেই কাঁধের উপর দিয়ে চাইলেন। না, কম্পিউটারের উপর ঝুঁকে পড়েছে বাঙালি ক্যাপ্টেন। জীবনের সেরা রাইড পেয়েছে, এখন মন দিয়েছে কাজে। মানুষটার মনোযোগ দেখে মনে মনে প্রশংসা করলেন মার্টিন। তাঁর জীবনের প্রথম শাটল মিশনের কথা ভাবতে লাগলেন। সেবার প্রথম এক ঘণ্টা শুধু মহাশূন্যের দিকে চেয়ে ছিলেন।

'আবার একবার বলুন, ক্যাপ্টেন সিরাজ। ওভার।'

'স্যাটালাইটের অনবোর্ড টেলিমেট্রির কনফার্মেশন পেয়েছি।

রকেট ফায়ার হয়েছে। ম্যানুভারিং থ্রাস্টারগুলো অর্বিট পরিবর্তন করছে। ওটার কম্পিউটারকে তথ্য দিয়েছি। ফায়ার করবার আগে তালিকা চেক করছে। হ্যাঁ, কাজ হয়ে গেছে!'

মনের ভিতর কেমন যেন অনুভূতি, সিরাজ শুধু মনে মনে ভাবলেন, আমার কাজ শেষ করেছি। এই পরিকল্পনা কাজে লেগেছে। এবং সেজন্য ইজরায়েলি বিজ্ঞানীদের প্রশংসা করতে হয়। তারা জানত কী করতে হবে।

'তা হলে কাজ শেষ, ওভার অ্যাণ্ড আউট,' জানিয়ে দিল আতাসি।

'কী মনে হয়?' জানতে চাইলেন মার্টিন।

'কাজ হয়েছে। আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে স্যাটালাইট।'

'আমি তার কথা বলছি না। আমি জানতে চাইছি এই ফ্লাইটে কী বুঝলেন।'

'কর্নেল, আমার জীবনে আগে কখনও এমন অভিজ্ঞতা হয়নি,' বললেন সিরাজ। টের পেলেন ফিরছে মাধ্যাকর্ষণ; স্বাভাবিক হয়ে আসছে পেটের পেশি।

'এই অভিযাত্রার কোনও রেকর্ড থাকবে না, তবে আপনার জানার জন্য, আমরা ভেঙে দিয়েছি অল্টিচ্যুডের রেকর্ড।'

হাসতে পারলেন না সিরাজ, চুপ করে রইলেন। চট্ করে মনে পড়ল, ইয়োস দ্বীপে আটকা পড়েছে উর্বশী দাশা। মরতে চলেছে মেয়েটি।

ষোলো

মাথা খাটিয়ে চলেছে উর্বশী, কিন্তু মাটির নীচে তৈরি করা এই দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনও বুদ্ধি পাচ্ছে না। বুঝতে পারছে মাত্র একটাই পথ রয়েছে। গতকাল রাতে আবার বেরিয়েছিল, তখন দেখেছে গ্যারাজে উঠবার সিঁড়ির সামনেটা পাহারা দিচ্ছে তিনজন গার্ড। তাদের ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। চড়-ঘুসি দিয়ে ওর মুখ ফুলিয়ে দিয়েছে ব্রাঙ্কো। এই চেহারা নিয়ে গার্ডদের সামনে গেলে সন্দেহ করে বসবে। ওদের হাজারটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

ওই সিঁড়ি দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। গোপনে বেরিয়ে যেতে হবে পিছনের কোনও দরজা দিয়ে।

এগযিকিউটিভ উইঙের ক্লজিট ছেড়ে আবার রওনা হয়েছে উর্বশী জেনারেটর রুমের দিকে। করিডোরে দু'চারজন পাশ কাটাল ওকে। প্রতিবার মুখ ঢেকে রাখল উর্বশী। যে রুমে জেট ইঞ্জিন ঘুরিয়ে চলেছে টারবাইনগুলোকে, সেই ঘরের কাছে পৌঁছে গেল। ওখান থেকে সমস্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় এই ফ্যাসিলিটিতে। গতবার ওদিকে কাউকে দেখেনি উর্বশী, কিন্তু এবার করিডোরের কোনা ঘুরতে গিয়ে চমকে গেল। ওখানে পাহারা দিচ্ছে ব্রাঙ্কোর গার্ড। মাপা পা ফেলে পায়চারি করছে। তরুণের বয়স হবে বড়জোর বিশ। পরনে পুলিশের নীল

ইউনিফর্মের মত পোশাক। বেল্টে ঝুলছে মোটা ডাণ্ডা। উর্বশীকে এগুতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে।

দশ ফুট থাকতে খুশি-খুশি স্বরে বলল উর্বশী। 'কী করো? কী, মুখ দেখে চমকে গেলে? ওরা হ্যামবার্গার বানিয়ে দিয়েছে মুখটা।'

'কারা?'

'সিয়েটলে, অ্যান্টিঅ্যাবর্শন র‍্যালির ভিতর কয়েকটা গোঁড়া ক্যাথোলিক মেয়ে ছিল। ওদের হাত থেকে বেঁচে যে ফিরেছি, সে-ই বেশি। আজই এখানে এলাম। দারুণ জায়গা, তাই না?'

'ক্লিয়ারেন্স ব্যাজ ছাড়া এখানে ঢোকা নিষেধ,' গম্ভীর হয়ে বলতে চাইল তরুণ। তবে কণ্ঠে তেমন কর্তৃত্ব ফুটল না।

'তাই? এখন পর্যন্ত ইশ্যু করা হয়েছে শুধু এ-দুটো,' ওভারঅলের গভীর পকেট থেকে পানির বোতল বের করল উর্বশী। 'লাগবে একটা?'

ছোকরাকে সুযোগ দিল না উর্বশী, সে মানা করবার আগেই একটা বোতল ভাসিয়ে দিল তার উদ্দেশে। বেকায়দা ভাবে বোতলটা ধরল গার্ড। কড়া চোখে চাইল উর্বশীর দিকে। বোকার মত হেসে ফেলল ইন্দোনেশিয়ান নেভি কমাণ্ডার। মোচড় দিয়ে খুলছে নিজের বোতলের ক্যাপ। কাজটা শেষ করে বামহাতে স্যালিউট দিল।

সিকিউরিটি ট্রেইনিঙের অভাব তরুণের, তা ছাড়া গলাও শুকিয়ে এসেছে পানির অভাবে। নিজের বোতলের ক্যাপ খুলে ফেলল সে, ডানহাতে পাল্টা স্যালিউট দিল উর্বশীকে। মাথা হেলিয়ে ঠোঁটে তুলল বোতল। আর ঠিক তখনই অলিম্পিক ফেন্সারদের মত সামনে বাড়ল উর্বশী, তিন সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল

তরুণের সামনে—ডানহাতের আঙুলগুলো ভাঁজ করে আঘাত হানল ছেলেটার কণ্ঠার উপর।

মুখ দিয়ে বলকে বেরুল পানি, বন্ধ হয়ে গেছে শ্বাস-নালী। কাশতে চাইল তরুণ, কিন্তু গলার ভিতর থেকে বেরুল শুধু গড়গড়ার মত আওয়াজ। চোখদুটো হয়ে উঠেছে পিং-পং বলের সমান। দু'হাতে ধরল গলা, যেন তাতেই মিলবে অক্সিজেন। বাম চোয়ালে পড়ল এবার প্রচণ্ড ঘুসি। মেঝের উপর ধড়াস্ করে পড়ল তরুণ। ঘাড়ের পাশে লাগল জোরালো লাথি। ঝুঁকে তাকে পরীক্ষা করল উর্বশী, ঠিক ভাবে চলছে শ্বাস। তবে কণ্ঠনালী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাকি জীবন ফিসফিস করে কথা বলতে হবে তাকে।

জেনারেটর রুমের দরজা খুলল উর্বশী। কেউ নেই কণ্ট্রোল রুমে। ডিসপ্লে দেখে বোঝা গেল আপাতত একটা জেট ইঞ্জিন বিদ্যুৎ তৈরি করছে। তরুণ গার্ডকে ছেঁচড়ে ঘরের ভিতর নিয়ে এল উর্বশী, ঠুঁসে দিল একটা লোহার ডেস্কের নীচে। তারই ফ্লেক্সিকাফ দিয়ে আটকে দিল হাতদুটো। কষ্ট করে আর মুখ বাঁধল না। এ ছেলে দু'ঘণ্টার ভিতর জাগবে না।

ইঞ্জিনগুলো স্যাবোটাজ করবে কি না একবার ভেবেছে উর্বশী। পরে বাদ দিয়েছে ভাবনাটা। রেসপন্সিভিস্টরা ইএলএফ দিয়ে ট্র্যান্সমিট করতে পারবে না এমন নয়। এই ফ্যাসিলিটির ভিতর নিশ্চয়ই কোথাও রয়েছে পুরো চার্জ করা ব্যাকআপ ব্যাটারি। ওগুলো যদি খুঁজে বের করা যেত, তো কিছুক্ষণের জন্য তাদের বাধা দিতে পারত। তার ফলে এক বা দুই দিন পিছিয়ে যেত ভাইরাসের আক্রমণ। তবে ব্রাঙ্কো জেনে যেত এই ফ্যাসিলিটির ভিতরই রয়েছে উর্বশী। এখন ওকে নিয়ে ভাবছে না রেসপন্সিভিস্টরা, ধরে নিয়েছে বাইরে গিয়ে মারা পড়েছে।

স্যাবোটাজ করতে গেলে সতর্ক হয়ে উঠবে সিকিউরিটি টিম, পুরো ফ্যাসিলিটি জুড়ে তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করবে আবার।

উর্বশী জানে, সেক্ষেত্রে ব্রাঙ্কোর হাতে ভয়ানক কষ্ট পেয়ে মরতে হবে ওকে।

মন বলছে ওব বার্তা পেয়ে গেছে রানা। এবার নিশ্চয়ই কিছু করবে ও। যেমন করে হোক ধ্বংস করে দেবে ট্র্যান্সমিটার। কেসলারদের সিগনাল দিতে দেবে না। আর বলা যায় না, হয়তো নিজেই এসে হাজির হবে এখানে, ওকে উদ্ধার করবে এই বিপদ থেকে। এসব ভেবেই স্যাবোটাজের পরিকল্পনা বাদ দিয়েছে উর্বশী। ঠিক করেছে, এখন ওর প্রথম কাজ হওয়া উচিত এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

চারটে ইঞ্জিন পাশাপাশি বসানো হয়েছে, সেগুলোর ভিতর ঢুকেছে মোটা ডাক্ট। ওগুলো বাতাস পৌঁছে দেয়ার। উল্টো দিক দিয়ে গ্যাস বের করে দেয়ার জন্য এগযস্ট পাইপ। এসব ডাক্টের চারটে পাইপ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মিলেছে বিশাল এক ডাক্টে। সমস্ত বিষাক্ত গ্যাস বের করে নেবে। পাইপগুলো একইসঙ্গে যুক্ত হওয়ার জায়গায় রয়েছে একটা হিট এক্সচেঞ্জার, ওটা তপ্ত গ্যাস ও ধোঁয়া ঠাণ্ডা করে, তারপর বের করে দেয় ফ্যাসিলিটি থেকে। ওটার উল্টো কাজ করে এয়ার ইনটেক, বিশাল এক কণ্ডুইট ঢুকেছে পাওয়ার প্লান্টে, ভাগ হয়ে চলে গেছে টারবাইনগুলোর ভিতর। ওদিক দিয়ে বেরুতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু ওই কণ্ডুইট গেছে মাথার দশ ফুট উপর দিয়ে। বড় মই না পেলে ওদিক দিয়ে বেরুনো অসম্ভব।

'রানা যদি জাহাজের চিমনি দিয়ে বেরুতে পারে, তো আমি কেন পারব না ডাক্ট দিয়ে?' মনে মনে বলল উর্বশী।

ওঅর্ক বেঞ্চের সামনে চলে গেল, খুঁজে নিল দরকারী টুলস ও এয়ার প্রোটেক্টর। ফিরে এল কন্ট্রোল রুমে, ঢুকে পড়ল পাওয়ার প্লান্টের মেইন ফ্লোরে। কান ঢেকে নিতেই অনেক কমল ইঞ্জিনের গর্জন। কাজ শুরু করবার আগে খুলল লাল কেবিনেট, ওটার ভিতর দরকারি জিনিস আছে কি না দেখে নিল। ওগুলো না থাকলে উত্তপ্ত এগযস্ট ডাক্টে ঢুকলে মরতে হবে সঙ্গে সঙ্গে।

ওই চারটে এগযস্ট পাইপের সঙ্গে একটা করে বিশাল পোর্ট, ওগুলো সরাতে হলে বল্টু খুলতে হবে। কাজে নেমে পড়ল উর্বশী, একটা পাইপের হ্যাচে লাগানো তিন ইঞ্চি দীর্ঘ বল্টুগুলো খুলতে লাগল একে একে। খেয়াল করছে বল্টু যেন না হারায়। ওর মনে পড়ল বারো বছর বয়সে প্রথমবার একা গাড়ির ইঞ্জিন খুলেছিল। তখনই বুঝতে পারে ওর উচিত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া। দ্রুত হাতে কাজ করে চলেছে উর্বশী। প্রায় সব খোলার পর একটা বল্টু ঠিক জায়গায় রেখে দিল। তবে ঢিলা করে নিয়েছে। অনায়াসে এবার উপরে ঘুরিয়ে খুলতে পারবে ঢাকনি। যে এগযস্ট ডাক্টের হ্যাচ খুলেছে, সেটার ইঞ্জিন এখন নীরব। তার পরও অন্য পাইপ থেকে আসছে ধোঁয়া ও গ্যাস। চোখ থেকে দরদর করে পানি পড়তে লাগল।

কন্ট্রোল রুমের ড্রয়ারগুলো হাতড়ে দেখল, বেঁটে কিছু বল্টু পেয়ে নিয়ে এল। হ্যাচের বোল্টের ফুটোর চেয়ে একটু চিকন ওগুলো। তবে গুঁজে রাখলে চট্ করে কেউ বুঝবে না হ্যাচ খোলা হয়েছে। অবশ্য এই টারবাইন যখন চালু হবে, ওটার প্রচণ্ড চাপে বল্টুগুলো হ্যাচ থেকে বুলেটের মত ছিটকে বেরুবে। সেটা উর্বশীর সমস্যা নয়। টুলগুলো আবার গিয়ে কন্ট্রোল রুমে রাখল উর্বশী, একবার পরীক্ষা করে দেখল গার্ড এখনও অচেতন কি না।

লাল কেবিনেটে রয়েছে ফায়ারফাইটিং গিয়ার—কুঠার, হিট ডিটেক্টর, এবং তার চেয়েও জরুরি এয়ার ট্যাঙ্ক ও মুখোশ। জেনারেটর রুমে কোনও ভাবে আগুন ধরলে দপ করে জ্বলে উঠবে জেটের কেরোসিন, ফলাফল ভয়াবহ আগুন ও বিস্ফোরণ। কেবিনেটের ভিতর রয়েছে রুপালি রঙা এক পিসের ধাতব সুট। সঙ্গে হুড, ওটা প্রচণ্ড তাপ থেকে রক্ষা করবে গলা মুখ ও মাথা।

জেনারেটিং রুমে ঢুকেই এগুলো দেখে নিয়েছে উর্বশী, তখনই ঠিক করেছে কীভাবে বেরুবে এই ফ্যাসিলিটি থেকে। একটা সুটের হুড কেটে মাথায় পরে নিল। এবার পরল দ্বিতীয় সুট। দুটোর কারণে দ্বিগুণ ইনসুলেশন থাকবে। বুটজোড়া ঢিলা হলো, তবে চলে। মাথায় পরে নিল হেলমেট। খোলা পোর্টের কাছে নিয়ে এল দুটো অক্সিজেন সিলিণ্ডার। সুটের ফলে রোবটের মত নড়ছে ও। সুটের হোসের সঙ্গে আটকে নিল ট্যাঙ্কগুলো। ওর উরুর কাছে ঝুলতে লাগল ভালভগুলো। সঙ্গে আরও অক্সিজেন নিতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু শরীরের এ অবস্থায় আর বাড়তি ওজন চাপানো সম্ভব নয়।

ট্যাঙ্কগুলো ডাক্টের ভিতর রাখল উর্বশী, ওগুলোর পর উঠে পড়ল নিজেও। বলতে গেলে নড়াচড়ার জায়গা রইল না। তবে একবার প্রধান ডাক্টে পৌঁছুতে পারলে বাড়তি জায়গা পাবে। চিত হয়ে শুয়েছে উর্বশী, আগেই দুই হাতে পোর্টের ঢাকনি নামিয়ে দিয়েছে। শুধু মাত্র একটা বল্টু আটকে রেখেছে হ্যাচকে।

উপরের সুটের হুড আটকে নিল উর্বশী, একটু খুলে দিল এয়ার ট্যাঙ্ক। শ্বাস নিয়ে দেখল, গন্ধটা বিশ্রী ও ধাতব। উপায় নেই, এই বাতাসেই শ্বাস নিতে হবে। কে জানে কতদূর যাওয়ার পর মাটির উপর উঠেছে ডাক্ট। শেষ মাথায় যাওয়ার পর কী ঘটবে তাই বা কে জানে! তবে আপাতত ছেঁচড়ে উপরের দিকে

যেতে হবে ওকে।

ট্যাঙ্কদুটো গড়িয়ে সামনের দিকে নিতে শুরু করল উর্বশী, প্রতিবারে তিন-চার ইঞ্চি করে এগুতে পারছে। পাইপের ভিতর ঘন আঁধার, মাথা ধরিয়ে দিল চালু টারবাইনের প্রতিধ্বনি।

মুখ-বুক-পেটের ব্যথা খুব বেশি কষ্ট দিচ্ছে না। তবে ভোঁতা ব্যথা শরীরে। তা না হয় সময়ে চলে যাবে, কিন্তু সামনে বিপদে পড়তে চলেছে। প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করতে হবে বোধহয়। ব্যথা সবসময় মনকে অন্যদিকে সরিয়ে নেয়, নিজেকে বলল উর্বশী। কিন্তু আমার নিজের কাজে পুরো মনোযোগ দিতে হবে।

হিট এক্সচেঞ্জারের মেঝের উপর দিয়ে এগুতে শুরু করল উর্বশী, কিছুক্ষণ পর সামনে চলে এল বিশাল ডাক্ট। ওখানে এসে মিশেছে চার এগযস্ট। প্রটেক্টিভ সুট থাকবার পরও চমকে গেল উর্বশী। প্রচণ্ড তাপ জোর একটা ঝাঁকি দিল ওকে। যেন দাঁড়িয়েছে হাপরের মুখে। বুঝতে পারছে মেইন ডাক্টে ঢুকলে আরও অনেক বেশি তাপ-গ্যাস ও ধোঁয়া সইতে হবে। এগযস্ট গ্যাস তৈরি হচ্ছে কমপক্ষে তিরিশ ফুট দূরে, আসছে কুলিং ডিভাইসের ভিতর দিয়ে, কিন্তু ওর মনে হলো শুয়ে আছে ট্রাকের উত্তপ্ত ইঞ্জিনের নীচে।

এগযস্ট যেন ধেয়ে আসা কোনও সাইক্লোন। সুট ও অক্সিজেন না থাকলে দু'মিনিটের ভিতর ওকে মেরে ফেলত কার্বন মোনোঅক্সাইড। হয়তো ততক্ষণ লাগত না, প্রচণ্ড তাপে ভাজা হয়ে যেত শরীর। ডাবল থার্মাল প্রোটেকশন রয়েছে, তারপরও দরদর করে ঘামতে শুরু করল উর্বশী। যেন গরম ইস্ত্রি দিয়ে শরীরটা পুড়িয়ে দিচ্ছে কেউ।

প্রধান ডাক্ট ব্যাসে ছয় ফুট, একটু একটু করে উপরের দিকে গেছে। এবার বোধহয় হেঁটে এগুতে পারবে। একটা ট্যাঙ্কের

ফ্লেম রিটারডেন্ট হার্নেস কাঁধে আটকে নিল উর্বশী, অন্য ট্যাঙ্ক পায়ে ঠেলে এগুতে শুরু করে ভয় পেয়ে গেল। টারবাইনের তপ্ত হাওয়া না উড়িয়ে নিয়ে যায় ওকে। পায়ের তলা থেকে ছিটকে বেরুল ট্যাঙ্ক, বুলেটের মত উড়ে গেল পাইপের ভিতর দিয়ে। জেট ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছাপিয়ে ভেসে এল জোরাল ঠং-ঠনাৎ আওয়াজ।

হাঁটতে চাইল উর্বশী, কিন্তু পিঠে ঝুলন্ত ট্যাঙ্কের ওজন অতিরিক্ত। প্রতি পা ফেলতে গিয়ে টলমল করতে হচ্ছে। তার উপর তীব্র তপ্ত হাওয়া ট্যাঙ্কের মত উড়িয়ে নিতে চাইছে ওকেও। বসে পড়ল উর্বশী, হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে শুরু করল। বেরিয়ে যেতে চাইছে এই আঁধার বাঙ্কার থেকে। হাই-টেক সুট ও গ্লাভস রয়েছে, কিন্তু প্রচণ্ড তাপ পোড়াতে শুরু করেছে হাঁটু ও হাত। তার উপর ভারী ট্যাঙ্ক যেন গুঁড়িয়ে দেবে পিঠ ও পাঁজর। বিশেষ করে পাঁজর, ওগুলো যেন ঠুনকো কাঁচের তৈরি।

ডাক্ট ধরে কিছু দূর যাওয়ার পর কমে এল তাপ। তবে গরম হাওয়া এসে ঝাপটা দিতে লাগল পিঠে ও পায়ে। সুটের ভিতর জ্বলছে ত্বক। তবে নতুন করে আর ফোস্কা পড়ছে না।

'ব্যথাকে পাত্তা দেব না, অন্য দিকে মন দেব,' বিড়বিড় করে বলল উর্বশী। স্লথ গতিতে এগিয়ে চলেছে।

ইয়োস দ্বীপ রেঞ্জে আসতে এয়ারিয়াল ড্রোন আকাশে তুলতে বলল রানা। ক্যাপ্টেন সিরাজের কন্সোলের সামনে বসল অনিল, পাঁচ মিনিট পর ভেসে উঠল ইউএভি। ফু-চুং চলে গেল বোট গ্যারাজে। তৈরি রাখবে রিজিড ইনফ্লেটেবল বোট। ওর নির্দেশে রওনা হবে পাঁচজন কমাণ্ডো।

ইয়োস দ্বীপে মাত্র একটা ডক। ওরা ধারণা করছে ওটা কড়া

পাহারা দেয়া হয়। হয়তো ওই ডক দিয়েই উঠতে হবে দ্বীপে। উড়ন্ত ইউএভির ভিডিও ফিড এলে ওরা আগেই বুঝবে কী ধরনের বাধার মুখে পড়বে। যদি প্রয়োজন পড়ে, তাই ডাইভ টিম প্রস্তুত রাখছে ডিসকভারি-১০০০-কে। তৈরি রাখা হচ্ছে ট্যাঙ্ক ও ইকুইপমেন্ট। প্রয়োজনে পানির নীচ দিয়ে গিয়ে হামলা করবে দশজন ডাইভার। মার্ভেলের বেশির ভাগ ক্রু এখন সশস্ত্র। জাহাজের প্রতিটি অস্ত্র পরিষ্কার করা হয়েছে। প্রতিটির ভিতর পুরো লোডেড অ্যামিউনিশন। একটু আগে ড্যামেজ কন্ট্রোল থেকে রিপোর্ট এসেছে, তারাও তৈরি। মেডিকেলে অপেক্ষা করছে ফারা, কোনও জরুরি প্রয়োজন পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাওয়া যাবে।

ক্যাপ্টেন সিরাজ নেই, কপ্টারের উপর কাজ করে চলেছেন বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের এক অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ার। আশা করছেন কিছুক্ষণের ভিতর ঠিক হবে রবিনসন-৪৪। ওটার প্রতিটি মেকানিকাল সিস্টেম আলাদা ভাবে কাজ করছে, তবে জানিয়ে দিয়েছেন, সঠিক টেস্ট ছাড়া কিছুই বলা যায় না। হয়তো মাঝ আকাশ থেকে খসে পড়বে কপ্টার। ওটাকে এলিভেটরে তুলে ডেকের উপর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন ইঞ্জিন চালু করে গরম করা হচ্ছে। রানা জানিয়েছে, পাঁচ মিনিটের নোটিসে আকাশে উঠতে হতে পারে। সে-সময়ে ওটা চালাবে ফু-চুং।

প্রধান ভিউ স্ক্রিনে ডিজিটাল কাউণ্টডাউনের দিকে চাইল রানা। আর মাত্র এক ঘণ্টা ছয় মিনিট, এর ভিতরে খুঁজে বের করতে হবে উর্বশীকে। নইলে বাধ্য হয়ে সরে যেতে হবে দ্বীপ থেকে। বোধহয় ওই পরিমাণ সময়ও নেই। অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রজেক্টাইল যখন আঘাত হানবে, সাগরে তৈরি হবে বিশাল ঢেউ।

হিসাব কষে অনিল জানিয়েছে ওই ঢেউ আঘাত হানবে আশপাশের সবগুলো দ্বীপে। গালফ অভ ম্যাণ্ডালায় লোকবসতি নেই বললেই চলে, কাজেই প্রাণহানির সম্ভবনা খুব কম। তবে ইয়োস দ্বীপের বিশ মাইলের ভিতর প্রবল ঢেউয়ের মুখে পড়বে প্রতিটি জাহাজ।

ইয়োস দ্বীপ থেকে পনেরো মাইল দূরে থাকতে মেইন মনিটরে ফিড এল। চারপাশে সুনীল সাগর, তার ভিতর ভেসে উঠল ধূসর দ্বীপ। তিন হাজার ফুট উপরে ভাসছে ড্রোন। নীচ থেকে ইঞ্জিনের আওয়াজ পাবে না কেউ। আকাশে চোখ তুললেও খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। পুরো আট মাইল দৈর্ঘ্য পেরিয়ে গেল খুদে বিমান। পাথুরে টিলা ও প্রান্তর ছাড়া কিছুই নেই দ্বীপে। এখানে-ওখানে দুয়েকটা দুর্বল পাইন গাছ। ড্রোন ঘুরিয়ে নিল অনিল, আবার ফিরে এল রেসপন্সিভিস্টদের বাঙ্কারের উপর। ওখানে দেখবার মত কিছু নেই। যদি কোনও প্রবেশদ্বার থেকে থাকেও, তা ভাল ভাবে ক্যামোফ্লেজ করা। এত উপর থেকে সেসব দেখা গেল না। বাঙ্কার যে আছে সেটার প্রমাণ বলতে শুধু পেভ করা রাস্তা। ওটা গিয়ে মিশেছে নিচু এক টিলার সঙ্গে।

'অনিল, কয়েকটা স্টিল ফটো তোল্, ওগুলো বড় করে দেখা,' বলল রানা। 'দেখি রাস্তার মুখে কোনও দরজা বা গেট আছে কি না।'

'তুলছি। আরেকবার ঘুরে আসছি।'

'আমি ওই সৈকত আর ডক দেখতে চাই।'

জয়স্টিক নেড়ে সাগরের উপর খুদে বিমান নিয়ে গেল অনিল, ডকের একমাথা থেকে অন্য মাথায় যাবে। পিছনে সূর্য, কাজেই সহজে বিমানটাকে দেখবে না কেউ। লম্বায় সৈকত তিন

শ' ফুটের মত। নরম সাদা বালির বদলে পাথরের নুড়ি। সৈকতটাকে দু'পাশ দিয়ে ঘিরেছে এক শ' ফুট উঁচু টিলা। মনে হলো না ক্লাইম্বিং ইকুইপমেন্ট ছাড়া ওঠা যাবে। তাতেও লাগবে অন্তত এক ঘণ্টা।

সৈকতের ঠিক মাঝখানে ডক। সেখানে এল্ শেপের জেটি বেরিয়ে গেছে সাগরের বুকে। আশি ফুট যাওয়ার পর থেমে গেছে। ওখানে ছোট ফ্রেইটার ভিড়তে পারে। ফ্যাসিলিটি বানানোর সময় ওভাবেই মালামাল আনা হয়েছে। মনে হলো খুব মজবুত করে তৈরি। ওদিক দিয়ে নেয়া হয়েছে এক্সকেভেটর ও সিমেন্ট মিক্সারগুলো। জেটির মুখে সড়কের পাশে করগেটেড ধাতব বাড়ি। ছাত ঘিরে রেখেছে প্যারাপেট। কেউ ইচ্ছে করলে চারপাশে নজর রাখতে পারবে। সঙ্গে অস্ত্র থাকলে ঠেকিয়ে দিতে পারবে এক দল সৈনিককে। সাগর-পথে গোপনে আসতে পারবে না কেউ। এই গার্ডহাউসের পাশে পার্ক করা আছে একটা পিকআপ ট্রাক।

ছাতের উপর হাই পাওয়ার্ড বিনকিউলার হাতে দুই গার্ড। পাশে ঠেস দিয়ে রেখেছে অটোমেটিক রাইফেল। একজোড়া গার্ড পাহারা দিচ্ছে জেটি। আরও দু'জন রয়েছে সৈকতের পাহারায়।

ফ্যাসিলিটির সঙ্গে এদের যোগাযোগ করবার জন্য যে তার থাকবার কথা, সেগুলো রয়েছে পাথরের নীচে। আচমকা গিয়ে এদের ঘায়েল করা কঠিন। ব্রাঙ্কো নিজে এই সিকিউরিটির ব্যবস্থা নিয়েছে। নিশ্চয়ই নির্দেশ দিয়েছে, কিছু সন্দেহজনক মনে হলে, সঙ্গে সঙ্গে জানাবে বাঙ্কারে। সেক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যাবে প্রবেশদ্বার।

'থার্মাল ইমেজিং দেখা।'

মনিটরের দৃশ্য পাল্টে গেল, শুধু রইল গার্ডদের দেহের তাপ। দু'পাশের টিলার উপর আরও চারজন গার্ড, আগে খেয়াল করা যায়নি।

'টিলার উপরের ওই দু'জনের পাশের ট্রেস সিগনালগুলো কীসের?' আনমনে বলল অনিল।

'কোনও ছোট ইঞ্জিন, ঠাণ্ডা হয়ে আসছে,' বলল রানা। 'বোধহয় এটিভি বা ওই ধরনের কিছু। চালাতে মজা, যদি কেউ গুলি শুরু না করে।' গার্ডদের দেহের তাপ নয়, অন্য ব্যাপারে নজর ফেলল রানা। রাস্তার উপর থেকে সিগনাল মিলছে। সড়কের নীচ দিয়ে গেছে ফ্যাসিলিটির পাওয়ার প্লান্টের উত্তাপ। লোকগুলো চমৎকার ভাবে লুকিয়ে ফেলেছে সেটা। প্রশিক্ষিত কমাণ্ডোর চোখেও কিছু পড়বে না। মনে হবে সাধারণ রাস্তা। রোদ পড়েছে, কাজেই তপ্ত হয়েছে। তবে থার্মাল স্ক্যানে দেখা গেল সড়ক পেরিয়ে জেটির নীচ দিয়ে গেছে তাপদাহ, চলে গেছে সেই ডকে।

ওই উত্তাপ সামনে আরও ছড়িয়ে দিতে হবে, ভাবল রানা। নইলে থার্মাল ইমেজিঙে ধরা পড়ে যাবে বাড়তি তাপ।

কোথাও কোনও এয়ার-ইনটেক চোখে পড়ল না।

ফু-চুং আছে এখন বোট গ্যারাজে, মনিটরে দেখছে এরিয়াল রেকনিস্যান্স। ইন্টারকমের বাটন টিপল রানা, 'তোর কী মনে হয়?'

চৈনিক গুপ্তচর কিছু বলবার আগেই বুঝতে পারছে রানা।

'সৈকতে নামতে চাইলে বিরাট ঝামেলা,' বলল ফু-চুং। 'তুই ওই রাস্তার দুই মাথার ছবি পেলি?'

'অনিল তুলছে।'

'ছবি স্ক্রিনে আসছে,' বলল অনিল।

মনিটর জুড়ে ভেসে উঠল স্থির ছবি। সবার চোখ খুঁজতে লাগল টিলার দুর্বলতা। রাস্তা হঠাৎ করে গিয়ে থেমে গেছে টিলার কোলে। ওখানে কোনও দরজা বা গেট থাকবার কথা। তবে নেই। থাকলে খুব ভাল ভাবে ক্যামোফ্লাজ করা।

'এরা কতটা সশস্ত্র তার উপর নির্ভর করছে আমরা ঢুকতে পারব কি না,' ফু-চুঙের কণ্ঠে যেন নিরাশা।

'জানা নেই কয়েক আউন্স সি-ফোর চাই, না ক্রুজ মিসাইল,' বলল অনিল।

'আমরা ডিসকভারিতে উঠে কাছে চলে যেতে পারি,' বলল ফু-চুং। 'তারপর খুঁজে নেয়া যায় এয়ার ইনটেক ডাক্ট। পাইপের অন্য মাথা দিয়ে ফ্যাসিলিটির ভিতর ঢুকতে হবে। সঙ্গে টর্চ লাগবে। হাতে সময় থাকলে ভাল হতো। সূর্য ডুববার পর রওনা হতে পারতাম।'

ইজরায়েলি স্যাটালাইটের অর্বিটাল ট্র্যাকের কারণে সময় হয়ে গেছে সীমিত। আরেকবার ঘড়ি দেখল রানা। আর বাকি মাত্র ষাট মিনিট! এরই মধ্যে আক্রমণ করে উদ্ধার করতে হবে উর্বশীকে।

'ডকের উপর দুই গার্ড কী করছে?' বলে উঠল অনিল। ড্রোনের ক্যামেরা আবার ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

'কাজে ফাঁকি দেবে বোধহয়,' অন্যমনস্ক ভাবে বলল রানা।

'মনে হয় না, পানির কাছে অন্য কিছু। ইউএভি আবারও ঘুরিয়ে ভাল ভাবে দেখতে হবে।'

চারদিকে ঘুটঘুটে আঁধার। একটা যদি টর্চ থাকত, ভাবল উর্বশী। ট্যাঙ্কে কতটুকু বাতাস রইল জানা দরকার। আন্দাজ বিশ মিনিট ধরে ক্রল করেছে। ধীরে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করেছে। জানে,

অক্সিজেন ফুরালে মরতে হবে। শেষ যেন নেই এই পাইপের। সুড়ঙ্গের মত, একটু আলো নেই কোথাও।

আরও দশ মিনিট এগুনোর পর বুঝল, কঠিন হয়ে উঠছে শ্বাস নেয়া। বোধহয় খালি হয়ে এল ট্যাঙ্ক। একটু পর সুটে আটকে থাকা বাতাসটুকু টেনে নিতে হবে। তারপর তা-ও থাকবে না, শুরু হবে বুকের ভিতর প্রচণ্ড কষ্ট। আগেও মনে হয়েছে, ও মরবে পানির ভিতর শ্বাস আটকে। তবে এখন টের পেল পানিতে নয়, ডাঙাতেই দম আটকে মরবে বিষাক্ত গ্যাসের কারণে।

অলস ভঙ্গিতে ক্রল করে চলেছে উর্বশী। চারবার হাত ফেললে এক ফুট পেরুতে পারছে। ওর বাইরের সুট প্রায় পুড়ে গেছে। ছোট টুকরোগুলো একটু একটু করে খসে পড়ছে এখন। বিশেষ করে হাঁটু থেকে। কপাল ভাল, ভিতরের সুট নষ্ট হয়নি। ওটা ওকে রক্ষা করতে যথেষ্ট।

অমল ভাল আছে এবং থাকবে, ভাবল উর্বশী। কোনও সন্দেহ নেই, আবারও ওকে উদ্ধার করবে রানা। এরপর অন্য কোনও ডিপ্রোগ্রামারের কাছে নেবে। কেন-কীভাবে-কী ঘটেছে তা জানে না রানা, তবে একই ভুল কখনও দ্বিতীয়বার করে না। ও হয়তো ধারণা করে নিয়েছে বিশ্বাসঘাতক ছিল ডক্টর লিয়োনার্দো চার্চ। রানার জানার কথা নয় ওই লোক আসলে কে। নিজের কানে শোনার পরও ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চায়নি উর্বশীর।

ছোট ভাইটাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে মরতে চলেছি, মনে মনে বলল উর্বশী। কমবয়সীদের রক্ষা করতে চাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অমল কি জানতে পারবে, ওকে ভাল করার জন্য আত্মবিসর্জন দিয়েছে ওর বোন?

'ব্যথাকে পাত্তা দেব না, অন্য দিকে মন দেব,' মনে মনে বলল উর্বশী। ধীর গতিতে ক্রল করে চলেছে।

মন বলছে এভারেস্ট জয় করবার জন্য পাহাড় বেয়ে উঠছে। প্রতিবার শ্বাস নিতে গিয়ে জোরে বাতাস টানতে হচ্ছে। খচ্ করে লাগছে পাঁজরে। যত জোরে শ্বাস নিতে চাইছে, বাড়ছে বুকের ব্যথা, কিন্তু ভরছে না ফুসফুস।

অন্ধকারে কী যেন হাতে বাধল। ওর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা হোঁচট খেল। এ ধরনের এগযস্ট শাফট সবসময় খোলা রাখা হয়। নইলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় টারবাইনের দক্ষতা। সামনের জিনিসটা হাতড়ে দেখল উর্বশী, তারপর হেসে ফেলল। ওটা ওর সঙ্গে নিয়ে আসা সেই হারিয়ে যাওয়া ট্যাঙ্ক। বাতাসের তোড়ে বুলেটের মত উড়ে গিয়েছিল পাইপ বরাবর। এখানে এসে থেমেছে।

দ্রুত হাতে নিজের ট্যাঙ্ক খুলে ফেলল উর্বশী, পিঠে আটকে নিল দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক। ভালভ খুলতে পাওয়া গেল সেই বিশ্রী ধাতব বাতাস। তা-ই এখন বুক ভরে টানতে পেরে খুশি হয়ে উঠল মন।

পনেরো মিনিট পর সুড়ঙ্গের শেষমাথায় আলো দেখল উর্বশী। ওই আলো যেন অনেক দূরে। সামনের ডাক্ট চওড়া ও চাপা হয়ে এসেছে। ডিফিউজারের কাজ করছে। গরম বাতাস শীতল করে থার্মাল ইমেজিং লুকাবে। একটু পর মিলিয়ে গেল তপ্ত হাওয়া, পিঠ থেকে ট্যাঙ্ক খুলে ফেলল উর্বশী, উপুড় হয়ে ডিফিউজারের ভিতর দিয়ে শুরু করল ক্রল। শেষ মাথায় গিয়ে বাধা পেল। ডাক্টের মুখে সরু গ্রিল।

কয়েক ইঞ্চি দূরে মুক্তি। আট ফুট নীচে খলবল করছে সাগর। এখন বোধহয় জোয়ার চলছে। এত উপরে ওঠে না

পানি। নইলে ভেসে যেত ডাক্ট। ঝড়ের সময় নিশ্চয়ই এই ভেন্ট ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। ওই রডগুলোর ফাঁক দিয়ে বেরুনো সম্ভব নয়। ডাক্টের ডানে-বামে কী থাকতে পারে জানা নেই। একবার বেরুতে পারলে কপালের উপর নির্ভর করে এগুতে হবে।

আবার ডিফিউজারে ঢুকে ট্যাঙ্ক নিয়ে এল উর্বশী। ওটা দিয়ে গুঁতো দেবে রডগুলোর উপর। কাত হয়ে পিঠে আটকে নিল ট্যাঙ্ক, জোরে গুঁতো দিল রডগুলোর উপর। যথেষ্ট জোর পাওয়া গেল না। একটু পিছিয়ে গেল উর্বশী, ট্যাঙ্ক সহ ধাক্কা দিল গ্রিলে। থরথর করে কাঁপছে গ্রিল। একের পর এক ধাক্কা দিয়ে চলেছে উর্বশী। লবণাক্ত হাওয়া ও বিষাক্ত এগযস্টে দুর্বল হয়ে এসেছে রডগুলো। পঞ্চম গুঁতোয় পট করে ভাঙল একটা রড। আরও চার মিনিট পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় রড ভেঙে গেল।

যথেষ্ট জায়গা পাওয়া গেছে, রডগুলো একে একে বাঁকিয়ে বাইরের দিকে ঠেলে দিল উর্বশী। এবার ডাক্ট থেকে মাথা বের করল। ডিফিউজারের নীচে সরু প্ল্যাটফর্ম, ওখান থেকে সোজা উঠে এসেছে লোহার মই। আরও উপরের দিকে গেছে ওটা। বামদিকে চোখ পড়ল উর্বশীর, আর ঠিক তখনই কে যেন খপ্ করে ধরল ওর কাঁধ। শাফট থেকে টেনেহেঁচড়ে বের করে নেয়া হলো ওকে। সব এত দ্রুত ঘটল যে নড়তে পারল না উর্বশী। ধুপ করে পড়ল ডকের উপর। ওর দু'পাশে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে পড়েছে দুই গার্ড। কাঁধ থেকে ঝুলছে সাব-মেশিনগান। উর্বশী জেনারেটর রুমের বাইরে যে ছোকরাকে অজ্ঞান করে এসেছে, তেমন নয়—চেহারাই বলে দিল এরা পেশাদার গুণ্ডা।

'বলো তো এখানে কী করছ, ডারলিং?' লোকটার উচ্চারণ

বলে দিল সে ইংরেজ।

এতক্ষণ ডাক্টের ভিতর হেলমেট পরে ছিল, প্রচণ্ড আওয়াজে এখনও ঝাঁ-ঝাঁ করেছে কান। শুধু ঠোঁট নড়া দেখল উর্বশী, কিছুই শুনতে পেল না কানে। দু'হাতে হেলমেট খুলতে চাইল। খেয়াল করল ট্রিগারের উপর চেপে বসেছে দুই গার্ডের তর্জনী। একজন সঙ্গীকে কাভার দিতে পিছিয়ে গেল। প্রথম লোকটা একটানে উর্বশীর হেলমেট খুলে নিল। কড়া সুরে বলল, 'এখানে কী তোমার?'

'হ্যালো, বয়েজ,' মিষ্টি করে বলল উর্বশী। 'আমি এসেছি ওল্ড চিমনি'জ কোম্পানি থেকে। আমাদের কাজ পাইপ পরিষ্কার করা।'

সতেরো

'ওই যে উর্বশী ম্যাডাম!' বলে উঠল আতাসি। এইমাত্র রুপালি সুট পরা মানুষটির পাশে দাঁড়িয়েছে দুই গার্ড।

ঝট্ করে ইণ্টারকম তুলল রানা। 'ফু-চুং, তৈরি হ'। রওনা হতে হবে!'

কন্সোলে একটা সুইচ টিপল অনিল। এখন পাঁচ মাইল ব্যাস নিয়ে দ্বীপের উপর ঘুরতে থাকবে ড্রোন। কেউ নিয়ন্ত্রণ না নিলে ফিউল শেষ না হওয়া পর্যন্ত উড়বে। নিজের ওয়েপন্স কন্সোলে ফিরল অনিল।

ক্যামেরাগুলো দিয়ে ডক দেখিয়ে চলেছে আতাসি।

ছুটতে শুরু করে অপারেশন্স সেন্টার থেকে বেরিয়ে এল রানা, চলেছে মেইন ডেক লক্ষ করে। থমথম করছে মুখ। ওর পরনে কালো ফেটিগ, এটা ব্যবহার করেছিল গ্রিসে। কব্জির সঙ্গে সেলাই করা ফ্লেক্স-স্ক্রিন প্যানেল। ওর সঙ্গে এফএন ও ফাইভ সেভেনএন পিস্তল, কোমরের হোলস্টারে ওয়ালথার। কপ্টার ঠিক ভাবে না-ও উড়তে পারে, কোনও ঝুঁকি নেয়া চলবে না, কাজেই সঙ্গে বাড়তি অস্ত্র নিয়েছে রানা। হিপ পকেটে হেকলার অ্যাণ্ড কচ এমপি মেশিন পিস্তলের ছয়টি ম্যাগাজিন। অস্ত্রটা আগেই তুলে দেয়া হয়েছে রবিনসনে।

'কী করতে চলেছে ও?' পিছন থেকে আনমনে বলল অনিল। 'আর উর্বশীই বা কীভাবে বেরিয়ে এল?'

ডেকে উঠে ছুটতে লাগল রানা, কমব্যাট রেডিওতে বলল, 'কমিউনিকেশন চেক। কথা শোনা যায়?'

'জী,' বলল আতাসি।

'হেলমস্, ওয়েপন্স, কপি।'

অনিল ও তার অ্যাসিস্টেন্ট সাড়া দিল। এরপর গগল।

'অনিল নিজের কন্সোল থেকে ড্রোন হাতে নে,' বলল রানা। 'চালু কর্ লেজার ডেযিগনেটর। ওটার ক্যামেরা ব্যবহার করব আমি, তোদের জানিয়ে দেব টার্গেট কোথায়। ফায়ার করবি ওয়ান টোয়েন্টি দিয়ে।'

ইজিস নেভি ক্রুজারের ব্যাটল স্পেস কম্পিউটারের কাছাকাছি সফিস্টিকেটেড মার্ভেলের ফায়ার কন্ট্রোল। ড্রোনের নাকের কাছে রয়েছে খুদে লেজার, ওটা উজ্জ্বল করে তুলবে টার্গেটকে। কম্পিউটার অটোমেটিকালি জিপিএস কোঅর্ডিনেট ক্যালকুলেট করবে, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের এক শ' বিশ এমএম

কামান উপরে উঠবে বা নীচে নামবে, গোলা ছুঁড়বে।

'গগল হেলমস-এ তুমি, দ্বীপের আরও কাছে নিয়ে যাও,' বলল রানা। অ্যাকটিভেট করল ফ্লেক্স-স্ক্রিন প্যানেল। ওটাতে দেখা গেল ডকের উপর পড়ে আছে উর্বশী। হাতে সময় নেই, ওকে টেনে তুলে পিকআপে ওঠাবে গার্ডরা, নিয়ে যাবে বাঙ্কারে।

এদিকে তীব্র গতি তুলে ছুটে চলেছে মার্ভেল। জাহাজের ডেকের উপর যেন বইছে হারিকেন। ছুটতে ছুটতে রবিনসনের পাশে পৌঁছে গেল রানা। একই সময়ে পৌঁছুল ফু-চুংও। ওর জন্য দরজা খুলে দিল দু'জন ক্রু। রানার দরজা আগেই খুলে নেয়া হয়েছে। ফোকর দিয়ে উঠে পড়ল ও। একটু আগে পরীক্ষা শেষ করে কপ্টারের ইঞ্জিন বন্ধ করা হয়েছে। কাজেই ফু-চুং সুইচ টিপতেই গর্জে উঠল ওটা। ট্র্যান্সমিশন এনগেজ করে স্টার্ট দিতেই ঘুরতে শুরু করল রোটর। ততক্ষণে হেডসেট পরে নিয়েছে ফু-চুং, বেঁধে নিয়েছে সিট বেল্ট।

'গগল, ফু-চুং বলছি। উড়াল দিতে তৈরি। গতি কমান।'

মার্ভেলের পাম্প জেট বিরতি নিল, পরক্ষণে উল্টো ঘুরতে লাগল। জাহাজের সবার মনে হলো এইমাত্র একটা টর্পেডো ঢুকেছে বোর ভিতর। মার্ভেলের ড্রাইভ টিউবগুলোর সামনে বিস্ফোরিত হলো পানির দেয়াল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেল জাহাজ। এই আকৃতির জাহাজ থামাতে হলে অন্তত এক মাইল পেরুতে হয়, কিন্তু মার্ভেলের রেভোলিউশনারি প্রপালশন সিস্টেম প্রায় স্পোর্টস কারের মত থামিয়ে দিল জাহাজকে।

এলিভেটর প্ল্যাটফর্মের এক কোনায় রাখা হয়েছে ইলেকট্রনিক অ্যানিমোমিটার, ওটা জানিয়ে দিল বাতাসের বেগ নেমে এসেছে ঘণ্টায় বিশ মাইলে। এবার কপ্টারের ইঞ্জিনকে

শক্তি যোগান দিল ফু-চুং। সঙ্গে সঙ্গে ডেক ছেড়ে আকাশে উঠতে লাগল রবিনসন।

'আমরা উঠে গেছি,' স্কিডগুলো স্টার্ন রেলিং পেরুতেই বলল ফু-চুং।

সঙ্গে সঙ্গে প্রপালশন রিভার্স করল গগল, গতি তুলতে শুরু করল মার্ভেল। পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড পেরুনোর আগেই তীব্র গতি পেল অতবড় জাহাজটা।

'ওয়েল ডান, গগল,' বলল রানা। ওর জানা আছে, গগলের বদলে কেউ এই ম্যানিউভার এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না।

'প্র্যাকটিস,' আর কিছুই বলল না গগল।

'রানা, ওয়েপন্স থেকে অনিল। কম্পিউটার বলছে আট সেকেণ্ড পর ওয়ান টোয়েণ্টি রেঞ্জে আসবে।'

'তিনটা ফ্লেয়ার ফায়ার কর,' বলল রানা। 'উর্বশী বুঝুক ক্যাভালরি পৌঁছে গেছে।' ফু-চুঙের দিকে চাইল রানা। 'ইটিএ কখন?'

'আমি তো আর ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করিনি, ঠিক জানি না, তবে ধরে নে পাঁচ মিনিট।'

অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রজেক্টাইল যখন আঘাত হানবে, সেই সময়ের সঙ্গে নিজের ডিজিটাল ব্যাটল ঘড়ি মিলিয়ে নিয়েছে রানা। আর মাত্র পঞ্চান্ন মিনিট বাকি, তারই ভিতর উর্বশীকে উদ্ধার করে মার্ভেল নিয়ে সরে যেতে হবে।

'উঠে দাঁড়াও,' ধমকে উঠল ইংরেজ গার্ড। উঠতে গিয়ে দেরি করছে উর্বশী। ওর কোমরে কষে একটা লাথি লাগাল লোকটা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল উর্বশী, দু'পাশে ঝুলছে দু'হাত। নিচু স্বরে বলল, 'হাত উপরে তুলব? পিঠ থেকে ট্যাঙ্ক নামাতে

চাই।'

ভাল ভাবে কাজ করছে না উর্বশীর মাথা। যদি কাজ করত, একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়ত সাগরে। ওর সুট পুরোপুরি এয়ারটাইট। অক্সিজেন সিলিণ্ডারের কারণে পাথরের মত টুপ করে ডুবত। দূরে গিয়ে সৈকতে উঠতে পারত। সাগরের দিকে চোখ পড়তেই কী যেন দেখল। ডুবন্ত সূর্যের পাশে ওটা কী? বলের মত! তার নীচে আরও কিছু বিস্ফোরিত হলো! তারপর তৃতীয়বার!

আন্তর্জাতিক প্রচলিত নিয়ম, কোনও শিকারী জঙ্গলে হারিয়ে গেলে তিনবার গুলি ছুঁড়ে সার্চ পার্টির কাছে সাহায্য চাইবে। ওই ফ্লেয়ারগুলো কোনও জাহাজের ডিসট্রেস কল নয়, ওগুলো দিয়ে রানা উর্বশীকে জানাতে চেয়েছে, ওকে উদ্ধার করতে পৌঁছে গেছে মার্ভেল।

উর্বশী কখনও হতাশ হয়নি, কাজেই খুব অবাকও হলো না। চেহারা থাকল স্বাভাবিক। ধীরে ধীরে পিঠ থেকে নামাল ট্যাঙ্ক, ছিঁড়ে নামাতে লাগল থার্মাল ইনসুলেশন সুট। ওটার অবস্থা করুণ। সামনের দিক রুপালি, কিন্তু পিঠের দিকে ঝুলকালি, প্রচণ্ড তাপে পোড়া।

এক গার্ড ওয়াকি-টকিতে যোগাযোগ করেছে। উঁচু পর্যায়ের কেউ তাকে নির্দেশ দিল।

'ন্যাট, মেয়েটাকে দেখতে চান মিস্টার কেসলার। আমরা দরজার কাছে পৌঁছলে খুলে দেয়া হবে গেট।' অস্ত্রের নল দিয়ে উর্বশীর পিঠে খোঁচা দিল দ্বিতীয় গার্ড। 'সামনে বাড়ো।'

টলতে টলতে এক পা সামনে বাড়াল উর্বশী, তারপর ধুপ করে পড়ে গেল ডকের উপর। 'পা ফেলতে পারি না! সারা পথ ক্রল করে ক্র্যাম্প ধরেছে।' আহত ফুটবলারের মত এক হাঁটু

টিপতে লাগল। ভঙ্গি দেখে মনে হলো এইমাত্র ওকে ফাউল করা হয়েছে।

ন্যাট নামের লোকটা ডকে উর্বশীর মাথার পাশে গুলি করল। 'কী বুঝলে, ডারলিং? তোমার খিঁচ সারছে?'

লোকটার বক্তব্য বুঝতে পেরেছে উর্বশী, ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল। দুই গার্ডের সামনে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। তীরের দিকে চলেছে। একটু ধীরে হাঁটতে গেলেই গুঁতো দেয়া হচ্ছে পিঠে।

তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে হাজির হলো কালো রবিনসন কপ্টার, ডকের উপর দিয়ে ধেয়ে এল শিকারের আশায়। কাঠের জেটির উপর নাক নিচু করে থমকে গেল ওটা, চারপাশে শুরু হলো তুমুল ঝড়। গার্ড পিছন থেকে ধাক্কা দিল, ধপ করে পড়ে গেল উর্বশী। পাশে শুয়ে পড়েছে লোকদুটো। তাদের মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল কপ্টার।

দুই টিলার উপর অভজার্ভেশন পোস্ট থেকে চেয়ে রইল গার্ডরা, পরক্ষণে সৈকত লক্ষ্য করে গুলি শুরু করল। কপ্টার নাচিয়ে চলেছে ফু-চুং, যেন মুষ্টিযোদ্ধার ঘুসি এড়াতে চাইছে মোহাম্মদ আলী দ্য গ্রেট। গার্ডদের কাছে ট্রেসার বুলেট নেই, লক্ষ্য নির্ধারণ কঠিন হয়ে দাঁড়াল ওদের জন্য।

'উর্বশীকে সৈকত থেকে সরিয়ে নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে,' বলল রানা। 'নইলে ক্রস ফায়ারের মুখে পড়বে।'

সূর্য ডুবতে চলেছে, দীর্ঘ হয়েছে ছায়া। সৈকতের গার্ডদের দেখা গেল না, তবে অটোমেটিক রাইফেলের মাযল ফ্ল্যাশ ধরিয়ে দিল তাদের। যোগ দিয়েছে এই মহাযজ্ঞে।

ডকে গার্ডরা উর্বশীর দুই হাত দু'পাশ থেকে ধরে টেনে তুলল, হিঁচড়ে নিয়ে চলল। আশা করছে গার্ডহাউস ও সৈকত

থেকে পাল্টা হামলা হবে কপ্টারের উপর। এগুতে চাইছে না উর্বশী, তবে বাধা দেয়ার শক্তি সামান্যই।

গ্রিনল্যাণ্ডের উপর দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে ইজরায়েলি অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রজেক্টাইল স্যাটালাইট। এইমাত্র সমস্ত সিস্টেম চেক শেষ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে গেছে আঠারো শ' পাউণ্ডের টাংস্টেন রডগুলো লঞ্চ করতে। এক্সটার্নাল কেসের ভিতর টেলিফোন পোল আকৃতির প্রজেক্টাইল ঘুরতে শুরু করেছে এক হাজার আরপিএম-এ। অ্যাটমসফিয়ারে নামবে স্থির ভঙ্গিতে। ওটার স্যাটালাইটের টার্গেটিং কম্পিউটার আধুনিক নয়, তবে কাজ সম্পন্ন করতে যথেষ্ট। এ মুহূর্তে অপেক্ষা করছে, সঠিক কোঅর্ডিনেট লক্ষ্য করে স্যাটালাইট উড়িয়ে নেবে।

স্যাটালাইটের একটা ম্যানুভারিং রকেটের ভিতর সামান্য কমপ্রেসড গ্যাস নিঃসরণ হলো। নিখুঁত ভাবে ঠিক করে নিল কোর্স। লঞ্চ টিউব থেকে ধীরে সরে যেতে লাগল কাভার। দেখাল প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের মত। প্রথমবারের মত টাংস্টেন কোর পেল স্পেসের ছোঁয়া।

স্যাটালাইট দ্রুত ছুটে চলেছে, নীচে ধীরে ঘুরছে পৃথিবী। প্রতি সেকেণ্ডে আরও কাছে চলে আসছে টার্গেট। স্যাটালাইট ফায়ারিং পজিশনে চলে এল। কারও জানবার কথা নয়, নীচে জমে উঠেছে কী নাটক।

'ওয়েপন্স থেকে অনিল বলছি, রানা,' ট্যাকটিকাল রেডিওতে শুনতে পেল রানা। 'আমরা রেঞ্জে পৌঁছে গেছি।'

'পুবের টিলার ওপর অ্যান্টিপারসোনেল রাউণ্ড ফ্যাল,' বলল রানা।

সাগরে আট মাইল দূরে স্টোর থেকে এল-৪৪-এর জন্য প্রয়োজনীয় রাউণ্ড নিল অটোফিডার, ভরে দিল কামানের ব্রিচে। এই কামান গোপনে রাখা হয়েছে মার্ভেলের বো-র কাছে। ক্যারিজ প্রায় এক শ' আশি ডিগ্রি কাভার করে। বাইরের দরজা নেমে গেলেই বেরিয়ে এল ব্যারেল। ড্রোনের লেজার পাইপ বিম টিলার উপর তাক করতেই জাহাজের টর্গেটিং কম্পিউটার নির্দিষ্ট লক্ষ্য বুঝে নিল. মার্ভেলের খোল থেকে বেরিয়ে এল নল, প্রস্তুত হলো গোলা ছুঁড়তে। ঠিক তখন বড় ঢেউ পেরুতে শুরু করল মার্ভেল। বুম্ করে গর্জে উঠল বিরাট কামান।

ওয়েপন্সের কম্পিউটার এতই নিখুঁত যে, মাইক্রো সেকেণ্ড হিসাব কষে। ব্যারেল থেকে গোলা বেরিয়ে যাওয়া, পৃথিবীর ঘূর্ণন ও প্রজেক্টাইলের গতি সবই হিসাবের ভিতর থাকে।

কামান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দশ সেকেণ্ড পর ফাটল শেল, চারপাশে ছিটকে গেল পেলেটগুলো। যেন গুলি করা হয়েছে শটগান দিয়ে, বিস্ফোরিত হলো টিলার মাথা। ধুলোর মেঘ ভেসে উঠল আকাশে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল দুই রেসপন্সিভিস্ট গার্ড।

'এবার পশ্চিমের টিলা,' জানাল রানা।

উর্বশীকে তুলে নিয়ে চলেছে দুই গার্ড, তবে বিস্ফোরণের আওয়াজে ভড়কে ফেলে দিল হাত থেকে।

মাটিতে পড়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল উর্বশী, দৌড়াতে শুরু করেছে। তবে মাত্র কয়েক পা যেতে পারল, তারপর পিছন থেকে ট্যাকল করল এক গার্ড। ল্যাং খেয়ে এলোমেলো পা ফেলে কয়েক কদম এগিয়েই উপুড় হয়ে পড়ল ও।

রুক্ষ অ্যাসফল্টের উপর পড়ে গুঙিয়ে উঠল উর্বশী। রাইফেল দিয়ে আঘাত করা হলো মাথার পিছনে। মনে হলো দপ করে নিভে গেল সূর্য। ওর চোখের সামনে অন্ধকার নামছে। জোর

করে সচেতনতা ধরে রাখতে চাইল উর্বশী।

সৈকত কেঁপে উঠল প্রচণ্ড আওয়াজে। বিস্ফোরিত হয়েছে আরেক রাউণ্ড গোলা। পশ্চিম টিলার স্নাইপারদের আখড়ার খানিক নীচে গিয়ে পড়েছে। ছিটকে উঠল হাজারো টুকরো পাথর।

'অনিল...'

রানা বলবার আগেই বলল অনিল, 'জানি।' বারো সেকেণ্ড পর পশ্চিমের টিলার উপর পড়ল দ্বিতীয় গোলা। মনে হলো বিস্ফোরিত হলো চারপাশ।

দুই গার্ড পিকআপ ট্রাকের পিছনে ছুঁড়ে ফেলল উর্বশীকে। একজন উঠে পড়ল ড্রাইভিং সিটে। অন্য লোকটা সাবমেশিন গানের নল ঠেসে ধরল উর্বশীর মাথায়। মাত্র পঞ্চাশ ফুট এগিয়েছে পিকআপ, এমন সময়ে সরাসরি গার্ডহাউসের উপর পড়ল হাই-এক্সপ্লোসিভ শেল। চারপাশে ছিটকে গেল করগেটেড ঘর। মনে হলো আগুন দিয়ে তৈরি গোলাপ ফুটেছে ওখানে। কংকাশনের ফলে সামনের দিকে লাফ দিল পিকআপ। নিয়ন্ত্রণ হারাল ড্রাইভার, তবে হুইল ঘুরিয়ে আবার ফিরে এল রাস্তার উপর।

সৈকতের দুই গার্ড ধরে নিল এবার পালাতে হবে। দেরি না করে উঠে পড়ল এটিভির উপর। মনে হলো ধাওয়া করে ধরতে চাইছে পিকআপ ট্রাককে।

কপ্টার নিয়ে তিন চাকার গাড়ির বামে চলে এল ফু-চুং, সুযোগ করে দেবে রানাকে।

'ওই ট্রাকের সামনে রাস্তার উপর অ্যান্টি পারসোনেল ফ্যাল,' বলল রানা। 'সমানে একের পর এক ফেলতে থাক্, গতি যেন কমাতে বাধ্য হয়।' অনিলের জবাব মোটেও শোনা গেল না।

হেকলার অ্যাণ্ড কচ এমপি মেশিন পিস্তল দিয়ে গুলি শুরু করেছে রানা।

এটিভির ড্রাইভার বুঝতে পেরেছে তাকে টার্গেট করা হয়েছে, কাজেই এঁকেবেঁকে এগুতে শুরু করল। দক্ষ স্নাইপার রানা, কিন্তু উড়ন্ত কপ্টার থেকে ছুটন্ত কাউকে গুলি করা প্রায় অসম্ভব। বামহাতে পাল্টা গুলি করল ড্রাইভার। গুলি খুব কাছ দিয়ে গেছে, আপাতত সরে গেল ফু-চুং। ধাওয়া বন্ধ করে সরিয়ে নিল কপ্টার।

এক শ' ফুট সামনে হঠাৎ উধাও হলো পিকআপ ট্রাক। সড়কের উপর পড়েছে আর্মার ভেদ করা ইউরেনিয়াম কোর রাউণ্ড। আগেই অ্যান্টিপারসোনেল রাউণ্ড চেয়েছে রানা। নইলে অন্য যে-কোনও আর্সেনাল ছিঁড়েখুঁড়ে দিত ট্রাকটা।

কষে ব্রেক করল ড্রাইভার, বনবন করে ঘুরিয়ে নিল চাকা। সামনের পথে গর্ত তৈরি হয়েছে। ধপ করে ওখানে নামল পিকআপ ট্রাক। আবার গতি বাড়িয়ে গর্ত থেকে উঠে আসতে চাইল সে।

সুযোগটা খেয়াল করেছে রানা, দ্রুত বলল, 'ওই যে ওখানে চল্, ফু-চুং!'

কপ্টার ঘুরিয়ে নিল ফু-চুং, ধেয়ে গেল পিকআপ ট্রাক লক্ষ্য করে। যে গার্ড উর্বশীকে আটকে রেখেছে অস্ত্র তুলল সে, তবে লাথি দিয়ে তার হাত থেকে সাবমেশিন গান ফেলে দিতে চাইল উর্বশী। বাধ্য হয়ে বন্দির দিকে মনোযোগ দিল লোকটা। নতুন ম্যাগাজিন ভরবার সময় নেই, অস্ত্রটা কপ্টারের ভিতরে ছেড়ে দিল রানা, খুলে ফেলল সেফটি হার্নেস।

কপ্টারের পাখার কারণে প্রচণ্ড ধুলো উঠছে। আবছা দেখা গেল পিকআপ ট্রাক। তবে এয়ারস্পিড কমিয়ে এনে ট্রাকের

উপর পৌঁছে গেল ফু-চুং। সামনের ঢাল উঠে গেছে টিলার দিকে।

দেরি করল না রানা, দশ ফুট উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল ট্রাক লক্ষ্য করে। দ্বিতীয় গার্ড ক্যাবের উপর ধমাধম বাড়ি দিয়ে বোঝাতে চাইল আকাশ থেকে নামছে শত্রু। ড্রাইভার বুঝতে পেরেছে, বনবন করে ঘোরাতে শুরু করল স্টিয়ারিং হুইল।

পিকআপ ট্রাকের কোনায় নেমেছে রানা, এক হাঁটু গেড়ে সামলে নিতে চাইল ভারসাম্য, তবে ট্রাকের তীব্র গতির কারণে কাত হয়ে রাস্তার দিকে পড়তে লাগল। খপ্ করে গার্ডকে ধরতে চাইল রানা, কিন্তু পারল না। দু'হাতের আঙুল খামচে ধরল ট্রাকের বেডের শেষ অংশ। সড়ক ধরে ছেঁচড়ে এগুল দুই পা। নিজেকে ট্রাকের উপর তুলতে চাইল রানা।

হঠাৎ ওর মাথার কাছে হাজির হলো দ্বিতীয় গার্ডের মুখ, টিটকারির হাসি হাসছে। ডান হাত ছেড়ে দিল রানা, কোমরে থাবা দিয়ে বের করে আনতে চাইল ওয়ালথার। তবে ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। সাবমেশিন গানের বাঁট নেমে এল ওর বামহাতের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল হাত।

ধপ্ করে রাস্তার উপর পড়ল রানা, গড়িয়ে দিল দেহ। পরক্ষণে বলের মত গোল হয়ে গেল। দু'হাতে রক্ষা করতে চাইছে মাথা। কয়েকবার ডিগবাজি খেয়ে থামল। ততক্ষণে ঢালের উপর পৌঁছে গেছে ট্রাক, গতি বাড়িয়ে নেমে যেতে লাগল।

উঠে দাঁড়াল রানা, টলছে। পতনের ফলে আঘাত লেগেছে মাথায়, বুঝতে দেরি হলো কী ঘটছে। মাথা নেড়ে চিন্তাগুলোকে স্বাভাবিক করতে চাইল। উপরে চোখ পড়তে ফু-চুংকে দেখতে পেল। নেমে আসছে ওকে তুলে নিতে। রাস্তা ধরে দ্রুত ছুটে

আসছে এটিভি দুটো। ওগুলো পাহাড়ি পথে চালাতে হলে দুই হাতই ব্যবহার করতে হয়।

রেঞ্জ অনেক বেশি, তবে ঝুঁকি নিল না রানা। লোকগুলো অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে হামলা করতে পারে। ওয়ালথার রেখে ফাইভ-সেভেন দুটো বের করে নিল রানা, ড্রাইভারদের দিকে ছুঁড়তে লাগল গুলি। চমকে গেছে লোকগুলো। বিশটা গুলি পাঠিয়ে দিয়েছে রানা ছয় সেকেণ্ডে। ডানদিকের ড্রাইভারের দেহে বিঁধল আটটা বুলেট। ঝাঁঝরা হয়ে গেল বুক। একটা বুলেট উড়িয়ে নিল করোটির অর্ধেক। কাত হয়ে পড়ে গেল লাশ।

ধোঁয়া ওঠা পিস্তলগুলো ফেলে দিল রানা, মেরুদণ্ডের দু'পাশ থেকে তুলে নিল আরও দুটো। নতুন করে গুলি শুরু করল দ্বিতীয় গার্ড লক্ষ্য করে।

দ্বিতীয় গার্ড এক হাতে কোয়াড বাইক চালাতে চাইছে, অন্য হাতে পিঠ থেকে খুলে নিল একে-ফোরটিসেভেন। গতি না কমিয়ে ছুটে আসছে। যেন খেয়ালই নেই আশপাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে বুলেট। দু'তিনটে ফায়ার করল সে, তারপর প্রথম বুলেট আঘাত হানল তার দেহে। উরুর ভিতর নালা তৈরি করল বুলেট। পাল্টা গুলি করতে চাইল সে, কিন্তু প্রতিপক্ষ লোকটার যেন ভয়-ডর বলতে কিচ্ছু নেই, পাত্তা দিচ্ছে না ওর গুলিকে।

রানার কানের পাশ দিয়ে গেল দুটো বুলেট। শান্ত ভাবে পাল্টা গুলি করল রানা। ওর তৃতীয় ও চতুর্থ বুলেট ছিঁড়ে দিল গার্ডের গলা। কাইনেটিক ইমপ্যাক্টের ফলে লোকটার মাথা ছিটকে যেতে চাইল। গলার পেশি থেকে ছিঁড়েই গেল মাথা। গাড়িটা এখনও উঠে আসছে। মনে হলো চালিয়ে আনছে এক মস্তকবিহীন ঘোড়সওয়ার। কোয়াড বাইক কাছে চলে আসতেই লাথি দিয়ে লাশটা ফেলতে চাইল রানা। লোকটার হাত এখনও

ধরে রেখেছে থ্রটলটা।

গতি কমে এসেছে বাইকের, ঠেলে লাশ ফেলে দিল রানা। নিজে সিটে চেপে গতি তুলতে শুরু করল। পিছু নিতে হবে উর্বশীর। সিকি মাইল এগিয়ে গেছে পিকআপ ট্রাক।

ঠিক তখন ওটার সামনে পড়ল আর্মারভেদী এক স্যাবট গোলা। ব্রেক চাপল ড্রাইভার, স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে সড়কের আরেক দিক দিয়ে এগুতে চাইল। এই সুযোগে দূরত্ব কমিয়ে আনল রানা।

আঠারো

আগে কখনও এত খারাপ লাগেনি কাশেমের। নাক হয়েছে করমচার মত লাল, সেই সঙ্গে ব্যথা। ছোঁয়া লাগলে ছ্যাঁৎ করে উঠছে। ওর মনে হচ্ছে, খসে পড়বে এবার। হাঁচির পর হাঁচি চলছে। একটা হলে সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক চলতে থাকে। কপালের ব্যথায় মন চাইছে, মাথাটা খুলে টেবিলে রেখে দেয়! বুকের ভিতর সর্বক্ষণ ঘড়ঘড় আওয়াজ।

ওর একমাত্র সান্ত্বনা, জাহাজের প্রায় প্রতিটি মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অবশ্য স্বর্ণা অনেকের চেয়ে ভাল আছে। যদিও ভাইরাল ইনফেকশন থেকে রক্ষা পায়নি। একটু পর পর শীতে শিউরে উঠছে। বেশিরভাগ যাত্রী যে যার কেবিনে আশ্রয় নিয়েছে। গ্যালি থেকে পাঠানো হচ্ছে গ্যালনকে গ্যালন মুরগির

সুপ। মেডিকেল স্টাফরা হাতে তুলে দিচ্ছে অ্যান্টি অ্যালার্জিক ট্যাবলেট।

কাশেম-স্বর্ণা আপাতত লাইব্রেরির ভিতর একাকী। মুখোমুখি বসে মাথা নিচু, কোলের উপর বই। কেউ দেখলে ভাববে, এদের মত জ্ঞানপিপাসু পাঠক লাখে একটাও মেলে না! টেবিলের উপর টিশ্যু, একটু পর পর নাক ঝাড়ছে।

'আমি এখন জানি কেন ক্রুজ শিপে ভাইরাস ছড়িয়েছে,' বলল কাশেম।

'কারণটা শুনি?'

'নিজেদের দিকে চেয়ে দেখুন। আমরা তো ইঁদুরের মত আটকা পড়েছি, নিজেদের সর্দির খাঁচায়। ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে ভাইরাস, সবাই শেষে আক্রান্ত হবে।'

তিক্ত হাসল স্বর্ণা। 'তা-ই আসলে। জাহাজে আছে মাত্র এক ডাক্তার আর এক নার্স। সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাদের কিছুই করবার নেই।'

'এটা যদি কোনও শহর হতো, হাসপাতাল থাকত, ইনফেক্টেড হওয়া মানুষগুলোকে সরিয়ে নেয়া হতো। আউটব্রেক হলেও সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলোকে কোয়ারান্টাইন করা যেত।'

'তাই আসলে।' আলাপে মনোযোগ দেয়া কঠিন হয়ে উঠেছে স্বর্ণার পক্ষে। তারপরও বলল, 'চলুন, আরেকবার খুঁজে দেখি। চারপাশে কোথাও ভাইরাসের বোতল থাকতে পারে। বা ওইরকম কিছু।'

'অন্তত এক শ' বার খুঁজেছি,' বলল কাশেম। 'এয়ার-কণ্ডিশনার, ওয়াটার সিস্টেম, খাবার বা অন্য কোথাও নেই। বহুবার ডাবল চেক করেছি। এখন দরকার ছিল জন-শক্তি। পুরো জাহাজ খুঁজতে হলে দরকার একদল ইঞ্জিনিয়ার, নইলে

পাওয়া যাবে না ডিসবার্সাল ডিভাইস।'

জাহাজ জুড়ে খুঁজে কিছুই পায়নি ওরা। অসুস্থ হয়ে পড়ায় এখন বসে থাকাই কঠিন হয়ে উঠেছে। তবুও হাল ছাড়তে চাইল না স্বর্ণা, বলল, 'চলুন আমার সঙ্গে। ভেবে বের করতে হবে কীভাবে ছড়িয়ে দিল ভাইরাস। এটা তো আসলে ভাসমান এক শহর। এখানে রয়েছে খাবার, পানি, সেপটিক, আবর্জনা সরানোর জায়গা আর ইলেকট্রিসিটি। এর ভিতরই কোথাও থাকবে ডিসবার্সাল ডিভাইস।'

'আর্বজনার ভিতর ভাইরাস দেবে?' মাথা নাড়ল কাশেম। 'আসুন মাথার ব্যথা নিয়ে চুপচাপ বসে গজর গজর করি।'

'অন্য ভাবেও ভাবা যায়।' বলল স্বর্ণা, 'ক্রুজ শিপ আসলে কোনও হোটেল। আর এই হোটেল চালু করতে হলে কী লাগে?'

'সব শহরের মত। পকেটে মোটা টাকা।'

'আপনি কিন্তু সহায়তা করছেন না।'

'আমি সে চেষ্টা করিনি, কারণ, এভাবে কিছুই খুঁজে পাব না।'

ঝট করে চেয়ার ছাড়ল স্বর্ণা। 'বুঝেছি! আসুন!'

'আপনার মোটা টাকার ভিতর ভাইরাস?'

'না। প্রতিটি কেবিনে ঢোকে মেইড। কাজ কাপড়চোপড় পরিষ্কার করা।'

'করুক।'

'বিছানার চাদর থেকে শুরু করে সব পাল্টে দেয় তারা। আপনার মনে পড়ে, মাসুদ ভাই যখন অমল দাশাকে উদ্ধার করলেন, তখন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াশিং মেশিন দেখেন। তবে ওগুলোর সঙ্গে ড্রায়ার ছিল না। লোকগুলো ওখানে ট্রেইনিং নিয়েছে। ভাইরাস ছড়িয়ে দেবে লণ্ড্রির মাধ্যমে। প্রতিদিন নতুন

চাদর পাল্টে দেবে মেইড। তার সঙ্গে থাকতে পারে ভাইরাস। তা না হলে হতে পারে ডাইনিং রুমের ন্যাপকিন। নিখুঁত পরিকল্পনা। প্রতি বেলা পরিষ্কার ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মোছে সবাই। তার সঙ্গে ভাইরাস। বারো ঘণ্টা ওয়াশিং মেশিনের ভিতর ভাইরাস রাখলে, জাহাজের সবাই আক্রান্ত হতে বাধ্য।'

দু'হাতে মাথা টিপতে শুরু করেছে কাশেম। 'আমরা আগে ভাবলাম না কেন? ওভাবে ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়া সবচেয়ে সোজা!' উঠে দাঁড়াল সে। 'চলুন লণ্ড্রি রুমে গিয়ে দেখা যাক।'

রুক্ষ প্রান্তরে চলবার জন্য তৈরি করা হয়েছে কোয়াড বাইক, সঙ্গে দেয়া হয়েছে বাড়তি দৈর্ঘ্যের শকঅ্যাবজর্ভার ও স্প্রিং। এ মুহূর্তে ইঞ্জিনটার কাছ থেকে সমস্ত শক্তি আদায় করতে চাইছে রানা। ধেয়ে চলেছে পিকআপ ট্রাক ধরতে। ট্রাকের নাকের কাছে পড়ছে একের পর এক গোলা। বাধ্য হয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে ড্রাইভার। আর সে কারণে ট্রাকের কাছে পৌঁছে গেল রানা সহজেই।

'বস্, আতাসি বলছি,' ভেসে এল আতাসির কণ্ঠ। 'পঁয়তাল্লিশ মিনিট হওয়ার ওয়ার্নিং এটা। রিপিট করছি: পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ইমপ্যাক্ট।'

'শুনেছি,' বলল রানা। নিরাপদে সরে যাওয়ার জন্য যে সময় ওরা রেখেছিল, তা পেরিয়ে গেছে। 'না শুনলেই ভাল হতো। আর গোলা ফেলিস না, অনিল। ফু-চুং, ট্রাকের পিছনের লোকটাকে ব্যস্ত রাখ্। আমি কাছে পৌঁছতে চাই।'

'বেশ।'

পিকআপ ট্রাকের পিছনের গার্ড অস্ত্রের নল গেঁথে রেখেছে উর্বশীর পিঠে। চারপাশে কী ঘটছে কিছুই জানে না বেচারি।

তবে হঠাৎ অস্ত্র সরিয়ে নেয়া হলো। পরক্ষণে বৃষ্টির মত গুলি চলল। মাথা কাত করে দেখতে চাইল উর্বশী। আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ছে গার্ড। হঠাৎ কোত্থেকে যেন হাজির হয়েছে রবিনসন, নেমে এল ট্রাকের একটু উপর। বাধ্য হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল গার্ড।

সুযোগটা নিল উর্বশী, কনুই দিয়ে গুঁতো দিল লোকটার পাঁজরে। জোরে লাগল না, ফলে কিছুই হলো না। অস্ত্রটা ঝট করে ঘুরিয়ে নিয়ে গুলি করতে চাইল গার্ড। তবে দু'হাতে নল সরিয়ে দিল উর্বশী। আঁধার আকাশে ছুটে গেল বুলেট। পোড়া গান-পাউড্যারের কণা ছিটকে লেগেছে দুই চোখে, তারই ফাঁকে প্রতিপক্ষের দিকে চাইল উর্বশী, পরক্ষণে গায়ের জোরে কনুই চালাল ওর সোলার প্লেক্সাসে। নির্বিকার ভঙ্গিতে ব্যথা হজম করল গার্ড, তারপর পাল্টা ঘুসি মারল উর্বশীর গালে। পাত্তা দিল না উর্বশী, মনে হলো নতুন করে শক্তি ফিরে পেয়েছে, লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার উপর। দু'হাতে ঘুসি মেরে চলেছে।

পিকআপ ট্রাকের বেড সংকীর্ণ জায়গা, ওখানে রাইফেল ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে বিপদে পড়ল গার্ড। একহাতে গায়ের উপর থেকে সরাতে চাইল মেয়েটাকে। দু'পা পিছিয়ে গিয়েই ঘুরে লাথি মারল উর্বশী, লাগল লোকটার নিতম্বে, নিজেও পড়ল ধপাস্ করে। পরক্ষণে উঠে দাঁড়াল উর্বশী, এক হাতে রেলিং ধরে ভারসাম্য রাখতে চাইল।

পিকআপ ট্রাকের রিয়ার বাম্পারের দু'ফুট পিছনে পৌঁছে গেল রানা। হ্যাণ্ডলবার ধরে ঝুঁকে পড়েছে, পিছনে চেয়ে ওকে দেখবে না ড্রাইভার। রানার ঠোঁট নড়তে দেখল উর্বশী। ওকে বলছে, কপ্টারের পাইলটকে, না মার্ভেলকে?

সোজা হয়ে গার্ডের মুখে ঝেড়ে লাথি ছুঁড়ল উর্বশী। পরক্ষণে সামনে বেড়ে কনুই বসিয়ে দিল গলার উপর। বিস্ফারিত হলো লোকটার দুই চোখ। শ্বাস আটকে যাওয়ায় বিশাল হাঁ করল। হাত থেকে পড়ে গেল রাইফেল। ওটা হাতে পেতে চাইল উর্বশী।

ঠিক তখন মার্ভেল থেকে এল কামানের গোলা, সোজা এসে নামল পিকআপ ট্রাকের নাকের সামনে। বামে সরতে শুরু করল ড্রাইভার, আর সে সুযোগে পাশে পৌঁছে গেল রানা। চেঁচিয়ে উঠল, 'লাফিয়ে পড়ো, উর্বশী।' নিজে সিটের সামনের দিকে সরে বসল।

রিয়ার গেট পেরিয়ে বাম্পারে নামল উর্বশী, এক পা বাড়িয়ে দিল। পরক্ষণে লাফিয়ে পড়ল স্যাডল সিট লক্ষ্য করে। ধপ করে নেমে এল, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানার কোমর।

রিয়ারভিউ মিররে সব দেখেছে ইংরেজ গার্ড, সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠল। এটিভির দিকে চেপে আসতে লাগল। তখনই কষে ব্রেক চেপে সরে গেল রানা। পরক্ষণে বাড়িয়ে দিল গতি। দুই আরোহী নিয়ে দ্রুত এগুতে লাগল কোয়াড বাইক। পিছু নিল পিকআপ ট্রাক। সর্বোচ্চ গতি তুলেছে রানা ও ড্রাইভার, এরপর আর দূরত্ব পেরুতে পারল না কেউ। ড্রাইভার বুঝতে পেরেছে সামনের ওই বাইকের কারণে গোলা পড়বে না।

'আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে,' কাঁধের উপর দিয়ে চাইল রানা। মাত্র পাঁচ গজ পিছনে ট্রাকের ইঞ্জিনের গ্রিল। 'লোকটা ধাওয়া করছে। ...আর তোমার মুখ ফুলে গেছে উর্বশী।'

'মুখ যে আছে তা-ই বেশি!' রানার কানের কাছে বলল উর্বশী। 'রীতিমত অসুস্থ লাগছে আমার।'

'দু'হাতে কোমর ধরে থাকো,' সাবধান করল রানা। সড়কের

পাশে সরে গেল, তারপর টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করল। খানিক গিয়ে ঘুরিয়ে নিল বাইক। আবার ফিরতে শুরু করেছে ডকের দিকে। এখন অ্যাক্সিডেন্ট হলে ঘাড় মটকে মরবে দু'জন। হ্যাণ্ডলবার ঘুরিয়ে সড়কে নেমে এল রানা। পিকআপ ট্রাকের ড্রাইভার টিলা থেকে নামতে সময় নিল। ততক্ষণে পঞ্চাশ ফুট এগিয়ে গেল এটিভি। এ সুযোগে মার্ভেলের সঙ্গে কথা বলতে চাইল রানা। পিকআপ ট্রাকের গতি এটিভির চেয়ে বেশি, মসৃণ রাস্তার উপর দ্রুত কমে আসবে দূরত্ব।

'অনিল, আমি বললে ডকের উপর হাই-এক্সপ্লোসিভ গোলা ফেলবি।'

'ঠিক আছে।'

'কী করতে বললে, রানা?' উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল উর্বশী।

'আবার সেই সি প্ল্যান।'

রাস্তা ধরে দ্রুত এগিয়ে চলেছে এটিভি, তবে কমিয়ে আনা হয়েছে গতি। ইঞ্জিনের সমস্ত শক্তি শেষ করতে চাইছে না রানা। জ্বলন্ত গার্ডহাউসটাকে পাশ কাটাল। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে করোগেটেড প্লেট। ডকে উঠে পড়ল রানা, মুচড়ে খুলে দিল পুরো থ্রটল। একইসঙ্গে গতি, দূরত্ব ও সময়ের হিসাব কষছে।

'এবার ফায়ার কর্!'

পিকআপ ট্রাকের গার্ড পিছিয়ে গেছে, বুঝল না কেন ধরা পড়তে চাইছে এটিভির ওরা। একবার পিয়ারে উঠলে কোণঠাসা হবে তারা। তবে ড্রাইভার যখন বুঝল সামনের এটিভির গতি কমছে না, নতুন করে আবার ধাওয়া শুরু করল।

'ফু-চুং!' রেডিওতে বলে উঠল রানা। 'তৈরি থাক, আমাদের পানি থেকে তুলে নিবি।'

বদলে কী যেন বলল ফু-চুং, তবে জোর হাওয়ায় কথাগুলো হারিয়ে গেল।

প্রচণ্ড গতি তুলে পুরো ডক পেরিয়ে গেল রানা-উর্বশী, ছুটে চলেছে পঞ্চাশ মাইল বেগে।

এবার বুঝতে পেরেছে উর্বশী, কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠল, 'রানা, তুমি একটা পাগওওও...'

ডকের শেষে উড়াল দিল এটিভি, পুরো বিশ ফুট গিয়ে ঝপাস্ করে নামল সাগরের কোলে। প্রায় কাত হয়ে পড়েছে এটিভি। ডকের শেষে থামল গার্ড, দরজা খুলে নেমে পড়ল অ্যাসল্ট রাইফেল হাতে। পিকআপ ট্রাকের সাসপেনশন তখনও নাচছে। অপেক্ষা করল সে, শত্রুরা ভেসে উঠলেই গুলি করবে।

ঠিক তখন শুনল তীক্ষ্ণ শিস, তবে সময় পাওয়া গেল না।

এক্সপ্লোসিভ শেল ট্রাকে লাগল না, তবে পড়ল ডকের উপর। ফলাফল একই হলো। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হলো ডক ও ট্রাক। সব ছিটিয়ে গেল সাগরে।

উর্বশীকে এক হাতে ধরে ভেসে উঠল রানা, একবার চাইল বিধ্বস্ত ডকের দিকে। অর্ধেক ডক হাওয়া। বাকি অংশের টিমবার ফেটে গেছে, ধ্বংস হয়েছে পাইলিং।

'এটা খুব জরুরি ছিল?' সাঁতরাতে শুরু করেছে উর্বশী।

'তোমাকে একবার একটা স্যাটালাইটের কথা বলেছিলাম, মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ, একটা ইজরায়েলি স্যাটালাইট।'

'ওটা অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রোজেক্টাইল,' ঘড়ি দেখে নিল রানা। 'ওটা আসছে এই দ্বীপ উড়িয়ে দিতে। বাকি মাত্র আটত্রিশ মিনিট। কাজেই এখন এখান থেকে লেজ তুলে ভাগতে হবে।'

'তোমার আছে, জানি,' হাসল উর্বশী, 'কিন্তু আমার যে ওটা নেই!'

হাসল রানাও। এই বিপদের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে মেয়েটা। জানে না, ওকে পেয়েই মুহূর্তে সব বিপদ তুচ্ছ হয়ে গেছে মেয়েটির কাছে।

টিলার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল রবিনসন, ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। দ্রুত ডক পেরুল ওটা। একটু আগে কী যেন বলেছে ফু-চুং, ভাবল রানা। বোধহয় বলতে চেয়েছে, বিধ্বস্ত হবে কপ্টার! রানা ও উর্বশীর মাথার কাছে নেমে এল রবিনসন, সাগর থেকে ছিটকে উঠল কুয়াশার মত মিহি জলকণা। আরও নেমে এল ফু-চুং, রবিনসনের স্কিডকে ধুইয়ে দিল সাগরের পানি। উর্বশীকে উঠতে সাহায্য করল রানা, ফড়িঙের বুকে উঠে গেল মেয়েটি। তবে সেণ্টার অভ ব্যালান্স হারাতেই কাত হয়ে গেল রবিনসন।

উর্বশী উঠবার পর নিজেও উঠতে গিয়ে থমকে গেল রানা, একের পর এক বিস্ফোরণের আওয়াজ শুরু হয়েছে কপ্টারের ইঞ্জিনের ভিতর। 'রওনা হয়ে যা, ফু-চুং!' দুই হাতে স্কিড ধরে রইল ও।

দ্বিতীয়বার বলতে হলো না ফু-চুংকে, ডকের কাছ থেকে ঘুরিয়ে নিল কপ্টার, রওনা হয়ে গেল। সড়ক ধরে এগিয়ে আসছে আরেকটা পিকআপ ট্রাক। ড্রাইভার ছাড়াও পিছনে দুই গার্ড, হাতে একে-ফোরটিসেভেন।

চার হাত-পায়ে রবিনসনের স্কিড পেঁচিয়ে ধরল রানা। প্রচণ্ড হাওয়া উড়িয়ে নিতে চাইল ওকে। ভেজা পোশাক যেন পরিণত হয়েছে বরফে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে কোনমতে ঝুলে রইল রানা। আর মাত্র দুই এক মাইল দূরে

মার্ভেল। এই অবস্থায় ফু-চুংকে বলা উচিত হবে না, আমাকেও তুলে নে।

ফু-চুং বোধহয় মার্ভেলে রেডিও করেছে, দূরে দেখা গেল জাহাজের সমস্ত বাতি জ্বলে উঠেছে। ডেকের উপর ছোটাছুটি করছে ক্রুরা। রবিনসনকে ল্যাণ্ড করতে সাহায্য করবে। গগল এরই ভিতর দ্বীপের দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়েছে মার্ভেলের বো। যে-কোনও সময়ে রওনা হবে জাহাজ।

মার্ভেলের ফ্যানটেইল অনেক নীচে রেখে ডেকের উপর চলে এল রবিনসন। জ্বলছে বেশ কিছু ওয়ার্নিং বাতি, সেইসঙ্গে ককপিটের ভিতর বেজে চলেছে সতর্ক-ধ্বনি। তপ্ত ট্রান্সমিশনের ভিতর পুড়ে চলেছে তেল। উচ্চতা কমিয়ে আনল ফু-চুং।

ডেকে কয়েকটা হাত সরিয়ে নিল রানাকে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কপ্টারের দিকে চাইল রানা। যথেষ্ট জায়গা পেয়ে নামতে শুরু করেছে কপ্টার।

হেলিপ্যাডে স্কিড ধপ করে নেমে আসতেই রেডিও করল রানা। 'গগল, গতি তোলো।' কপ্টারের দিকে চাইল। ওটার আয়ু শেষ। ইঞ্জিনের কাউলিং থেকে ভলকে বেরিয়ে আসছে কমলা আগুন। অপেক্ষারত ক্রুরা হোসপাইপ দিয়ে কেমিকাল স্প্রে করছে। তারই ভিতর দিয়ে নেমে এল উর্বশী ও ফু-চুং। রানার পাশে এসে থামল ওরা।

'আরেকটা কপ্টার কিনে দিতে হবে মিস্টার পাপাগোপালাকে,' বলল ফু-চুং।

'আগেই বলে রেখেছেন, কিছু কিনতে হবে না,' বলল রানা। 'দরকার পড়লে আবার কিনে দেবেন। শর্ত একটাই: তাঁর কোনও বিপদ হলে পাশে থাকতে হবে।'

বাড়ছে বাতাস। যেন শুরু হয়েছে ঝড়। ডেক থেকে সরে

গেল ওরা, ঢুকে পড়ল সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর। তীব্র গতি তুলছে গগল। পিছনে নিশ্চিন্ত চিত্তে রইল বিশ্রী চেহারার ইয়োস দ্বীপের লোকগুলো। জানে না, একটু পর হারিয়ে যাবে দ্বীপটা দুনিয়ার বুক থেকে।

উনিশ

কী করা উচিত, ঠিক বুঝে উঠছে না ডিয়েটস কেসলার। ডকের গার্ডরা রিপোর্ট করেছে। উর্বশী মেয়েটা ফ্যাসিলিটি থেকে এগযস্ট ভেন্ট দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তারপর ধরাও পড়েছে। কিন্তু তখনই কোত্থেকে কালো এক হেলিকপ্টার এসে হামলা শুরু করে। প্রথমে ভয় পেয়েছে কেসলার, বোধহয় এই হামলার পিছনে রয়েছে মার্কিন সরকার। তাদের ওই ধরনের কালো হেলিকপ্টারের বহর আছে। ওয়াকি-টকিতে কিছু কথা তার কানে এসেছে, তারপর সব থেমে গেছে। গার্ডহাউসের উপর বসানো ক্যামেরাগুলো কাজ করছে না। বাধ্য হয়ে নিজের লোককে নির্দেশ দিয়েছে সে, 'যাও, পিকআপ ট্রাক নিয়ে দেখে এসো ডকে কী ঘটছে।'

'ওরা পালিয়ে গেছে, মিস্টার কেসলার,' কিছুক্ষণ পর গার্ডদের ক্যাপ্টেন যোগাযোগ করেছে। 'উর্বশী দাশা আর সঙ্গে এক লোক। ধ্বংস করে দিয়েছে গার্ডহাউস। সঙ্গে ডক। আমাদের বেশ ক'জন গার্ডকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ওদের কেউ রয়ে যায়নি তো?'

'আমরা চারপাশ তল্লাসী করছি। তবে মনে হয় ওই একজন লোকই এসেছিল।'

'সে মাত্র একজন, তোমার এত গার্ডকে খুন করল কী করে?' অবিশ্বাস নিয়ে বলল কেসলার। 'একাই ধ্বংস করে দিল ডক?'

'এ মুহূর্তে কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারব না, মিস্টার কেসলার।'

'বেশ, চারপাশ খুঁজে দেখো। নতুন কোনও অস্বাভাবিকতা দেখলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।'

চুলের ভিতর আঙুল চালাল কেসলার। লিঙ্ক চ্যাপেলের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হবে। আরও দুই ঘণ্টা পর সিগনাল পাঠিয়ে দেবে সে। কিন্তু সত্যি যদি আরও বড় কোনও হামলা আসে? দেরি করা মানেই কিন্তু ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি নেয়া। এ দিকে, সে যদি আগেই সিগনাল পাঠিয়ে দেয়, এমনও হতে পারে পঞ্চাশটা ক্রুজ শিপে ভাইরাস ছড়ানো গেল না। লণ্ড্রি মেশিনের ফিড লাইনে যদি যুক্ত না হয় ভাইরাস?

তার পীরের কাছে ফোন করতে মন চাইল কেসলারের। তবে বুঝতে পারছে, এই সিদ্ধান্ত তার নিজের নিতে হবে। দুই মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে রওনা হয়ে গেছেন চ্যাপেল। ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়ার পর মেয়েদের নিয়ে ইয়োস দ্বীপে পৌঁছবেন তিনি। বহুদিন হলো রেসপন্সিভিস্টদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে কেসলার। ঠিক যেমন বাবার কাছ থেকে ব্যবসা বুঝে নেয় ছেলে। তবে সে টের পেত, তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয় তার উপর। আসলে কখনও নেতৃত্বে ছিল না সে। কখনও ভোলেনি যে তার যে-কোনও সিদ্ধান্ত পাল্টে দিতে পারেন চ্যাপেল। এবং সেজন্য কোনও ব্যাখ্যাও দেবেন না তিনি।

এ নিয়ে বেশি ভাবেনি কেসলার। বেশির ভাগ সময় নাক গলাননি চ্যাপেল। তবে এ মুহূর্তে কেসলারের মনে হলো, এই বিশাল জুয়া খেলবার সময় চ্যাপেল থাকলে ভাল হতো। উনি জানিয়ে দিতে পারতেন কখন কী করতে হবে।

কী হবে ক'টা ক্রুজ শিপে ভাইরাস ছড়াতে না পারলে? চ্যাপেলের হিসাব অনুযায়ী মাত্র চল্লিশটা জাহাজে ভাইরাস ছড়িয়ে দিলেই ইনফেক্টেড হবে দুনিয়াজুড়ে মানুষ। বাড়তি দশটা জাহাজ ছিল ইনস্যুরেন্সের মত। চ্যাপেল যখন জানতে চাইবেন কেন বাকি দশটা জাহাজে ভাইরাস হামলা হলো না, সে বলতে পারবে: ওসব জাহাজে ডিসপার্সাল ডিভাইস ঠিকমত কাজ করেনি।

'ব্যস, আর ভাবব না,' ঊরুর উপর চাপড় দিল কেসলার, উঠে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেল ইএলএফ ট্র্যান্সমিটার রুমের দিকে।

ঘরে ঢুকে দেখল সাদা ল্যাব কোট পরা এক টেকনিশিয়ান কন্ট্রোলের সামনে বসা। 'এখনই সিগনাল পাঠিয়ে দেয়া যায়?' জানতে চাইল কেসলার।

'আমাদের শিডিউল অনুযায়ী আরও দু'ঘণ্টা পর পাঠানোর কথা।'

'তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি,' কড়া স্বরে বলল কেসলার। তার সিদ্ধান্ত নেয়া শেষ। কাজেই এখন নির্দেশ দেবার সময়।

'ব্যাটারিগুলোকে ডাবল চেক করতে লাগবে কয়েক মিনিট। এগযস্ট সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পাওয়ার প্লান্ট এখন অফ লাইনে।'

'যা করার দ্রুত করবে।'

ইন্টারকমে ফ্যাসিলিটির অন্য এক কলিগের সঙ্গে আলাপ শুরু করল টেকনিশিয়ান। সায়েন্টিফিক কী সব যেন, ওগুলো বুঝবার চেষ্টা করল না কেসলার।

'আর কয়েক মিনিট, তারপর সিগনাল পাঠানো যাবে, মিস্টার কেসলার।'

ইজরায়েলি স্যাটালাইটের ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগ সময়ে সিদ্ধান্ত নিল। ঘণ্টায় সতেরো হাজার মাইল গতি তুলে ইউরোপের উপর ছুটছে স্যাটালাইট। দ্রুত ট্র্যাজেকটরির হিসাব নেয়া হলো, এবং সঠিক সময় আসতেই সিগনাল পৌঁছে গেল সেণ্ট্রাল প্রসেসারে। সেখান থেকে লঞ্চ টিউবে। মহাশূন্যে আওয়াজ নেই, কাজেই কোনও শব্দ হলো না। তবে বিস্ফোরিত হলো কমপ্রেসড গ্যাস, ওটা টিউব থেকে খসিয়ে দিল টাংস্টেনের রড। জিনিসটা নামতে লাগল দ্রুতবেগে।

সামান্য একটু কাত হয়ে পৃথিবীর দিকে নামছে টাংস্টেনের রড। ওটার নির্মাতারা এভাবেই চেয়েছে। কেউ আকাশে চোখ মেললে দেখবে, নেমে আসছে কোন উল্কাপিণ্ড। অ্যাটমসফিয়ারের শুরুতে মলিকিউলগুলোর কারণে প্রতিক্রিয়া হলো, সামান্য গরম হয়ে উঠল রড। তবে ওটা আরও নামতে শুরু করলে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ পর পুরো দণ্ড হয়ে উঠল লাল রঙের আগুন। তারপর হলুদ। শেষে হয়ে উঠল জ্বলজ্বলে সাদা বজ্রের মত।

প্রচণ্ড তাপ তৈরি হয়েছে রড ও তার আশপাশে, তবে টাংস্টেন গলানোর মত তাপমাত্রা আসতে দেরি আছে। সেটা তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। মাটি থেকে অনেকেই দেখতে

পেল ওই উজ্জ্বল সাদা দণ্ড, প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে মেসেডোনিয়া ও উত্তর গ্রিসের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

মনিটরের ডিজিটাল ঘড়িতে এখন মাত্র একটা সংখ্যা দেখা যায়। উর্বশীকে উদ্ধার করবার আগে পর্যন্ত ওই ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেনি রানা। এখন চোখ সরাতে পারছে না। উর্বশী কিছুতে মেডিকেলে যেতে রাজি হয়নি। আগে দেখবে ইয়োস দ্বীপে কী ঘটে। বাধ্য হয়ে ওষুধপত্র নিয়ে হাজির হয়েছে ফারা। চিকিৎসার কাজও চলুক, আবার ছায়াছবিও দেখা হোক। সাগর আয়নার মত স্থির, কাজেই নিজের কাজ করতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না ফারার।

পুবদিক তাক করে পূর্ণ গতি তুলে ছুটছে মার্ভেল।

ইঞ্জিনগুলোর স্পিডোমিটারে দেখা যাচ্ছে লাল সীমারেখা ছাড়িয়ে গেছে গতি। সাধারণ অবস্থায় আপত্তি তুলত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার উর্বশী, তবে এখন একটি কথাও বলছে না। অপারেশন্স সেন্টারে সবাই চুপ। যথেষ্ট দূরত্ব তৈরি করতে পারেনি মার্ভেল। এদিকে সময় ঘনিয়ে এল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের। ওরা যদি পারত, জাহাজের পিছনে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে আরেকটু গতি বাড়াতে চাইত।

একটানে ইয়ারফোন খুলে ফেলল আতাসি, কাকে যেন অভিশাপ দিল।

'কী হলো?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'ইএলএফ ব্যাণ্ডে সিগনাল পেলাম। আসছে ইয়োস থেকে। ট্রিগার কোড পাঠাতে শুরু করেছে ওরা।'

থমথম করছে রানার মুখ। সোহেল চেয়ে রইল ওর দিকে।

'কথা শেষ করতে পারবে না ওরা,' নিচু স্বরে বলল উর্বশী।

'ওয়েভলেংথ অনেক লম্বা, পুরো কোড পাঠাতে লাগবে বহু সময়।'

'অথবা ইএলএফ সিগনাল পেলেই ছড়িয়ে দেবে ভাইরাস,' শুকনো গলায় বলল অনিল।

একবার মনিটরের দিকে চাইল রানা। ভাবতে শুরু করেছে, বহু পথ পাড়ি দিয়ে এসে এখন যদি ব্যর্থ হতে হয়, আফসোসের শেষ থাকবে না। আরেকবার ডিজিটাল ঘড়ি দেখল রানা। ঘনিয়ে আসছে চরম সময়।

পার্ল অভ মুনের ইউনিফর্ম পরে নিয়েছে স্বর্ণা ও কাশেম, নতুন করে খুঁজতে শুরু করেছে। মনে করতে চাইছে জাহাজের লণ্ড্রি কোথায়। আশপাশে দু'চারজন ক্রু দেখল। তবে তারা সবাই অসুস্থ, কারও দিকে চাইবার বা প্রশ্ন ছুঁড়বার মত অবস্থা তাদের নেই।

কিছুক্ষণ করিডোর ধরে এগুনোর পর শুনতে পেল ওরা ড্রায়ারের আওয়াজ। হাঁটবার গতি বাড়িয়ে দিল স্বর্ণা-কাশেম। বামের ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে বাষ্প। ঘরের বাতি কম ওয়াটের। তারই ভিতর যে যার কাজে ব্যস্ত চাইনিজ কর্মীরা। কোনও দ্বিধা না করে লণ্ড্রির ভিতর ঢুকে পড়ল স্বর্ণা-কাশেম।

দরজার পাশে লুকিয়ে ছিল এক লোক, সে খপ করে ধরে ফেলল স্বর্ণার বামহাত। 'এখানে কী?' কড়া স্বরে জানতে চাইল।

ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল স্বর্ণা। ওই লোককে চিনতে পেরেছে কাশেম, এ হেলিকপ্টার থেকে নেমেছে ব্রাঙ্কোর সঙ্গে। এখানে পাহারা থাকবে আগেই বোঝা উচিত ছিল, ভাবল কাশেম। ঝট্ করে ঘুরেই লোকটার দিকে পা বাড়াল। তবে

থমকে যেতে হলো। পিস্তল বের করে নলটা স্বর্ণার কপালে ঠেসে ধরেছে সে। কাশেমকে লক্ষ্য করে বলল, 'নড়বে না, নইলে মরবে তোমার সঙ্গিনী।'

যা ঘটছে সবই দেখছে চাইনিজ কর্মীরা, তবে কোনও সাহায্য করতে চাইল না। জামা-কাপড় ভাঁজ করছে, গুছিয়ে রাখছে চাদর, আরও ক'জন ইস্ত্রি করছে শার্টে।

'আমরা জরুরি কাজে এসেছি,' দু'পা পিছিয়ে গেল কাশেম। 'ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম রেডি হলো কি না দেখতে পাঠিয়েছেন।'

'তোমার আইডি ব্যাজ দেখি।'

ওভারঅলের সামনে থেকে আইডি খুলে নিল কাশেম। মোফিজ বিল্লাহ জানে না ডায়মণ্ড ক্রুজ লাইন্সের কর্মীদের কী ধরনের আইডেনটিফিকেশন কার্ড দেয়া হয়। তবে নকল দিয়ে কাজ চালাতে পারার কথা। ব্রাঙ্কোর লোক নিশ্চয়ই জানে না তফাৎ কোথায়। 'এই যে, স্যর। আমি কাশেম বক্স।'

হঠাৎ দরজা জুড়ে হাজির হলো জ্যারোন্ ব্রাঙ্কো। 'কী হচ্ছে এখানে?' জানতে চাইল নিজের লোকের কাছে।

'এরা বলছে ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম নিতে এসেছে।'

এক টানে উইণ্ডব্রেকার থেকে পিস্তল বের করল ব্রাঙ্কো। 'আমি ক্যাপ্টেনকে আগেই বলেছি, শুধু লণ্ড্রি ওঅর্কার ছাড়া কেউ যেন এখানে না ঢোকে। ...তোমরা কারা?'

'জাহাজের ক্রু, স্যর,' নরম স্বরে বলল কাশেম।

'সেক্ষেত্রে আসতে না। তোমরা ওই দলের কেউ।'

ধরা পড়তেই হবে, কাজেই বরফ-শীতল স্বরে জানাল স্বর্ণা, 'তোমাদের খেলা শেষ, ব্রাঙ্কো।' লোকটাকে চমকে দিয়েছে। 'আমরা ভাইরাসের ব্যাপারে সবই জানি। এ-ও জানি তোমরা

ক্রুজ শিপে ওয়াশিং মেশিনের মাধ্যমে ভাইরাস ছড়াবে। আমাদের লোক পৌঁছে গেছে প্রতিটি জাহাজে। এবার একে একে বন্দি হবে তোমরা। ডিসপার্সাল ডিভাইস সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এখনও যদি বুঝতে না পারো, আরেকবার বলছি, অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করো। নইলে এ জীবনে বেরুতে পারবে না জেল থেকে।'

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই, মেয়ে,' বলল ব্রাঙ্কো। 'তবে এই নাম আমার নয়। আমার আসল নাম ডার্কো বোজান। ইউগোস্লাভ যুদ্ধে এ নাম বারবার এসেছে পত্র-পত্রিকা ও সাধারণ মানুষের মুখে, দুনিয়ার অন্যতম গণহত্যাকারী হিসাবে। কাজেই বুঝতে পারছ, আমার ভাল করেই জানা আছে, ধরা পড়লে আমার আসল নাম বেরিয়ে আসবে। কোনদিনই আর জেল থেকে বেরুতে পারব না।'

'তোমার মাথার ঠিক আছে?' স্বাভাবিক স্বরে বলল কাশেম। 'রেসপন্সিভিস্টদের এই ফালতু পরিকল্পনার জন্য নিজেও মরতে চাও? গোল্ড অভ মার্সে কী ঘটেছে আমরা দেখেছি। মরতে হবে তোমাকেও।'

'সব তোমরা জানো না,' বলল খুনি ব্রাঙ্কো। 'মিথ্যার পর মিথ্যা আউড়ে চলেছ নিজেদের বাঁচাতে। ওগুলোর ভিতর রয়েছে ভাইরাস,' হাতের ইশারা করে বিশাল ওয়াশিং মেশিনগুলো দেখিয়ে দিল সে। 'গোল্ড অভ মার্সে যেগুলো ছাড়ি, সেগুলো আর এগুলো এক জিনিস নয়। একই স্ট্রেইন থেকে তৈরি, তবে এটা মানুষের প্রাণ নেবে না। বলতে পারো, বদলে দেবে মানুষকে।'

'আট শ' মানুষকে খুন করেছ তুমি, আর বলছ...' রাগে কাঁপছে স্বর্ণা।

হেসে ফেলল লোকটা। 'যা খুশি ভাবতে পারো। তবে ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেল কিন্তু সত্যিই নিপাট ভদ্রলোক। তাঁর এই ভাইরাস শুধু জ্বর এনে দেবে, সঙ্গে সামান্য প্রতিক্রিয়া। বন্ধ্যা হয়ে যাবে মানুষ। আগামী কয়েক মাসের ভিতর দুনিয়ার বেশির ভাগ লোক সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা হারাবে।'

স্বর্ণার ইচ্ছে হলো ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার উপর। তারপর যা হয় হোক!

জ্বরের ভিতর টলে উঠল কাশেম। প্রথমে ভাবল ভুল শুনেছে। পরক্ষণে বুঝল, সব নিজ কানে শুনেছে। ডাইভ দিতে চাইল ও সার্বের উপর। কিন্তু পাশ থেকে লোকটার সাগরেদ মাথার উপর নামিয়ে আনল পিস্তলের বাঁট। ধড়াস করে পড়ল কাশেম, জ্ঞান হারিয়েছে।

দু'হাতে স্বর্ণার দুই কাঁধ ধরল ব্রাঙ্কো, মেয়েটির মুখ থেকে তিন ইঞ্চি দূরে থামল দয়ামায়াহীন দুই চোখ। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমরা শীঘ্রি ভাইরাস ছাড়ব। চাইলে প্রথম শিকার হতে পারো।'

জবাবে লোকটার মুখে থুতু দিল স্বর্ণা।

সার্চ করতে গিয়ে হঠাৎ কাজ বন্ধ করল ইয়োস দ্বীপের গার্ডরা, চোখ তুলে চাইল আকাশের দিকে। প্রথমে মনে হলো খুব উজ্জ্বল একটা নক্ষত্র দ্রুত বড় হয়ে উঠছে। কয়েক সেকেণ্ড পর মনে হলো পুরো আকাশ জুড়ে ওটা। প্রথমে অস্বস্তির ভিতর ছিল তারা, তবে দ্রুত সেটা পরিণত হলো তীব্র আতঙ্কে। মহাশূন্য থেকে নেমে আসছে কী ওটা? হঠাৎ এই দ্বীপের দিকে কেন? লোকগুলো দৌড়াতে শুরু করল আড়াল পাওয়ার আশায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয় সতর্ক-ঘণ্টি বাজাচ্ছে। কিন্তু পালাবে কোথায়?

ট্র্যান্সমিটিং রুমে টেবিলের খাটো একটা পায়া ঠকর-ঠকর আওয়াজ করছে, অধৈর্য লাগছে ডিয়েটস কেসলারের। ডিসপ্লেতে দেখছে খুব বেশি ধীরে সিগনাল দিতে শুরু করেছে ইএলএফ। পুরো পৃথিবী ঘুরে নির্ভুল তথ্য পৌঁছে দেবে গন্তব্যে। তবে আর মাত্র কয়েক মিনিট, তারপর শুরু হয়ে যাবে কাজ। ভ্যাকিউম-সিল্‌ড কন্টেইনার থেকে ভাইরাস মিশবে ওয়াশিং মেশিনের পানিতে। তারপর সেই পানি সংক্রামিত করবে চাদর, তোয়ালে ও ন্যাপকিনকে। প্রতি লণ্ড্রির সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণের ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে। যতক্ষণ না শেষ হয় কন্টেইনারের ভাইরাস।

মৃদু হাসি ফুটল ডিয়েটস কেসলারের ঠোঁটে।

ইয়োস দ্বীপের প্রায় মাঝখানে আঘাত হানল টাংস্টেনের প্রজেক্টাইল, আণ্ডারগ্রাউণ্ড ফ্যাসিলিটি থেকে ঠিক তিন মাইল দূরে। ওটার প্রচণ্ড গতি ও ওজনের কারণে সৃষ্টি হলো ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণের।

মুহূর্তে উধাও হলো দ্বীপের মাঝখানটা। গুঁড়ো হয়ে বাতাসে মিশে গেল প্রকাণ্ড সব পাথরখণ্ড। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে বিশাল এক ছাতার মত ছিটিয়ে গেল চারপাশে। তৈরি হলো ভয়াবহ শকওয়েভ। দ্বীপের আকাশে উঠে গেল কয়েক শ' হাজার টন পাথর। বিশাল সব খণ্ড গলে গেল জেলির মত, লাল হয়ে জ্বলতে লাগল লাভার মত। তারপর হিসহিস আওয়াজে নেমে এল সব শীতল সাগরের বুকে।

মুহূর্তে ছাই হলো আতঙ্কিত গার্ডরা, মিশে গেল ধূলির সঙ্গে।

এরপর শকওয়েভ আঘাত হানল ফ্যাসিলিটির উপর। কঠিন ফেরোকংক্রিট গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল, যেন পোর্সেলিন। ধসে পড়ল না দালান, বরং গোটা দালানটাকে টেনে তোলা হলো

মাটির গভীর থেকে। ছুঁড়ে দেয়া হলো উপরে। দেয়াল, ছাত ও মেঝেগুলো রুটির মত চ্যাপটা হলো, সেসবের সঙ্গে মিশে গেল মানুষগুলো। পুরো ফ্যাসিলিটি ধ্বংস হলো মুহূর্তে। মাইলের পর মাইল জোড়া ইএলএফ অ্যান্টেনার মোটা তামার তার উপড়ে এসে প্রচণ্ড তাপে গলে নেমে গেল সাগরে।

থরথর করে কাঁপতে লাগল মাটি, টিলাগুলো একের পর এক ধসে পড়তে লাগল সাগরে। দ্বীপের এপিসেন্টারে অসংখ্য ফাটল তৈরি হলো, শকওয়েভ থেমে যাবার পর রইল একটার বদলে সাতটা অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ।

ইয়োস দ্বীপে অর্বিটাল ব্যালিস্টিক প্রজেক্টাইল আঘাত হানার ফলে সাগরে তৈরি হলো বিশাল এক ঢেউ। তবে ওটা সুনামি নয়, ছুটছে সামনের পথ ধরে, ক্রমে বাড়তে লাগল উচ্চতা। পানির বিশাল প্রাচীর ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটল চারদিকে, মাথার উপর পাক খেতে লাগল ফেনা। ওটা যেন তৈরি হয়েছে পাতাল নরকে, কপাট খুলে দিতেই উঠে এসেছে পৃথিবীতে—সাগরের বুক চিরে প্রচণ্ড গতি তুলে ছুটছে জল-প্রাচীর। খুব বেশিক্ষণ থাকবে না এই ঢেউ, গতি ও উচ্চতা হারিয়ে একসময় মিলিয়ে যাবে সাগরের বুকে। তবে যতক্ষণ ওই আকার নিয়ে বিরাজ করবে, ওটা পৃথিবীর সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

চল্লিশ মাইল দূরে ছুটছে মার্ভেল। ইঞ্জিনগুলো সর্বোচ্চ গতি তুলেছে। প্রতিটি হ্যাচ পরীক্ষা করে আটকে দেয়া হয়েছে। ক্রেডলে তুলে বেঁধে দেয়া হয়েছে সাবমারসিবল দুটো। খুচরো যন্ত্রপাতিসহ ছোটোখাটো সবকিছু রেখে দেয়া হয়েছে ক্লজিট ও ড্রয়ারে। সবাই জানে ওই ঢেউ থেকে সহজে রক্ষা পাবে না ওরা।

অপারেশন্স সেন্টারে অপেক্ষা করছে সিনিয়ররা।

'ঢেউ কখন আসছে?' জানতে চাইল রানা।

'আন্দাজ পাঁচ মিনিট,' হেলমস থেকে বলল গগল।

জাহাজের পিএ সিস্টেম চালু করল রানা। 'মাসুদ রানা বলছি। সবাই শক্ত কিছু ধরে থাকুন। ওই ঢেউ জাহাজটাকে নিয়ে খেলবে। আর বাকি মাত্র পাঁচ মিনিট।'

মাস্তুলের ক্যামেরা পিছন দিক দেখাচ্ছে। চালু করা হয়েছে নাইট ভিশন মোড। ওই ঢেউ কীভাবে আসছে দেখবে ওরা। ওটা আদিগন্ত জুড়ে আসবে। তা ভেদ করে বেরুতে পারবে না কেউ। দমাতে পারবে না। ওটার মাথার উপর মুকুটের মত জ্বলজ্বল করবে ফসফরাস, দেখে মনে হবে সবুজ আগুন।

'ওটার মাথা দেখা যাচ্ছে,' হঠাৎ বলে উঠল রানা।

'হ্যাঁ, আসছে,' থমথমে স্বরে বলল গগল। খেয়াল করেছে একটু বাঁকা পথে চলেছে মার্ভেল, দ্রুত হাতে রাডার নিয়ন্ত্রণ করল সে। সোজা করে নিল জাহাজ। ওই বিশাল ঢেউয়ের প্রাচীর থেকে রক্ষা পেতে হলে নাক বরাবর সামনে থাকতে হবে। যেন সরাসরি স্টার্নের উপর পড়ে ঢেউ। তা যদি না করা যায়, এক পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে শুইয়ে দেবে মার্ভেলকে। তরল প্রাচীর যখন সরবে, ততক্ষণে কয়েক গড়ান দিয়ে তলিয়ে গেছে জাহাজ।

'সাবধান!' বলল রানা। 'চলে এসেছে ওটা!'

সবার মনে হলো উঠেছে এক্সপ্রেস এলিভেটরে। প্রচণ্ড লাফ দিয়ে উঠল স্টার্ন। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হলো জাহাজের নীচে সাগর নেই। ঢেউয়ের বিকট আওয়াজের উপর দিয়ে ভেসে এল মার্ভেলের খোলের করুণ গোঙানি। সাগরের বুকে নাক ডুবিয়ে দিল বো। ইঞ্জিনের পাওয়ার বন্ধ করে দিল গগল, নইলে

আরও দ্রুত ডুববে প্রাউ। পরক্ষণে এক হ্যাঁচকা টানে মার্ভেলকে গ্রাস করল তরল প্রাচীর। জাহাজ এত দ্রুত ছুটতে শুরু করেছে যে সিটে ঝাঁকি খেল সবাই। প্রাচীরের উপর চড়তে লাগল মার্ভেলের স্টার্ন, কিন্তু বো তাক হলো পাতালের দিকে। চট্ করে ওয়াটার স্পিড দেখে নিল গগল। একই কাজ করেছে রানাও। মাত্র চার নট গতিতে নড়ছে মার্ভেল। তবে খোলের তলের গতিবেগ ঘণ্টায় আশি মাইলের বেশি!

দানবীয় ঢেউয়ের ভিতর গেঁথে গেল স্টার্ন, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। ভেসে গেল ডেক। জাহাজের স্কাপারগুলো দিয়ে ছুটতে লাগল ফেনায়িত পানি। ড্রাইভ টিউব দিয়ে ঢুকছে ধবধবে সাদা নিরেট জেট। স্টার্নের শেষ ষাট ফুট ঝুলে রইল ঢেউয়ের পিছনে, তারপর নাক তুলতে শুরু করল বো। প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে তরল প্রাচীর। ওটার পিছনে নেমে যেতে লাগল মার্ভেলের স্টার্ন। কিছুই রইল না জাহাজের নীচে!

ইঞ্জিনগুলোর সমগ্র শক্তি কাজে লাগাতে চাইল গগল, নীচে পেতে চাইল সাগরকে। তারপর পানির ভিতর ছুরির মত নেমে এল মার্ভেলের স্টার্ন। ইঞ্জিন চালু না থাকলে চারপাশের সাগর চেপে ধরবে জাহাজটাকে। মুহূর্তে ডুববে বো, সাগরতল লক্ষ করে রওনা হবে মার্ভেল।

ষাট ডিগ্রি কোণ তৈরি করে পিছনে হেলে গেল জাহাজ, বিক্ষুব্ধ সাগরে ঝপাস করে নেমে এল ফ্যানটেইল, সামনে থেকে টান দিল তরল প্রাচীর। তারপর কেটে যেতে লাগল সমস্ত প্রভাব। তবে পিছন কার্গো হ্যাচের উপর চেপে বসল সাগর। হ্যাচের উপর পুরু রাবার সিল না থাকলে ভেসে যেত হেলিকপ্টার হ্যাঙার।

'বাহ্, লক্ষ্মী মেয়ে!' আদুরে স্বরে বলছে গগল। 'সামনে শান্ত

পানি। আমি জানি তুই পারবি!'

ধীরে সোজা হতে শুরু করেছে মার্ভেল, তারপর দানবীয় ঢেউ থেকে বেরিয়ে এল বো। হঠাৎ জাহাজের স্টার্ন ডুবে যাওয়া থেমে গেল। স্টার্ন ও বো সোজা হচ্ছে, তবে ডুবছে না, আবার ভেসেও উঠছে না। যেন খোড়লের ভিতর পড়েছে মার্ভেল। চারপাশ থেকে প্রচণ্ড চাপ তৈরি করছে প্রকাণ্ড ঢেউগুলো। মার্ভেলের লোহার খোল গোঙাচ্ছে অবিরাম। ইঞ্জিনগুলো এগারো হাজার টন নিয়ে ভাসতে চাইছে।

মনিটরের দিকে চেয়ে রইল সবাই।

কিছুক্ষণ পর বলে উঠল রানা, 'ভেসে উঠছি!'

ডেক থেকে সরতে শুরু করেছে পানি। জেগে উঠল স্টার্নের হ্যাচ। সাগর-সমাধি থেকে জাহাজটাকে তুলতে চাইছে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন! তারপর দেখা গেল জ্যাক স্টাফ থেকে ল্যাগ-ব্যাগ করছে ভেজা তাইওয়ানি পতাকা। হৈ-হৈ করে উঠল জুনিয়ার ক্রুরা। ইঞ্জিনের পাওয়ার কেটে দিল গগল।

'এ সম্ভব শুধু আমাদের গগলের পক্ষে!' সবার আগে বলে উঠল অনিল।

'আমার চেয়ে ঢের বড় ওস্তাদ এখানে আছে,' বলল গগল। আঙুল তাক করল রানার দিকে। 'ওই লোক।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি কখনও মার্ভেলকে নিয়ে কসরৎ করিনি, তুমি ওকে বুঝেছ, কাজেই আজ তুমি না চালিয়ে নিলে তলিয়ে যেত এ জাহাজ।'

দুই পুরুষ পরস্পরের প্রশংসা করছে, এমনি এমনি নয়। সবাই বুঝতে পারছে, এরা যে যার কাজে সেরা।

'এবার আমরা কী করব?' দশ সেকেণ্ড পর জানতে চাইল

উর্বশী।

'স্বর্ণা আর কাশেমকে খুঁজতে হবে,' বলল রানা। 'তবে তুমি থাকবে ফারার মেডিকেলে।'

বিশ

পার্ল অভ মুন।

ডিয়েটস কেসলারকে রেডিওতে না পেয়ে সতর্ক হয়ে উঠল ব্রাঙ্কো। নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ঘটেছে! মানুষটা কোনও সাড়া দেবে না কেন! এমন কী, একবার ফোন পর্যন্ত করেনি।

রেডিও রুমে বেতারের সুইচ বন্ধ করে দিতে বলেছে ব্রাঙ্কো। তবে বিশ মিনিট পর জাহাজে এল স্যাটালাইট-নিউজ ব্রডকাস্ট। দক্ষিণ ইউরোপে উল্কাপিণ্ড দেখা গেছে। ওটার ওজন হতে পারে এক টনের বেশি। তুরস্কের তীরের কাছে আঘাত হেনেছে ওটা। ফলে তৈরি হয়েছে বিশাল এক সুনামি। একটা গ্রিক ফেরি থেকে সে ঢেউ দেখা যায়। তবে তখন মাত্র কয়েক ফুট উঁচু ছিল। কাজেই বড় কোনও বিপদের আশঙ্কা ছিল না।

ওটা উল্কাপিণ্ড নয়, অন্তরের গভীরে টের পেল ব্রাঙ্কো। জিনিসটা ছিল কোনও পারমাণবিক বোমা। ওর দুই বন্দি মিথ্যা বলেনি। এরা যে দলের লোক তারা সবই বুঝতে পেরেছে। এবং যে ভাবে হোক যোগাড় করেছে নিউক্লিয়ার বোমা। মানুষজন ইউরোপের দক্ষিণে যে আলো দেখেছে, তা এসেছে কোনও ক্রুজ

মিসাইল থেকে। ওটার ওঅরহেড আঘাত হেনেছে ইয়োস দ্বীপে।

টেলিভিশনের মিউট বাটন টিপল ব্রাঙ্কো। স্ক্রিনের মেয়েটি এবার বকতে থাকুক। এসব জানবার প্রয়োজন নেই ব্রাঙ্কোর। এখন পরিস্থিতি বুঝে কাজে নামতে হবে। ওই দল থেকে দু'জন অপারেটিভ উঠেছে পার্ল অভ মুন জাহাজে। এ থেকে বোঝা যায় তারা জানে সে নিজেও এই জাহাজে উঠেছে। না, বোধহয় যুক্তি সঠিক হলো না। ও নিজে এসেছে কারণ, আন্দাজ করে নিয়েছে ওদের লোক জাহাজে থাকবে। তার মানে ওরা জানে না সে এখানে। সেক্ষেত্রে প্রথম কাজ হওয়া উচিত, ওই দুই বন্দিকে খুন করা। তারপর প্রথম সুযোগেই জাহাজ থেকে নেমে যাওয়া।

পরের বন্দর ক্রিটানের রাজধানী ইরাকলিয়ন।'

'তৈরি থাকবে ওরা,' বিড়বিড় করে বলল ব্রাঙ্কো।

যে দল এই দু'জনকে পাঠিয়েছে—এরা সম্ভবত সিআইএ, তাতেই বা কী যায় আসে—তাদের লোক থাকবে বন্দরে, দেখা করতে চাইবে এদের সঙ্গে। এখন প্রথম কথা: ও নিজে তাদের জাল কেটে বেরিয়ে যেতে পারবে? ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে? তার চেয়ে ঢের ভাল হয় জাহাজ থামিয়ে একটা লাইফবোট নিয়ে সরে পড়া। ইজিয়ানে হাজার খানেক দ্বীপ আছে। একটায় লুকিয়ে থাকতে পারবে। পরে ভাববে কী করা যায়।

তবুও একটা কথা রয়ে যায়। ওই দুই বন্দির কী হবে? খুন করবে, না জিম্মি হিসাবে নেবে? ঝামেলা তৈরি করবে ওই লোকটা। মেয়েটাও কম নয়। এদেরকে বিপজ্জনক মনে হয়েছে ওর। ভাল হয় খুন করলে, পরে ঝামেলা করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে একা উধাও হবে সে।

আরেকটা বিষয় রয়ে গেল। ভাইরাসের কী হবে?

ক্যানিস্টারের ভিতর মাত্র কয়েক সপ্তাহ টিকবে ওই জিনিস।

তার মানে ওগুলো নিয়ে বেরিয়ে গিয়েও সুবিধা হবে না। এখন যদি ছড়িয়ে দেয়া যায়, হাজার খানেক মানুষকে ইনফেক্ট করবে। তারা বাড়ি ফিরে আক্রান্ত করবে আরও বহু মানুষকে। কিন্তু... না, তা হবে না, জাহাজ বন্দরে ভিড়তেই কোয়ারাণ্টাইন করা হবে যাত্রীদের। কয়েক সপ্তাহ পর তারা আর ছড়াতে পারবে না রোগ।

তবে কিছু না পাওয়ার চেয়ে তো ভাল?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ব্রাঙ্কো, চলে এল ব্রিজে। পুরোপুরি রাত নেমেছে। ঘরের ভিতর কন্সোল ও রাডার রিপিটারগুলোর সামান্য আলো। ওয়াচে রয়েছে দুই অফিসার ও দুই হেলমস-ম্যান। ব্রাঙ্কোর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বিয়ারম্যান দাঁড়িয়েছে ফ্লাইং ব্রিজে, আরাম করে ফুঁকে চলেছে একটার পর একটা সিগারেট।

'এ জাহাজের সবার নাক দিয়ে সর্দি ঝরছে, স্যর,' বলল বিয়ারম্যান। 'তার মানে এক নম্বর ভাইরাস ছড়িয়ে সবাইকে প্রিপেয়ার করে রেখে তারপর মারা পড়েছে চাক গুণ্ডারসন। এবার আমরা দুই নম্বরটা ছড়িয়ে দিলেই তো এই নরক থেকে নিশ্চিন্তে কেটে পড়তে পারি।'

'ঠিক বলেছ। তুমি লণ্ড্রি রুমে যাও,' তাকে নির্দেশ দিল ব্রাঙ্কো। 'ম্যানুয়ালি ছড়িয়ে দাও ভাইরাস।'

'ট্র্যান্সমিটারে কোনও সমস্যা?'

'তোমাকে জানানোর মত তেমন কিছু না। সোজা লণ্ড্রি রুমে যাও, যা বলছি করো। তারপর লিয়ার্ডকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসবে এখানে। আমরা জাহাজ থেকে নেমে যাব।'

'সমস্যাটা কী?'

বিরক্ত হলো ব্রাঙ্কো। 'শুধু জেনে রাখো, আমরা ক্রিটে পৌঁছলে আমাদের গ্রেফতার করা হবে। তাই লাইফবোট নিয়ে

আমরা আগেই নেমে পড়ব সাগরে।'

অফিসারদের একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। 'আরেহ্, ওটা কোত্থেকে এল! লোকটা পাগল নাকি, কী করে! ক্যাপ্টেনকে এখানে আসতে বলো। কলিশন অ্যালার্ম বাজিয়ে দাও!' উল্টো দিকের ফ্লাইং ব্রিজের দিকে পা বাড়াল সে।

'আমার পাশে থাকো,' বিয়ারম্যানকে নতুন নির্দেশ দিল ব্রাঙ্কো। অফিসারের পিছনে ছুটতে শুরু করেছে। সরাসরি পার্ল অভ মুনের দিকে আসছে বিশাল এক ফ্রেইটার। মনে হলো ওটা ভুতুড়ে কোনও জাহাজ। বাতি জ্বলছে না একটাও। ঘণ্টায় বিশ নট গতি তুলে তেড়ে আসছে গোঁয়ারের মত।

ব্রিজের সবার উদ্দেশে ধমকে উঠল অফিসার, 'তোমরা এখানে বসে বসে কী করছ? রেইডারে দেখোনি ওটাকে?'

'শেষবার যখন দেখেছি, ওটা দশ মাইল দূরে ছিল,' বলল জুনিয়ার অফিসার। 'কসম খেয়ে বলতে পারি, সেটা মাত্র কয়েক মিনিট আগের কথা।'

'অ্যালার্ম বাজিয়ে দাও।'

পার্ল অভ মুনের কান ফাটানো হর্ন কোনও কাজে এল না। সরাসরি ক্রুজ শিপের দিকে এগিয়ে আসছে ফ্রেইটার। মনে হলো ক্রুজ শিপকে মাঝখান থেকে কেটে দু'ভাগ করতে চাইছে। যখন মনে হলো সংঘর্ষ এড়ানো গেল না, ঠিক তখন বাঁক নিতে শুরু করল ফ্রেইটার। আগে কখনও এ ধরনের জাহাজ পরিচালনা দেখেনি পার্ল অভ মুনের অফিসাররা। ঠিক পাশে চলে এল ফ্রেইটার। মাত্র বারো ফুট দূরে রইল দুই জাহাজ। এত রেগে না গেলে হৈ-হৈ করে প্রশংসা করত দুই অফিসার।

খবরের কাগজের একটা রিপোর্টের কথা মনে পড়ল ব্রাঙ্কোর। বিশাল এক জাহাজ বে-আইনী ভাবে কোরিন্থ ক্যানেলে

ঢুকে আরেক মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সেইরাতে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অমল দাশাকে। সব সময় ব্রাঙ্কোর মনে হয়েছে, ওই দুই দুর্ঘটনার ভিতর সম্পর্ক থাকতে পারে। আর আজ এই কাল-রাতে আবার হাজির হয়েছে বিশাল এক ফ্রেইটার। নিজেকে কোণঠাসা ইঁদুরের মত লাগল ব্রাঙ্কোর। পরিষ্কার বুঝছে, ওকে ধরতে এসেছে ওরা!

আবার ব্রিজে ঢুকল ব্রাঙ্কো, সরে গেল ক্রুদের কাছ থেকে। চারপাশে এত লোহা-লক্কর, ভাল কাজ করবে না ওয়াকি-টকি। লিয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল। এবার পাওয়া গেল তাকে। একইসঙ্গে কপ্টারে করে এসেছে তারা তিনজন।

'লিয়ার্ড, ব্রাঙ্কো বলছি। একটা কথা মন দিয়ে শোনো, ইঞ্জিন রুম থেকে সবাইকে সরিয়ে দেবে তুমি। নিজে দরজা বন্ধ করে থাকবে ওখানে। কেউ যেন ভিতরে ঢুকতে না পারে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

বিয়ারম্যানের মত বাড়তি প্রশ্ন তুলল না লিয়ার্ড। 'ঠিক আছে, বস্, ইঞ্জিন রুম থেকে সবাইকে বের করে দিয়ে দরজা আটকে বসে থাকব। এই তো?'

'হ্যাঁ।' উইণ্ডব্রেকারের তলা থেকে পিস্তল বের করল ব্রাঙ্কো। 'বিয়ারম্যান, বেরিয়ে যাও, সঙ্গে নিয়ে আসবে সাত-আটটা মেয়ে। তারা ক্রু না যাত্রী, সে নিয়ে ভাববে না। জলদি যোগাড় করে আনো। আর হ্যাঁ, আমার কেবিন থেকে বাড়তি অস্ত্রগুলোও নিয়ে আসবে।' আবারও প্রশ্ন তুলবে বিয়ারম্যান, কাজেই ব্যাখ্যা দিল ব্রাঙ্কো, 'ডিয়েটস কেসলার মারা গেছে। আমাদের পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। এসবই করেছে ওই ফ্রেইটারের লোকগুলো। এবার দৌড় দাও! জলদি!'

'ইয়েস, স্যর!'

বিয়ারম্যান বেরিয়ে যেতেই পিস্তলের মুখে সাইলেন্সার লাগিয়ে নিল ব্রাঙ্কো, ব্রিজের কাউকে সুযোগ না দিয়ে গুলি শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ল দুই ক্রু ও এক অফিসার। জাহাজের হর্নের নীচে চাপা পড়ল মৃদু আওয়াজ। ফ্লাইং ব্রিজে দ্বিতীয় অফিসার জানে না কী ঘটেছে। ব্রিজের দরজা বন্ধ করে দিল ব্রাঙ্কো। ঠিক তখন এসে ঢুকল অফিসার, রক্তাক্ত দেহগুলো দেখে বিস্ফারিত হলো চোখদুটো। একবার ব্রাঙ্কোর দিকে চাইল, পরক্ষণে তার ইস্ত্রি করা সাদা ইউনিফর্ম শার্টের বুকে ভেসে উঠল দুটো রক্ত গোলাপ। নিঃশব্দে কী যেন বলতে চাইল সে, নড়তে লাগল চোয়াল। তবে তা দু'সেকেণ্ডের জন্য, ধাক্কা খেল বাল্কহেডে, পিছলে পড়ল লাশ ডেকের উপর।

ওই ফ্রেইটার থেকে ক্রুজ শিপে লাইন ফেলতে পারে, উঠে আসতে পারে কেউ, কাজেই ব্রিজের কন্ট্রোলের সামনে চলে গেল ব্রাঙ্কো। ওখানে রয়েছে ডায়াল, ইঞ্জিনের গতি বাড়ানো বা কমানোর জন্য। পাশে জয়স্টিক, গুটাই রাডার কন্ট্রোল। ব্রিজ থেকে আধুনিক এই বিশাল জাহাজ চালাতে এদুটোর বেশি কিছু লাগে না।

সর্বোচ্চ গতি পেতে থ্রটল ঘুরিয়ে দিল ব্রাঙ্কো, নাড়তে শুরু করল জয়স্টিক। মরচে ধরা ফ্রেইটার থেকে সরিয়ে নিয়ে চলেছে ক্রুজ শিপকে। মাত্র দু'বছর হলো সাগরে নামানো হয়েছে পার্ল অভ মুনকে। আয়েশ করতে তৈরি, প্রচণ্ড গতির জন্য নয়—তবে ব্রাঙ্কো জানে, এ জাহাজ দৌড়ে হারিয়ে দেবে ফ্রেইটারকে।

দ্রুত ছুটতে শুরু করেছে পার্ল অভ মুন, তবে তা কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর পিছু নিল ফ্রেইটার। দেখতে দেখতে কাছে চলে এল। অত্যন্ত বিরক্ত ও হতাশ হলো ব্রাঙ্কো। ওই জাহাজ দেখলে মনে হয় যেকোন মুহূর্তে খসে পড়বে, কিন্তু

দৌড়ে হারাতে চলেছে এই প্রমোদ-তরীকে! ডায়ালের দিকে চাইল ব্রাঙ্কো। চট্ করে পড়ে নিল লেখাগুলো। ডায়ালে আরও মোচড় দিলে মিলবে ইমার্জেন্সি পাওয়ার।

তা-ই করল ব্রাঙ্কো, টের পেল বাড়তে শুরু করেছে গতি। ব্রিজের জানালা দিয়ে চাইল। পিছিয়ে পড়ছে ফ্রেইটার। নাক দিয়ে সন্তুষ্টির আওয়াজ বেরুল তার। দুই জাহাজের মাঝে যথেষ্ট দূরত্ব তৈরি হতে দু'ঘণ্টা লাগবে, তারপর পার্ল অভ মুন থেকে লাইফবোট নিয়ে নেমে পড়বে সে।

কিন্তু ওই ফ্রেইটার যেন খেলতে চাইছে ওকে নিয়ে! কীভাবে যেন আবারও গতি পেয়েছে! পার্ল অভ মুনের তিরিশ ফুট বামে এগিয়ে চলেছে সমান গতিতে! একবার ডায়াল দেখে নিল ব্রাঙ্কো। শান্ত সাগর চিরে ছত্রিশ নট গতিতে চলেছে প্রমোদ-তরী! সাধারণ কোনও ফ্রেইটার এ গতি পেতেই পারে না! অতি সহজে পার্ল অভ মুনের পাশে পাশে ছুটছে!

হতাশা চেপে ধরল ব্রাঙ্কোকে, তবে ক'মুহূর্ত পর রূপান্তরিত হলো তা প্রচণ্ড রাগে। ব্রিজের পাশের করিডোর থেকে ভেসে এল আগ্নেয়াস্ত্রের হুঙ্কার। সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ চিৎকার। হুইলহাউসের দরজার কাছে চলে গেল ব্রাঙ্কো, একহাতে খুলল বল্টু, দড়াম করে খুলে দিল কপাট। অন্য হাতে তৈরি পিস্তল। কার্পেট মোড়া ডেকের উপর দেখল ক্যাপ্টেনকে, বুক ভেসে যাচ্ছে রক্তে। প্যাসেজওয়েতে লুকাতে চাইছে আরও চার অফিসার। এরা বিয়ারম্যানকে ঠেকাতে গিয়ে ব্যর্থ। তাদের পিছনে দেখা গেল ব্রাঙ্কোর স্যাঙাতকে, অস্ত্র তাক করে হুমকি দিয়ে চলেছে। খানিক দূরে সাতটি মেয়ে, থরথর করে কাঁপছে।

'মেয়েগুলোকে ভিতরে আনো,' পিস্তল নেড়ে ধমকে উঠল ব্রাঙ্কো।

জটলা তৈরি করেছে মেয়েগুলো। দু'চারজন ফুঁপিয়ে উঠছে। সবাই পিছন থেকে তাড়া খেয়ে হুড়মুড় করে ব্রিজে এসে ঢুকল।

'বন্ধ করুন পাগলামি,' এক সিনিয়র অফিসার বলে উঠলেন।

জবাবে তার কপালে গুলি করল ব্রাঙ্কো, অন্যদের দিকে না চেয়ে বন্ধ করে দিল ধাতব দরজা। এক মেয়ের কনুই খপ করে ধরল। কৃষ্ণকেশি মেয়েটিকে আগে দেখেছে ডাইনিং রুমে, ওয়েট্রেস। তাকে হেঁচড়ে নিয়ে এল হেলম-এ। সামনের ফ্রেইটার ও নিজের মাঝখানে রাখল মেয়েটিকে। জীবন্ত বর্ম। ওই ফ্রেইটারে স্নাইপার থাকলে হতাশ হবে। এরই ভিতর সে খেয়াল করেছে, আবারও চেপে এসেছে ফ্রেইটার। দুই জাহাজের মাঝে দূরত্ব বড়জোর দশ ফুট।

'মাছের মত আমাকে খেলিয়ে তুলতে চাও?' বিড়বিড় করে বলল ব্রাঙ্কো। থাবা দিয়ে নাড়ল রাডার কণ্ট্রোল। পোর্টের দিকে নিয়ে চলেছে জাহাজটাকে।

তীব্র গতিতে সরতে শুরু করেছে প্রমোদ-তরী। ওটার বো গিয়ে গুঁতো দিল ফ্রেইটারের পাশে। বিকট ধাতব আওয়াজ হলো। লোহার সঙ্গে লোহার ঘর্ষণে ছিঁড়ছে প্লেটিং। স্টারবোর্ডে কাত হয়ে গেল পার্ল অভ মুন। তৈরি ছিল, তবুও ডেকে পিছলে পড়তে গিয়ে সামলে নিল ব্রাঙ্কো। বো'র রেলিং চুরমার, পরস্পরের উপর চেপে বসতে চাইছে দুই জাহাজ। পার্ল অভ মুনের দামি কেবিনগুলোর বারোটা ব্যালকনি ছিঁড়ে পড়ল সাগরে। ক্রু-যাত্রীরা ছিটকে পড়ল এখানে-ওখানে। আহত হলো অনেকে।

পার্ল অভ মুনকে একটু সরিয়ে বাঁক নিতে শুরু করল ব্রাঙ্কো। পাশে রইল ফ্রেইটার, তবে আগের চেয়ে কিছুটা বেশি দূরত্ব

রাখছে। ওটার ক্যাপ্টেন চাইছে না আবার সংঘর্ষ হোক।

হঠাৎ একটা চিন্তা এল ব্রাঙ্কোর, তাতে খুব সহজে এই খেলা শেষ হবে। হেলম থেকে সরে গেল সে, হোলস্টারে পিস্তল রেখে মেঝে থেকে তুলে নিল এক অফিসারের লাশ। ওটাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। নিজের সামনে রাখল মৃতদেহ, এক হাতে ধরেছে লাশের বেল্ট, অন্য হাতে ঘাড়—দূর থেকে দেখলে মনে হবে পিস্তলের মুখে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। কয়েক সেকেণ্ড থামল ব্রাঙ্কো, নিশ্চিত হলো ফ্রেইটার থেকে ওদের দেখা গেছে। এবার দ্রুত পায়ে চলে গেল ফ্লাইং ব্রিজ রেলিঙের পাশে, রেলিং পার করিয়ে দিল লাশটাকে।

নিজে লুকিয়ে পড়ল রেইলের আড়ালে, দেখতে পেল না দশ তলা থেকে সাগরে গিয়ে পড়েছে লাশ। ফ্রেইটারের লোকগুলোর দেখবার কথা। নিশ্চয়ই চাইবে না নীরিহ মানুষ ডুবে মরুক? লাশ উদ্ধার করতে কমপক্ষে একঘণ্টা। হেসে ফেলল ব্রাঙ্কো। ব্যাটারা ধাওয়া রেখে এখন উদ্ধার করবে লাশ!

'ড্যামেজ রিপোর্ট,' দুই জাহাজ সরে যেতেই বলে উঠল রানা।

'ক্রুরা দেখতে গেছে,' জানাল সোহেল।

ওরা যখন ক্রুজ শিপের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করতে পারল না, ঠিক করল লাউডস্পিকারে ক্রুদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। ওদের ধারণা, ডিয়েটস কেসলারের সঙ্গে জড়িত ডায়মণ্ড ক্রুজ লাইন্সের মালিক, তবে সে-লোক নিশ্চয়ই সব অফিসারকে কিনে নেয়নি। একবার যদি তাদের জানানো যায়, ব্রাঙ্কো জাহাজে কী করতে চলেছে, তারাই বাধা দেবে।

রানার ধারণা ছিল শিপ মাস্টার জাহাজ সরিয়ে নেবে, ভাবতে পারেনি ইচ্ছে করে মার্ভেলে গুঁতো দেবে লোকটা।

পৃথিবীতে এমন কোনও ক্যাপ্টেন নেই যে নিজের জাহাজের ক্ষতি করবে, বা ক্রুদের বিপদে ফেলবে।

একমাত্র যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছল রানা। 'পার্ল অভ মুন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জ্যারোন ব্রাঙ্কো।'

মাথা দোলাল সোহেল। 'তা-ই আসলে। এবার কী করতে চাস?'

'আবার পাশে যেতে হবে, ফেলতে হবে গ্র্যাপলিং হুক। আমাদের জানা নেই ব্রাঙ্কোর সঙ্গে ক'জন, তবে আন্দাজ বারো-চোদ্দজন থাকতে পারে। কাবু করতে বেশি সময় লাগবে না।'

'তুই তো দেখি ব্লাডি মর্গান স্টাইলে কথা শুরু করলি,' বলল অনিল।

'ঈ, মেট।'

'ওই লোক যদি আবারও চড়াও হয়, তোমরা থাকবে দুই জাহাজের মাঝে,' বলল গগল। 'ফলাফল?'

'আমরা যাতে না মরি তা দেখবে তুমি,' বলল রানা। 'ফু-চুংকে বলতে হবে আমরা ক'জন কমাণ্ডো নিয়ে ওই জাহাজে উঠব।' ইন্টারকমের বাটন টিপতে গেল রানা।

তার আগেই চেঁচিয়ে উঠল আতাসি, 'কে যেন উইং ব্রিজ থেকে একজনকে ফেলে দিয়েছে!'

'কী বললে?' একই সঙ্গে জানতে চাইল রানা ও সোহেল।

'একলোক, কালো উইণ্ডব্রেকার, এইমাত্র এক অফিসারকে ছুঁড়ে ফেলেছে পানিতে!'

'গগল, ফুল রিভার্স,' বলল রানা। ইন্টারকমে জানাল, 'ম্যান ওভারবোর্ড! আবারও বলছি, ম্যান ওভারবোর্ড! এটা কোনও ড্রিল নয়। বোট গ্যারাজে চলে যাও রেসকিউ টিম। বোট নামানোর জন্য তৈরি থাকো।'

'লোকটার নোংরা কৌশল,' মন্তব্য করল অনিল।

'ওই খেলা আমরাও জানি। অনিল, তুই পার্ল অভ মুনের ব্রিজে গান ক্যামেরা তাক কর। মেইন স্ক্রিনে ছবি দেখতে চাই।'

পাঁচ সেকেণ্ড পর স্ক্রিনে ইমেজ ফুটে উঠল। মার্ভেলের থেকে ক্রুজ শিপ অনেক উঁচু, ফলে মাস্তুলের ক্যামেরা ব্যবহার করতে হচ্ছে। লো-লাইট মোড দিতেই ব্রিজের ভিতর অংশ পরিষ্কার দেখা গেল। পোর্টসাইডের প্রতিটি জানালার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে জিম্মি মেয়েগুলোকে। সতর্ক ব্রাঙ্কো নিশ্চিত, কোনও শার্প-শুটার তাকে লক্ষ্য-ভেদ করবে না। একটা আকৃতি হেলমের সামনে কুঁজো। সম্ভবত জ্যারোন ব্রাঙ্কো। এক মেয়েকে এক হাতে জড়িয়ে রেখেছে।

'কোনও ডামি না,' বলল অনিল। 'নিজের সামনে জিম্মি করে রেখেছে মেয়েটাকে, এই অবস্থায় গুলি করার ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়।'

'রানা, আমি ফু-চুং। গ্যারাজের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। ওরা লঞ্চ করতে পারে। আমি এদিকে তৈরি।'

'বিশ মিনিট পর চলে আয় ডেকে,' বলল রানা।

মার্ভেলের স্পিড দেখে নিল গগল। জানিয়ে দিল, 'একটু অপেক্ষা করতে হবে।' নিরাপদ গতিতে নেমে আসতে মার্ভেলের লাগল দশ সেকেণ্ড। এবার জানাল গগল, 'এবার যাও তোমরা।'

টেফলন-কোটেড র‍্যাম্প দিয়ে দ্রুত সাগরে নেমে গেল রিজিড ইনফ্লেটেবল বোট। দেরি না করে পোর্টের দিকে সরতে শুরু করল। বিক্ষুব্ধ পানির ভিতর দিয়ে ছুটে চলল বোট। আধ মিনিট পর দলের নেতা বলল, 'আমরা সরে গেছি।'

ওদের সঙ্গে রয়েছে থার্মাল ডিটেকশন গিয়ার, সহজেই খুঁজে

নিতে পারবে অফিসারকে। আবার গতি তুলল মার্ভেল।

'গগল, আগের গতির নাইণ্টি পার্সেণ্ট আনো,' বলল রানা। 'লোকটা যদি বাঁক নিতে শুরু করে, বা গতি কমায়, এগিয়ে যেয়ো না।' রানার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি ফেলল সোহেল। 'আগে একটা বোর্ডিং পার্টি দরকার। চাই না লোকটা ভাবুক কাউকে ফেললে কাজ হবে।'

'তুই চলাল কোথায়?' জানতে চাইল সোহেল।

'ওই জাহাজে উঠতে। তুই এখানে থাক।'

প্রায় ছুটতে শুরু করে অপারেশন্স সেণ্টার থেকে বেরিয়ে এল রানা, তিন মিনিট পর পৌঁছে গেল নিজের কেবিনে। দ্রুত হাতে পরে নিল উপযুক্ত পোশাক। তখনই ইণ্টারকমে যোগাযোগ করল আতাসি। সেই অফিসারকে পেয়েছে নাবিকরা। লোকটার বুকে দু'বার গুলি করা হয়েছে। রানার কণ্ঠে কোনও আবেগ রইল না, তবে জানিয়ে দিল রিজিড ইনফ্লেটেবল বোট সাগরে থাকুক। জীবিত কাউকে ফেলতে পারে ব্রাঙ্কো।

রানার মাথার ভিতর গনগন করে জ্বলছে রাগের আগুন। ওরা লাশ উদ্ধার করতে গিয়ে সময় নষ্ট করেছে, তবে সেকারণে কোনও আফসোস নেই। নতুন করে আরেকবার প্রতিজ্ঞা করল রানা, ওই লোক পালাতে পারবে না, দরকার পড়লে দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ধাওয়া করবে ও। নিজের উপর রাগ, উচিত হয়নি ওভাবে ষাঁড়ের মত তেড়ে যাওয়া। নিশ্চয়ই অন্য কোনও উপায় ছিল জ্যারোন ব্রাঙ্কোকে ধরবার। কিন্তু সে পথটা কী? ভাল কোনও পরিকল্পনা থাকা উচিত ছিল ওর।

ইণ্টারকম বেজে উঠল। 'ফারা বলছি, রানা। সোহেলের সঙ্গে কথা হলো।'

'বলো।'

'আপাতত ওসব নিয়ে ভাবা উচিত নয়,' সরাসরি জানিয়ে দিল ফারা।

'কী বলছ?'

'এই মাত্র শুনলাম কী ঘটেছে। বেশ বুঝতে পারছি নিজেকে দোষ দিয়ে চলেছ। ভুল পথে ভাবছ। ইয়োস দ্বীপে যা ঘটেছে তাতে মাথা গরম হয়ে গেছে জ্যারোন ব্রাঙ্কোর। নিজেকে ভাবছে আটকা পড়া ইঁদুর। ভয়ে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। আর সেই ভয় থেকে খুন করেছে অফিসারকে। ওই মানুষটা খুন হওয়ার সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই। তুমি ভুল করোনি, কাজেই নিজেকে দোষ দিয়ো না। ...কী বলেছি বুঝতে পেরেছ?'

'তোমাকে কে বলেছে আমি এসব ভাবছি?'

'সোহেল আর আমি তোমাকে চিনি। তাই ফোন করেছি। এবার রওনা হয়ে যাও। খুন করো ওই পিশাচটাকে। দেখবে ভাল লাগছে মন।'

'ডাক্তারের নির্দেশ?'

'ঠিক তা-ই।'

পনেরো মিনিট পর ডেকে জড় হলো কমাণ্ডোদের একটা দল। তাদের দুটো গ্রুপে ভাগ করল রানা। ফু-চুং থাকল এক অংশের দায়িত্বে। দ্বিতীয় গ্রুপ রানার সঙ্গে থাকবে। ক্রুজ শিপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্রিজে লোক রাখবে ব্রাঙ্কো। আরেক দল থাকবে ইঞ্জিনরুমে। নইলে বহু আগেই ক্রুরা বন্ধ করে দিত ইঞ্জিনগুলো। ফু-চুঙের দলের দায়িত্ব ওখানে। রানা নিজে ব্রিজে মুখোমুখি হবে ব্রাঙ্কোর।

ওদের প্রত্যেকের পরনে কালো আউটফিট, নীচে কেলভার বডি আর্মার। তবে এমন ভাবে তৈরি, অনায়াসে নড়াচড়া করতে পারবে। পায়ে নরম রাবারের সোলওয়ালা বুট। সবার সঙ্গে

একটা করে গ্যাস মাস্ক। নিয়েছে টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড। পার্ল অভ মুনের ভিতর অংশে উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে, কাজেই প্রতি দলে মাত্র একজন করে নিল নাইট ভিশন গিয়ার।

ওই জাহাজে যাত্রী রয়েছে, কাজেই রানা জানিয়ে দিয়েছে অ্যামিউনিশন নেবে যার ভিতর মাত্র অর্ধেক লোড আছে। কোনও বুলেট যেন প্রথমজনের দেহ ভেদ করে দ্বিতীয় কাউকে আঘাত না হানে। এফএনএস বা গ্লক পিস্তলের বদলে রানা নিয়েছে ওয়ালথার। তবে বুলেটগুলোর ভিতর বারুদ কম।

শটগানের মত একটা যন্ত্র দিয়ে ছুঁড়ে দেয়া হবে গ্র্যাপলিং হুক। পিছনে ছুটবে সরু, হালকা তবে অত্যন্ত শক্ত লাইন। ফলে বেয়ে ওঠা কঠিন হবে। কাজেই ওরা পরে নিয়েছে বিশেষ গ্লাভস, সঙ্গে মোনোফিলামেণ্ট আঁকড়ে ধরার মেকানিকাল পিন্সার।

'শুনছ, গগল?' থ্রোট মাইকে বলল রানা।

'হ্যাঁ।'

'গতি তোলো। তবে আগেই বোটের সবাইকে জানিয়ে দাও।'

মাত্র দশ সেকেণ্ড পর অস্বাভাবিক বাড়তে লাগল মার্ভেলের গতি। প্রচণ্ড হাওয়ায় সরু হয়ে গেল রানার চোখ। পার্ল অভ মুন চার মাইল সামনে। কুচকুচে কালো সাগরে জাহাজের সাদা অংশ হীরার মত জ্বলজ্বল করছে। ফসফরেসেন্সের কারণে স্বর্গীয় লাগছে ওটার পিছনে ফেলে যাওয়া দীর্ঘ স্রোত।

ক্রুজ শিপের চেয়ে কমপক্ষে আড়াই গুণ গতি তুলে ছুটছে মার্ভেল। দেখতে না দেখতে চলে গেল প্রমোদ-তরীর কাছে।

'এতক্ষণে উন্মাদ হয়ে গেছে ব্রাঙ্কো,' বলল ফু-চুং। 'আমরা প্রচলিত কানা পয়সার মত, হাতে চট্ করে উঠে আসি। লোকটা

যেদিকে চোখ ফেলছে, দেখছে সেই আমাদের।'

'আরেকজনকে ফেলল,' রেডিওতে বলল আতাসি। 'এবার একটা মেয়ে। জীবিত।'

'বোটের ক্রুদের জানিয়ে দাও। অনিল, গ্যাটলিং গান দিয়ে বুলেট পাঠিয়ে দে উইং ব্রিজের পাশ দিয়ে। লোকটা বুঝবে আবারও ওখানে প্লা ফেললে কয়েক টুকরো হতে হবে।'

স্টারবোর্ড থেকে গুটিয়ে গেল আর্মার্ড প্লেট, নাক বের করল গ্যাটলিং গান। ছয় ব্যারেল নিয়ে ঘুরতে লাগল মোটর। পরক্ষণে জোর যান্ত্রিক গুঞ্জন শুরু হলো। মনে হলো কী যেন ছিঁড়ে পড়ছে। মার্ভেলের পাশ থেকে ছিটকে বেরুল বিশ ফুটি লেলিহান আগুন। আকাশ চিরে ছুটল দুই শ' ইউরেনিয়াম বুলেট। ফ্লাইং ব্রিজের এত কাছ দিয়ে গেল, কয়েকটা বুলেট রেলিঙের গা থেকে রং তুলে নিয়ে গেল। বুলেটগুলো জাহাজের সামনের সাগরে ফোয়ারা তৈরি করে নাক গুঁজল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সরতে লাগল পার্ল অভ মুন।

'ব্যাটা কাঁপছে ভয়ে,' মন্তব্য করল ফু-চুং।

প্রমোদতরী থেকে এক শ' ফুট দূরত্ব রেখে চলেছে গগল। বার কয়েক চেপে এসে হামলা করতে চাইল ব্রাঙ্কো। প্রতিবার বো থ্রাস্টার দিয়ে সরে গেল মার্ভেল।

'গগল, সময় হয়েছে,' জানিয়ে দিল রানা। 'অনিল, গুলি ছুঁড়তে তৈরি থাক্। তবে জাহাজে লাগাতে হবে না।' কমাণ্ডোদের নিয়ে মার্ভেলের রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়েছে রানা ও ফু-চুং। সবাই কাঁধে তুলে নিয়েছে গ্র্যাপলিং-হুক গান। 'সবাই মেইন ডেক লক্ষ্য করে ছুঁড়বে। ...গগল, আমরা তৈরি!'

পার্ল অভ মুনের পাশে যেন চেপে আসতে শুরু করেছে মার্ভেল। পঁচিশ সেকেণ্ড পেরুনোর আগেই মাঝে রইল মাত্র

পঞ্চাশ ফুট সাগর।

'ফায়ার!' বলে উঠল রানা।

আবারও যান্ত্রিক আওয়াজ তুলল গ্যাটলিং গান, একইসঙ্গে গ্র্যাপলিং হুক ছুঁড়ল কমাণ্ডোরা।

মাঝের সাগর পেরুল বারোটা হুক। আবার যখন ওরা লাইন টেনে আনতে চাইল, টের পেল রেলিঙের ওপাশে আটকে গেছে হুকগুলো। ক্রুজ শিপের কাছাকাছি হলো মার্ভেল, দেখতে না দেখতে মাঝে রইল মাত্র দশ ফুট। এবার ওই জাহাজে উঠতে গিয়ে আহত হওয়ার ঝুঁকি কম। পার্ল অভ মুনের ব্রিজের সামনে দিয়ে ছুটতে লাগল গ্যাটলিং গানের ইউরেনিয়াম বুলেট।

'এবার চলো!' শক্ত হাতে লাইন ধরল রানা, লাফিয়ে উঠল রেলিঙে, মুহূর্তে পেরুল মাঝখানের দূরত্ব। পরক্ষণে দুই জাহাজের মাঝে দেখা দিল সরু সাগর। দ্রুত সরে যেতে শুরু করেছে মার্ভেল। সঠিক দূরত্ব ও ঠিক জায়গা বেছে নিয়েছে রানা, একটু উপরে একসারি বড়সড় জানালা—কাঁচে ঠাস করে লাগল ওর সবুট দুই পা। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল কাঁচ। ওপাশে দেখা গেল জনশূন্য ডাইনিং রুম। লাইন বেয়ে উঠবার ঝামেলায় গেল না রানা, ভাঙা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। ওর দলকে আগেই বলা আছে, ওরা কেউ যদি আলাদা হয়ে যায়, অপেক্ষা করতে হবে ব্রিজের কাছে।

কাঁধের স্লিং থেকে এমপি-ফাইভ খুলে নিল রানা, সাবধানে এগুতে শুরু করল। কাঁধে রেখেছে অস্ত্রের বাঁট, মুহূর্তে দেখবে সাইট পিকচার। টেবিলগুলো এড়িয়ে দরজার দিকে চলল।

এইট্রিয়ামের নীচতলায় নেমে এল। জটলা করছে যাত্রীরা। এখনও বুঝে ওঠেনি কেন দুই জাহাজে সংঘর্ষ হলো। এক লোক

শুয়ে সিঁড়ির নীচের ধাপে, আহত। দুই মহিলা তার শুশ্রূষা করছে। এক বয়স্কা মহিলা তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়লেন রানাকে দেখে।

সাব-মেশিনগানের নল উপরের দিকে তাক করল রানা, বোঝাতে চাইল কারও ক্ষতি হবে না। 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, এই জাহাজ হাইজ্যাক করা হয়েছে। আমি ইউনাইটেড নেশনস-এর হোস্টেজ-রেসকিউ টিমের লোক। দেরি না করে যে যার কেবিনে ফিরে যান। যাওয়ার পথে অন্যদের বলবেন কেবিনে ফিরতে। শীঘ্রি এই জাহাজ মুক্ত করব আমরা।'

কর্তৃত্ব-পরায়ণ এক বয়স্ক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। 'আমি জর্জ হ্যারিসন, এ জাহাজের সেকেণ্ড অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার। আমি কিছু করতে পারি?'

'বলুন দ্রুত কীভাবে যাওয়া যায় ব্রিজে। যাত্রীদের বলুন নিজেদের কেবিনে ফিরুক।'

'পরিস্থিতি কতটা খারাপ?'

'কখনও ভাল হাইজ্যাকিঙের কথা শুনেছেন?'

'না। বোকার মত বলেছি। দুঃখিত।' ভদ্রলোক বাড়তি কথা বাদ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কীভাবে ব্রিজে যেতে হবে। তবে অফ লিমিট এলাকার জন্য লাগবে ম্যাগনেটিক পাস। ওটা রানাকে দিলেন তিনি।

রওনা হয়ে গেল রানা। পাঁচ মিনিট পর পৌঁছে গেল একটা *নো অ্যাডমিটান্স* লেখা দরজার সামনে। পাশের রিডারে ম্যাগনেটিক পাস দিতেই খুলে গেল দরজা। প্রকাণ্ড ঘরে ঢুকে টবে লাগানো একটা বড়সড় ফার্ন গাছের পাশে আড়াল নিল রানা, যোগাযোগ করল দলের সঙ্গে। জানা গেল, তারা কাছেই

আছে, সাত মিনিটে পৌঁছে যাবে এখানে।

ওরা ব্রিজে আসুক, ভেবে রওনা হয়ে গেল রানা। একটা করিডোর ধরে এগুলো। দু'পাশে একের পর এক কেবিন। করিডোর শেষে পেল সিঁড়ি, তিন মিনিটে উঠে এল ব্রিজে যাওয়ার হলওয়েতে। লেযার সাইট চালু করল, ধীর পায়ে এগুলো ব্রিজের দরজার দিকে। তবে থমকে যেতে হলো। খানিক সামনে এক কেবিন থেকে আসছে চাপা কণ্ঠ।

'ক্যাপ্টেন?' নিচু স্বরে ডাকল রানা।

কণ্ঠগুলো থেমে গেল। দরজা দিয়ে উঁকি দিল একজন। বিকট হাঁ করল মেয়েটি রানার চোখের লেজার পিস আর সাব-মেশিন গান দেখে।

'কোনও ভয় নেই,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আমি ওদের ঠেকাতে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে ক্যাপ্টেন আছেন?'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল মেয়েটি, পরনে ইউনিফর্ম। স্ট্রিপ দেখে বোঝা গেল সে পার্ল অভ মুনের ফার্স্ট অফিসার। ববকাট চুল, বাদামি চোখে ভয়। বয়স হবে ত্রিশ। 'না নেই, ওই কসাইগুলো ক্যাপ্টেন আর থার্ড পার্সারকে খুন করেছে। আমি ফার্স্ট অফিসার, লোলা প্যাপেস।'

কেবিনের দিকে ইশারা করল রানা। 'ওখানে চলুন, কথা আছে।'

মেয়েটির পিছু নিয়ে কেবিনে ঢুকল। চোখ পড়ল কটের পাশে। বড়সড় দুটো বস্তার মত। রক্তাক্ত চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে দুটো লাশ। কেবিনের আরেক পাশে দাঁড়িয়েছে তিনজন অফিসার।

পরিচয় করিয়ে দিতে চাইল লোলা, তবে বাধা দিল রানা। 'পরে আলাপ হবে। এখন বলুন ব্রিজে কী ঘটেছে।'

'ওখানে ঢুকেছে তাদের দু'জন,' বলল লোলা। 'একজনের নাম জ্যারোন ব্রাঙ্কো। অন্যজনের নাম জানি না। এদের সঙ্গের আরেক লোক গিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে ইঞ্জিনরুম।'

'আপনি শিয়োর যে ইঞ্জিন-রুমের ভিতর শুধু একজন?' মেয়েটি মাথা দোলাতে রেডিও করে তথ্যটা ফু-চুংকে জানিয়ে দিল রানা। 'কাজে নেমে পড়ু।'

'আমরা ইস্তাম্বুল ছাড়ার পর কপ্টারে করে এসেছে। হেডকোয়ার্টার থেকে হুকুম এসেছে, জ্যারোন ব্রাঙ্কোর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। আমাদের বলেছে দু'জন ক্রিমিনাল উঠেছে এ জাহাজে। তারা এক যাত্রীকে খুন করেছে।'

'ওই দু'জন আমাদেরই টিমের,' বলল রানা। 'কাউকে খুন করেনি। বলতে পারেন ওরা এখন কোথায়?'

এ পরিস্থিতিতে কোনও প্রশ্ন তুলল না ফার্স্ট অফিসার। 'তাদের ধরে ফেলে এরা। ক্যাপ্টেনের ডে অফিসে আটকে রাখে। জায়গাটা ব্রিজের পিছনে।'

'ঠিক আছে। জরুরি আর কিছু?'

'যখন ব্রিজ দখল করে নিল এরা, ব্রিজে ছিল দু'জন সি-মেন আর দু'জন অফিসার। বোধহয় মেরে ফেলেছে ওদের। মহিলা যাত্রীদের আটকে রেখেছে। আপনি কে? কোথা থেকে এলেন?'

'এটা ইউনাইটেড নেশনসের মিশন। আমরা এই টেরোরিস্ট সেলের পিছু নিয়েছি বেশ কিছুদিন হলো। ধরা পড়ত, কিন্তু এ জাহাজে উঠে পড়ে জ্যারোন ব্রাঙ্কো। কাজেই দ্রুত কাজে নামতে হয়েছে। আপনাদের আগে জানানো সম্ভব ছিল না। যা ঘটেছে সেজন্য আমরা দুঃখিত। ঠিক করা হয় আগেই ব্রাঙ্কোকে বন্দি করা হবে, কিন্তু ইউএনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তা সম্ভব হয়নি।'

হঠাৎ হাজির হলো রানার দলের কমাণ্ডোরা, লেযার সাইট দিয়ে দেখে নিল কেবিনের ভিতর।

'ঠিক আছে, আমি এখানে,' ভিতর থেকে বলল রানা। সাব-মেশিনগান নিচু করল কমাণ্ডোরা।

লোলা প্যাপেসকে ব্রিজের ডায়াগ্রাম এঁকে দিতে অনুরোধ করল রানা। সেই অবসরে সব খুলে বলল নিজের দলকে। কথা শেষে রেডিওতে বলল, 'সোহেল, পরিস্থিতি জানা।'

'মেয়েটাকে পানি থেকে তোলা হয়েছে। হিস্টেরিকাল হয়ে গেছে। ব্রাঙ্কো এখনও হেলম-এ। তিন জিম্মিকে দিয়ে নিজেকে ঘিরে রেখেছে। তার আরেক লোককে দেখেছি। তবে আপাতত তাকে দেখা যাচ্ছে না। অন্য তিন মেয়েকে আটকে রাখা হয়েছে জানালাগুলোর সামনে।'

'এ জাহাজের সামনে চলে যেতে বল গগলকে। ব্রিজের সবকিছু পরিষ্কার দেখতে হবে। স্বর্ণা আর কাশেম বন্দি হয়েছে ব্রিজের পিছনের এক অফিসে। ওদের দেখতে পাস কি না দ্যাখ্।'

'বেশ।'

যোগাযোগ করল ফু-চুং। ওরা পজিশনে পৌঁছে গেছে। এবার উড়িয়ে দেবে ইঞ্জিন-রুমের দরজা। তবে অপেক্ষা করতে বলল রানা, ওরা দুই দল একইসঙ্গে আক্রমণ হানবে।

আবার রেডিও করল সোহেল। 'ব্রিজের পিছনে একটা দরজা দেখেছি। আপাতত বন্ধ। মেইন ব্রিজ উইণ্ডোর সামনে তিন মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ব্রাঙ্কো। তার চ্যালা গেছে স্টারবোর্ডের ছোট এক করিডোরে। বোধহয় মেইন এন্ট্রান্স।'

ফার্স্ট অফিসারের আঁকা শেষ, বাড়িয়ে দিল কাগজটা। ওটা নিয়ে ব্রিজে কে কোথায় রয়েছে চিহ্ন দিয়ে নিল রানা। ওর

দলকে বুঝিয়ে দিল পরিস্থিতি কেমন হতে পারে।

নাইন/ইলেভেনের পর বহু বিমানের ককপিটে ও ক্রুজ শিপের ব্রিজের দরজা রিএনফোসর্ড করা হয়েছে। নিজ হাতে পার্ল অভ মুনের ব্রিজের দরজায় প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বসাল রানা। কাজ শেষে সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়ল কেবিনের ভিতর। রেডিওতে ফু-চুং ও সোহেলকে জানিয়ে দিল, আর তিরিশ সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হবে দরজা।

নিজের ঘড়ির দিকে চেয়ে রইল রানা, পাঁচ সেকেণ্ড বাকি থাকতে ডান হাত উপরে তুলে একটা একটা করে আঙুল বন্ধ করতে লাগল। শেষ আঙুল বন্ধ হয়ে যেতেই চাপ দিল রিমোটের সুইচে।

বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণ হলো। সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলি ঢেকে দিল হলওয়ে। শকওয়েভ সরে যেতেই এক সেকেণ্ডের ভিতর কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা, পাক খাওয়া ধোঁয়ার ভিতর পথ দেখাল রক্তিম লেযার রশ্মি।

রানা ব্রিজে ঢুকবার পরক্ষণে দরজা পেরিয়ে ঢুকল দলের সবাই। একবারও কেউ চাইল না মেঝের উপর পড়ে আছে ছিন্নভিন্ন বিয়ারম্যানের অবশিষ্ট।

'সবাই শুয়ে পড়ো! জলদি!' ধমকে উঠল রানা। ওর দলের সবাই অস্ত্রের নল তাক করতে শুরু করেছে হেলমসের দিকে।

তবে রানা ভাবতেও পারেনি এত দ্রুত নড়ে উঠবে জ্যারোন ব্রাঙ্কো। লেজার সাইট দিয়ে তাকে তাক করতে গিয়ে থমকে যেতে হলো। পাশের মেয়েটাকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়েছে লোকটা, পিস্তল ঠেসে ধরেছে কানের ভিতর।

'এক পা এগোলে খুন হবে এই মেয়েলোক!' গর্জে উঠল জ্যারোন ব্রাঙ্কো।

থমকে গেল রানা। মেয়েটাকে ভাল করেই চেনে। ব্রাঙ্কো যেভাবেই হোক জেনে গেছে স্বর্ণা ওর দলের সদস্য। পিছনের অফিস থেকে ধরে এনেছে বর্ম হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য।

'গুলি করুন, মাসুদ ভাই,' নির্দ্বিধায় বলল স্বর্ণা। 'আমি মরলে বাঁচবে না এই নরকের কীটও।'

'আগে মরবে এই মেয়ে,' রানার উদ্দেশে বলল ব্রাঙ্কো। আরও জোরে ঠেসে ধরল পিস্তলের নল। প্রচণ্ড ব্যথায় ফ্যাকাসে হয়ে গেল স্বর্ণা। 'অস্ত্র ফেলো, নইলে এই মেয়ে শেষ!'

'মরতে হবে তোমাকেও,' বলল রানা।

'ওসব বোঝা আমার শেষ, আমি এখন মরা লাশ, নতুন করে আর কী মরব? তবে এই মেয়েকে বাঁচাতে চাইলে যা বলছি তা-ই করো। ... হাতে আর মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পাবে তুমি!'

'শুট করুন, মাসুদ ভাই!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল স্বর্ণা।

'সম্ভব নয়, স্বর্ণা,' নরম স্বরে বলল রানা। হাত থেকে ফেলে দিল মেশিন পিস্তল। খচ্ করে বুকে লাগল। অসহায় চোখে চেয়ে আছে মেয়েটা। কখনও ভাবতে পারেনি মাসুদ ভাই হেরে যেতে পারে। 'তোমরা সবাই মেঝের উপর অস্ত্র নামিয়ে রাখো।'

একে একে মেঝের উপর পড়ল সাব-মেশিনগানগুলো।

স্বর্ণার কান থেকে পিস্তল সরিয়ে নিল ব্রাঙ্কো, সরাসরি রানার মাথা লক্ষ্য করে তাক করল। 'বহু জ্বালিয়েছ। চালাক লোক, সন্দেহ নেই। কিন্তু আর কোনও চালাকি খাটাবার সুযোগ পাবে না। তোমার জাহাজ বা লোক যদি আমার পিছু না ছাড়ে, আমি তো মরবই, গোলাগুলি শেষ হলে তোমাকেও নিজের জাহাজে ফিরতে হবে লাশ হয়ে। ওদের বারণ করো, নইলে এখন তোমার সামনেই যাত্রীদের হাত বেঁধে একে একে ছুঁড়ে ফেলব সাগরে।'

স্বর্ণাকে ধাক্কা দিয়ে রানার উপর ফেলল ব্রাঙ্কো। দুজন একই সঙ্গে পড়ে গেল মেঝেতে।

পার্ল অভ মুনের এক হাজার গজ সামনে এগিয়ে চলেছে মার্ভেল। স্টার্নে দাঁড়িয়ে রয়েছে জলিল খান। .৫০ ক্যালিবারের বেরেটা স্নাইপার রাইফেলের টেলিস্কোপিক সাইটে দেখছে সবই।

'বিদায়, ইবলিশ!' বিড়বিড় করে বলল জলিল।

মাসুদ ভাইয়ের দিকে মনোযোগ দিয়েছে জ্যারোন ব্রাঙ্কো, জানেও না কখন জানালার সামনে দাঁড়ানো মেয়েগুলো শুয়ে পড়েছে মেঝের উপর, জানালা দিয়ে পরিষ্কার সব দেখতে পাচ্ছে জলিল।

টুংক্ করে একটা আওয়াজ পেল রানা ও তার দলের সবাই। সেফটি গ্লাস ভেদ করে ঢুকেছে বুলেট। থ্যাপ্ করে আওয়াজ হলো। জ্যারোন ব্রাঙ্কোর দুই কাঁধের মাঝখানে ঢুকেছে বুলেট। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে দুই কদম এগোল সে, ঘুরে গেল জানালার দিকে, তারপর দড়াম করে চিত হয়ে পড়ল কার্পেটের উপর। ছোট্ট একটা ফুটো করে পিঠ দিয়ে ঢুকেছে বুলেট, বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে মুঠোসমান গর্ত তৈরি করে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বুক। দু'বার ঝাঁকি খেয়েই স্থির হয়ে গেল লোকটা।

উঠে দাঁড়াল রানা। স্বর্ণাকেও সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল।

'দেখলে বড়দের কথা না শুনলে কী হয়?'

উত্তরে মাথা নিচু করে লাজুক হাসল স্বর্ণা। 'মাসুদ ভাই, দরজা উড়ে যেতেই বুঝেছি আপনি এসে গেছেন। আর যখন দেখলাম সঙ্গে জলিল খান নেই, তখন সন্দেহ হয়েছিল, পিশাচটাকে শেষ করার জন্য অন্য কোনও প্ল্যান আছে

আপনার।'

'কী অবস্থা?' জানতে চাইল সোহেল।

'ধন্যবাদ জলিলকে, কোটি টাকার লক্ষ্যভেদের জন্য। ওকে জানিয়ে দে ওর টার্গেট খতম। ব্রাঙ্কো শেষ। স্বর্ণা আর কাশেম সুস্থ।' ইয়ারবাড খুলে ফেলল রানা, রেডিওতে স্পিকার মোড দিল। সবাই শুনবে এখন। 'মার্ভেলের সঙ্গে কথা বলতে পারো, স্বর্ণা।'

'সবাই ভাল তো?' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল স্বর্ণা।

'তোমরা সঙ্গে না থাকলে আমরা ভাল থাকি কী করে?' খুশি মনে বলল সোহেল। 'তবে বকা পাওনা আছে তোমার লিউ ফু-চুং ভাইয়ের কাছে।'

পিছনের অফিস থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে কাশেমকে। ব্রাঙ্কোর পকেট থেকে চাবি নিয়ে খুলে দেয়া হলো দুই হাত। সদা গম্ভীর কাশেম বক্স এখন আকর্ণ হাসছে।

একুশ

ইয়োস দ্বীপ বিপর্যয়ের পর দু'সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে, তবে এই ক'দিনেই শরীর ভেঙে পড়েছে লিঙ্ক চ্যাপেলের। বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে কসমেটিক সার্জারি করেছে সে, বে-আইনী ভাবে নিজের দেহে প্রতিস্থাপন করেছে অন্যের অঙ্গ; কিন্তু এখন হঠাৎ করেই নড়তে চাইছে না শরীরটা। আসলে

ভেঙে গেছে মন। এত আয়োজনের শেষে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসেও আজ সে ব্যর্থ। আশ্চর্য, নিজেদের মঙ্গল চায় না পৃথিবীর মানুষ!

এ বয়সে এই চরম ব্যর্থতা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে। পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েছে। জীবনটা বৃথাই গেল।

তার মেয়েদের নিয়ে যখন তুরস্কের দিকে রওনা হলো, তারপর থেকেই সব বদলে গেল। চার্টার্ড প্লেনের পাইলটকে জানিয়ে দিল বার্থা, তারা তুরস্কে যাবে না, বদলে তাদের নামিয়ে দিতে হবে জুরিখে। জুরিখে পৌঁছেই কয়েকটা ব্যাঙ্ক থেকে রেসপন্সিভিস্টদের অ্যাকাউন্ট খালি করে বিপুল টাকা তুলে নিয়েছে বার্থা। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ডামি কোম্পানি তৈরি করে সেই টাকা ঢেলেছে স্টক মার্কেটে। বার্থার বুঝতে দেরি হয়নি ইয়োস দ্বীপ ও ডিয়েটস শেষ, তাদের সংগঠনের বড় বড় নেতাদের গ্রেফতার করবে এবার এফবিআই। তার নিজের বাঁচার একমাত্র উপায় পরিচয় পরিবর্তন করে বোনকে নিয়ে লুকিয়ে পড়া।

ওদের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল চ্যাপেল, কিন্তু দুই মেয়ে জানিয়ে দিয়েছে, আগে আমেরিকায় গিয়ে ছেঁড়া সুতোগুলো গিঁঠ দিয়ে এসো। লিয়োনার্দো চার্চ নামে তুমি রেসপন্সিভিস্টদের বিরুদ্ধে অনেক বক্তব্য দিয়েছ, কেউ তোমাকে সন্দেহ করবে না।

সুতরাং লস অ্যাঞ্জেলেসে ফিরেছে চ্যাপেল। একের পর এক সেফ ডিপোজিট বাক্স খালি করেছে। ওগুলোর কথা জানত না এফবিআই। এ মুহূর্তে ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরছে সে। বেভারলি হিলসের বিশাল বাড়িটা পেরিয়ে গেল ট্যাক্সি। বাড়ির সামনের ফেন্সের সঙ্গে আটকে দেয়া হয়েছে এফবিআইয়ের ক্রাইম-সিন টেপ। ল্যাণ্ড ক্রুজার নিয়ে দাঁড়িয়ে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ।

তাদের স্বপ্ন দেখা ও দুনিয়ার মঙ্গল করার সমস্ত পরিকল্পনা আসলেই শেষ।

গ্রিক কর্তৃপক্ষ কোরিন্থের রেসপন্সিভিস্ট কম্পাউণ্ড বন্ধ করে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশের কর্তৃপক্ষের লাথির মুখে বন্ধ হয়ে গেছে সমস্ত রেসপন্সিভিস্ট ক্লিনিক। কোনও টিভি চ্যানেল যদিও প্রকাশ করেনি দুনিয়ার বেশির ভাগ মানুষকে বন্ধ্যা করতে চেয়েছিল তারা, তবে ফলাও করে প্রচার হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগগুলো। পার্লা মোনার মত নামকরা সদস্যরা চ্যাপেলের বিশ্বাসকে পিঠ দেখিয়ে দিয়েছে। টিভিতে কেউ কেউ বলেছে, তাদের ভুল পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, মন্ত্রমুগ্ধ করে তাদের কাছ থেকে কোটি কোটি ডলার খসিয়ে নেয়া হয়েছে।

মাত্র চোদ্দ দিনে শেষ হয়ে গেছে লিঙ্ক চ্যাপেলের সারা জীবনের সমস্ত অর্জন। সাইকিয়াট্রির প্র্যাকটিস বন্ধ করে দিয়েছে সে, খুশি খুশি ভাব করে সবাইকে জানিয়েছে, তার কাজ শেষ, এবার পুরোপুরি বিশ্রাম নেবে। এসব বলতে গিয়ে অন্তর জ্বলেপুড়ে গেছে তার। ব্রোকারকে জানিয়ে দিয়েছে, প্রথম সুযোগেই বিক্রি করে দিতে চায় নিজের বাড়িটা।

বিখ্যাত লিঙ্ক চ্যাপেলের বিশাল নাম চিরতরে মুছে দিয়ে শেষে অবসর নিতে হয়েছে অখ্যাত এক লিয়োনার্দো চার্চ হয়ে।

আজ আবার নিজের বাড়ি ফিরছে সে সবকিছু চুকিয়ে দিয়ে ব্রাজিলে চলে যাওয়ার জন্য। আমেরিকার সঙ্গে ব্রাজিলের সম্পর্কে অনেক ফাঁক-ফোকর আছে, তারই সুযোগ নেবে সে। আমেরিকান কর্তৃপক্ষ ওখানে তার টিকিও ছুঁতে পারবে না। ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল চ্যাপেল, পয়সা মিটিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ডান হাতে হিটলারি ছড়ি। এ দেশে ফিরবার পর

থেকে সর্বক্ষণ থাকছে ওটা সঙ্গে। দরজার সামনে থামল সে, হাতের আর্থরাইটিসের কারণে তালা ব্যবহার করতে কষ্ট হয়, তাই ব্যবহার করে সাধারণ পুশ-বাটন প্যাড। সিকিউয়েন্স অনুযায়ী তালা খুলল সে, ঢুকে পড়ল বাড়িতে। কনুই দিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা। একটা মুভিং কোম্পানি তার প্রিয় জিনিসগুলো বেঁধে রেখেছে। অন্য সব বিক্রি করে দেয়া হবে বাড়ির সঙ্গে।

ফয়ে পেরিয়ে স্টাডির ভিতর ঢুকল চ্যাপেল, ল্যাপটপে দেখে নেবে শেষ খবর। কিন্তু ধপ্ করে পিছনে বন্ধ হলো স্টাডির দরজা। ঘুরে চাইল চ্যাপেল। দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে অচেনা এক যুবক।

স্বাভাবিক অবস্থায় এ লোককে এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলত চ্যাপেল, কিন্তু এখন কিছু না বলে চুপ করে চেয়ে রইল যুবকের দিকে। বুঝতে চাইছে, এ লোক কে এবং কেন তার বাড়িতে ঢুকেছে।

'আপনিই বোধহয় ডক্টর চার্চ?'

'হ্যাঁ। আপনি কে? কী চান এখানে?'

'কিছুদিন আগে আমার এক বান্ধবীকে সাহায্য করেছেন।'

'আমি কাজ থেকে অবসর নিয়েছি। অন্য কাউকে দেখান। আর হ্যাঁ, আমি একটু একা থাকতে চাই। কাজেই প্লিজ...'

'কাজ থেকে অবসর নিয়ে আপনার কেমন লাগছে?' জানতে চাইল আগন্তুক। 'রেসপন্সিভিজম তো মারা গেল। আপনি জিতে গেলেন। নিশ্চয়ই মন বলছে প্রতিশোধ নিতে পেরেছেন?'

জবাব দেয়ার মানসিকতা নেই চ্যাপেলের। মনের ভিতর জেগে উঠল হাজার কষ্ট। বুঝল না কী বলবে বা কী করা উচিত।

'আমি বোধহয় আপনার অনুভূতি বুঝেছি,' বলল যুবক।

'আপনি কাজ থেকে অবসর নিয়ে সন্তুষ্ট নন। মনের ভিতর ভীষণ দ্বিধা। কারণ, আমি এমন একটা কথা জানি, যা শুনলে বিস্মিত হবে বহু মানুষ।'

যেভাবেই হোক, হঠাৎ চ্যাপেলের মন জানিয়ে দিল এ লোক কী বলতে চলেছে। ধপ্ করে কাউচে বসল সে, চেহারা হয়ে গেল ফ্যাকাসে।

'ইয়োস দ্বীপে যদি ব্রাঙ্কোর সামনে বাড়তি বড়াই না করতেন, তবুও আপনার আসল পরিচয় বের করে ফেলতাম আমরা। আপনিই একমাত্র লোক যার পক্ষে রোমে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব ছিল। আমরা ভেবেছিলাম অমল দাশার সঙ্গে রেডিও ট্যাগ আছে, তবে পরে জেনেছি, তা ঠিক নয়। সে জানত না কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ব্রাঙ্কোকে সতর্ক করবার উপায় ছিল না তার।'

সত্য বেরিয়ে এসেছে। সোফায় সোজা হয়ে বসল চ্যাপেল। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমিই ফোন করেছি, রোমে আনিয়েছি ব্রাঙ্কোকে, জানিয়ে দিয়েছি কোন্ হোটেলের কোন্ সুইটে উঠছি। তখন অমল দাশা ঘুমিয়ে ছিল। ...এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন, আপনিই কি হামলা করেছিলেন ইয়োস দ্বীপে?'

মৃদু মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'আমরা সরিয়ে নিয়েছি পার্ল অভ মুনের ভাইরাসও। অন্য ঊনপঞ্চাশটা ক্রুজ শিপের ভাইরাসও। ওই পঞ্চাশটা কণ্টেইনার এখন সযত্নে রাখা আছে এক ল্যাবরেটরিতে।'

'আপনারা কি বুঝতে পারছেন না, ধ্বংস হতে চলেছে পৃথিবী? আমি গোটা মানব জাতিকে রক্ষা করতে চেয়েছি।'

মাথা নাড়ল যুবক। বড় নিষ্ঠুর লাগল তাকে দেখতে। 'আপনার মত বহু লোক শত শত বছর ধরে বলে চলেছে: পৃথিবী

ধ্বংস হতে চলল। গুজব ছড়িয়ে গেল পৃথিবীর সমস্ত খাবার শেষ হবে উনিশ শ' আশিতে। উনিশ শ' নব্বুইয়ে শেষ হওয়ার কথা তেল। দু'হাজার সালে জনসংখ্যা হওয়ার কথা দশ বিলিয়ন। এই প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বইয়ে পড়েছি উনিশ শ' সালে ইউএস পেটেন্ট অফিস বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলঃ ওই পর্যন্ত সময়ে যত যা উদ্ভাবন হয়েছে, তারপর নতুন আর কিছু উদ্ভাবন করা মানুষের সাধ্যের বাইরে—এই কথা বলে। কী ঘটল আসলে? আপনাকে একটা উপদেশ দিই, মিস্টার অতি-বুদ্ধিমান, ভবিষ্যৎ নিয়ে কক্ষনো মন্তব্য করবেন না।'

'আপনি ভুল জানেন। কী ঘটতে চলেছে আমি জানি। অনেক নিচু স্তরের মগজের মানুষও বুঝবে। পঞ্চাশ বছর পেরুনোর আগেই মানব-সভ্যতার ভিতর ছড়িয়ে পড়বে চরম হিংস্রতা। দেশগুলোর কর্তৃপক্ষ বুঝবে এত মানুষকে খেতে দিতে পারবে না তারা। বাইবেলে যেভাবে বলা হয়েছে, ঠিক সেইভাবে ভেঙে পড়বে আইন-শৃঙ্খলা।'

'আপনি বাইবেলের কথা বলায় একটা কথা মনে পড়ল,' বলল রানা। তার কুচকুচে কালো চোখদুটো জ্বলছে। 'আমার খারাপ লাগে না বাইবেলিক ওই শাস্তি। একটা চোখের বদলে আরেকটা চোখ।'

'আপনি আমাকে খুন করতে পারেন না। গ্রেফতার করতে পারেন বড়জোর। বিচারের সামনে দাঁড় করাতে পারেন।'

'তা করতে আসিনি আমি।'

এতক্ষণ ধরে একটু একটু করে হিটলারি ছড়ির নল যুবকের বুকের দিকে তুলতে চেষ্টা করছে চ্যাপেল। আর কয়েক ইঞ্চি, তারপর বাম হাতে টিপে দেবে খুদে বাটন। ভারী ক্যালিবারের বুলেট ফুটো করে দেবে ডেঁপো ছোকরার হৃৎপিণ্ড।

'আমার কথা একটু শুনুন,' বলল চ্যাপেল। 'একটু বুঝতে চেষ্টা করুন...'

কিন্তু চ্যাপেলের চোখের কোণে কী যেন নড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে আরেক যুবক। তার এক হাত নেই, কিন্তু অন্য হাতে উদ্যত পিস্তল।

'হাতের ওই অস্ত্র আর একটু উঁচু করলেই গুলি করব আমি!' বলল দ্বিতীয় যুবক। 'ফেলে দিন ওটা।' ফেলল না চ্যাপেল, তবে অস্ত্রের মুখটা নামালো নীচে। 'ওটা একটু নড়ে উঠলেই আপনার কপাল ফুটো হয়ে যাবে। যা বলছিলাম... আপনাকে বেশি শাস্তি পেতে হবে না,' বলে চলল যুবক। 'শুধু বাকি জীবন অখণ্ড অবসর নেবেন। উচিত ছিল বহু আগেই কারাগারে পচে মরা।'

'হঠাৎ এ কথা কেন?' শ্বাস ফেলে নিজেকে শান্ত করতে চাইল চ্যাপেল।

'যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মরতেন, তাতেও কারও কোনও ক্ষতি হতো না; তা-ই না?'

এখন যদি ঝট্ করে উঁচু করি ছড়ি, যদি টিপে দিই বোতাম? প্রথম যুবক হাসছে, পরিষ্কার টের পাচ্ছে ও তার মাথায় কী চলছে। এখন পিস্তল দেখা যাচ্ছে এর হাতেও। যদি পরোয়া না করে... কিন্তু তাতেই বা কী, হতাশ হয়ে ভাবল চ্যাপেল। নলের ভিতর মাত্র একটা বুলেট। 'জানতে পারি কেন এত আগের কথা উঠছে?'

'আমরা জানি এক নাৎসি ওই ভাইরাস তৈরির কৌশল খুঁজে পেয়ে সেটা তুলে দেয় জাপানি আর্মির হাতে। ওই ঘটনার কোনও রেকর্ড ছিল না। তবে কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ লেখা পাওয়া গেছে।'

এবার শুরু করল সোহেল, 'কদিন আগে আমরা জেনেছি

আপনিই সেই লোক যে প্রাচীন ট্যাবলেটের লেখা থেকে ওই ভাইরাসের খোঁজ পান। কীভাবে? সে সময় নরওয়ে দখল করে নিয়েছিল নাজিরা। সেখানে এক হিমশৈলের কাছে হাজার হাজার বছর ধরে আটকে ছিল প্রাচীন এক জাহাজ। চার ইঞ্জিনওয়ালা এক কণ্ডোর রিকনিসেন্স বিমান গুলি খেয়ে পড়ে গ্লেসিয়ারের উপর। তখন উনিশ শ' তেতাল্লিশ। মারা পড়ে বেশিরভাগ ক্রু, তবে একজন বেঁচে যায়। আর সেই গানারের নাম ছিল ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল।'

হাত কাটা যুবকের মুখে নামটা শুনে চমকে উঠল লিঙ্ক চ্যাপেল।

'আমরা ইতিহাস ঘেঁটে বের করেছি, ওই বিমান ধ্বংস হওয়ার পর ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেলকে খুঁজে পেল গেস্টাপোরা। তাকে সুযোগ করে দেয়া হলো মেডিকেল ট্রেইনিঙের। প্রশিক্ষণের জন্য বেছে নিল সে এক দারুণ জায়গা। ওটার নাম ছিল অস্‌উইচ। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই তাকে বদলি করা হলো টোকিয়োতে। সেখানে সে যোগ দিল ফিলিপিন্সের ইউনিট সেভেন টোয়েণ্টি-টু-তে। ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল থেকে হলেন লিঙ্ক চ্যাপেল, তারপর লিয়োনার্দো চার্চ, তবে ভিতরে সেই একই পিশাচ রয়ে গেলেন আপনি।'

'ক্যাপেল,' বলল রানা, 'সে-রাতে বিমান বিধ্বস্ত হয়েও বেঁচে গেছেন, তারপর দীর্ঘ জীবনভর নিষ্ঠুর অনেক খেলা দেখিয়েছেন; তবে আর নয়, শেষ হয়ে গেছে আপনার সব খেলা। আর কোনও সুযোগ দেয়া যায় না আপনাকে। এবার উঠে পড়ুন, যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।'

'ভাবছ, জেলে ভরে দেবে আমাকে?' ভুরু কুঁচকে চাইল ক্যাপেল। রাগে থরথর করে কাঁপছে সারা দেহ।

কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল। 'খুব একটা অসুবিধে হবে না। আপনার দুই মেয়েও হাজির থাকবে সেখানে, দেখাশোনা করতে পারবে। তবে আর কোনদিন কোনও জানালা দিয়ে আপনারা কেউ পৃথিবীর আকাশ দেখবেন না।'

'আমি কোনও কারাগারে বন্দি থাকতে এ দুনিয়ায় আসিনি!' প্রচণ্ড জোরে ধমকে উঠল ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল। 'তোমরা জানো আমি কে! আমি মানুষ নই, মহামানব! আর এই আমাকে... তোমরা...' তীব্র উত্তেজনা ভর করেছে লোকটার উপর, পরক্ষণে বোঝা গেল মনে কোনও ভয় নেই তার, ঝট্ করে ছড়ি তুলেই আগ্নেয়াস্ত্রের নল ঠেকিয়ে দিল নিজ চিবুকের নীচে। পরক্ষণে বুম্ করে উঠল .৪৫ ক্যালিবারের বুলেট।

লোকটার খুলির বড় এক অংশ ছিটকে গিয়ে লাগল ছাতে। ছোপ-ছোপ রক্ত ও হলদেটে মগজ লেগে রইল সিলিঙে। সোফা থেকে কাত হয়ে মেঝের উপর পড়ল লাশ।

'এ-ই ভাল হলো,' বন্ধুর দিকে চাইল সোহেল।

'তা-ই বোধহয়। ...চল্, পুলিশ আসার আগেই কেটে পড়ি।' ভাবছে রানা, এই অদ্ভুত নাটকে এভাবেই তা হলে নেমে এল যবনিকা। এভাবেই বিদায় নিল শরীরী এক প্রেতাত্মা।

নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরুল দুই বন্ধু, হাঁটতে লাগল নিজেদের গাড়ি লক্ষ্য করে।

ফ্রান্স।

প্যারিসের একটু দূরে। মফস্বল এলাকা।

ফরাসি নামজাদা এক সাইকিয়াট্রিস্টের বিশাল বাগান জুড়ে নামছে সন্ধ্যা। কারুকার্যময় এক বেঞ্চে বসেছে উর্বশী। মুখ তুলে চাইল সিঁদুর রাঙা আকাশে। বুক চিরে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস।

ঘুরে চাইল প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ির দিকে। খেয়াল করেনি কখন যেন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ওর ভাই।

'আমি কি একটু তোর পাশে বসব, দিদি?' নিচু স্বরে জানতে চাইল অমল।

'বোস্।' দূরের আকাশে চেয়ে রইল উর্বশী।

পাশে বসে বোনের দিকে চাইল অমল। কথা শুরু করতে চাইছে, তবে পারছে না। ছল-ছল করছে চোখদুটো। টপ করে খসে পড়ল এক ফোঁটা অশ্রু, নাকের পাশ দিয়ে নামছে। তারপর ফোঁপাতে শুরু করল সে।

অমলের দিকে ফিরে চাইল উর্বশী। আর শক্ত থাকতে পারল না। একহাতে জড়িয়ে ধরল ছোট ভাইয়ের কাঁধ।

এই আদরটুকু পেয়ে হু-হু করে কেঁদে ফেলল অমল।

'আমি মস্ত ভুল করেছি, দিদি। ওরা... ওরা তোকে কী কষ্টই না দিয়েছে... আর আমি...'

'আমার অত কষ্ট হয়েছে তা কে বলল তোকে। ছোট ভাইয়ের জন্য কিছু করতে বোনেদের কষ্ট হয় না।'

'আমি সব জানি, দিদি... আমি সব জানি। মাসুদ ভাই বলেছে আমাকে—তোকে... তোকে ওই লোকটা মারতে মারতে...'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকাল উর্বশী। 'মাসুদ ভাই... মানে, মাসুদ রানা? সে এসেছিল তোকে দেখতে? সত্যিই?'

'প্রায়ই তো আসেন, কত গল্প করেন!' নিজের কথায় চলে গেল অমল, 'দিদি, আমি ভেবেছিলাম কেউ নেই আমার, আমি একা এই দুনিয়ায়। মস্ত ভুল করেছি...'

'সবার জীবনেই ভুল হয়, রে। সবার। কে নেই তোর, বল্?

মা-বোন তো আছেই, অনেক ভাল বন্ধু আছে, যারা মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে তোকে ওই পিশাচদের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন...'

অমলের গলা কাঁপতে লাগল, 'দিদি... তুই কি... তুই কি আমাকে... মাফ করে দিবি... দিদি?'

'আমি তো ভুলেই গেছি, রে!' ওর কপালে চুমো দিল উর্বশী।

'দুনিয়ার সব বোন এভাবে...' একবার বোনের ফোলা মুখটা দেখে নিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল অম : দাশা। 'বেয়াড়া ভাইয়ের জন্য তারা এত কষ্ট সহ্য...'

ওর চুলে বিলি কেটে দিতে লাগল উর্বশী, কোমল স্বরে বলল, 'হ্যাঁ রে, দুনিয়ার কোনও বোন তার ভাইয়ের দোষ খুঁজে পায় না! ভাইয়ের জন্য কিছু করলে কষ্ট হয় না তাদের।'

***